

১৯৮৭–১৯৯৭

নির্বাচিত রচনা

প্রথম খণ্ড

এ. এন. রাশেদা সম্পাদিত

প্রকাশক
শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা

সম্পাদক
এ.এন.রাশেদা
২৮/৫ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪০৪
২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭

অক্ষর বিন্যাস
যথাশব্দ কম্পিউটারস
১২৪/এ আজিজ সুপার মার্কেট (দোতলা)
শাহবাগ, ঢাকা।

পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রাপ্তিস্থান
বইপত্র, পাঠক সমাবেশ, জনান্তিক
আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
রিকো প্রিন্টার্স
৯, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫। ফোন ঃ ৫০০৭১৮

মূল্য ঃ

অফসেট	২৫০ টাকা
সাদা	২১০ টাকা

বিদেশে $ ১৫

Editor : A.N. Rasheda. **First Edition :** Poush 1404, 27 December 1997. **Distibitor :** Jatio Shahitya Prokashony, 21/1 Purana Paltan, Dhaka-1000. **Price :** $ 15. **Publishir :** Shikhabarta Prokashana, 28/5 BUET, Dhaka-1000.

উৎসর্গ

'৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে
শহীদ ডা. মিলন এবং '৯৪-এর
শিক্ষক আন্দোলন চলাকালীন সময়ে
মৃত্যুবরণকারী শাহজাদা শিকদার
স্মরণে নিবেদিত।



স্মরণ

• অধ্যাপক নূরুল আমীন

নটরডেম কলেজ ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এই অধ্যাপক ট্রেড-ইউনিয়নসহ ব্যাপক/ প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'শিক্ষাবার্তা' প্রকাশের প্রাথমিক লগ্নে অন্যতম উৎসাহদাতা। মৃত্যু ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৭।

• অধ্যাপক রশীদ আল-ফারুকী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বিশিষ্ট গবেষক ও সংস্কৃতিকর্মী। 'রুচি ও প্রগতি', 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা', 'মুসলিম মানস' ইত্যাদি বহু মৌলিক গ্রন্থ প্রণেতা। 'শিক্ষাবার্তা'র পৃষ্ঠপোষক। মৃত্যু ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

• অধ্যাপক মোস্তফা হামিদ হোসেন

বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এই অধ্যাপক সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। শোষণমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। 'শিক্ষাবার্তা'র অন্যতম বিশিষ্ট লেখক। মৃত্যু ২৬ আগস্ট, ১৯৮৯।

• অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী

ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। বাংলা একাডেমীতে থাকাকালীন অনেকগুলি বইয়ের অনুবাদক।

এছাড়া যাবতীয় প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন। শিক্ষাবার্তার উপদেশকমণ্ডলীতে থেকে লেখা ও পরামর্শ দিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। মৃত্যু ১১ অক্টোবর, ১৯৯১।

• অধ্যাপক আবদুল জব্বার

গণিতবিদ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আজীবন জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন। জনপ্রিয় বিজ্ঞানের অনেকগুলি বইয়ের লেখক। 'শিক্ষাবার্তা'য়ও লিখেছেন। মৃত্যু ২০ জুলাই, ১৯৯৩।

• অধ্যক্ষ রাজিয়া বেগম

ইডেন গার্লস কলেজে, পরবর্তী কালে জগন্নাথ কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও শেষে ইডেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ। 'শিক্ষাবার্তা'র সকল সেমিনারে সাগ্রহে শরিক হতেন। মৃত্যু ৩০ আগস্ট, ১৯৯৬।

• অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইতিহাস ও ঐতিহাসিক" বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। তিনি 'শিক্ষাবার্তা'র উপদেশকমণ্ডলীতে ছিলেন এবং আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ যোগাতেন। মৃত্যু ৩০ জুলাই, ১৯৯৭।

মুখবন্ধ

দেখতে দেখতে মাসিক শিক্ষাবার্তা পত্রিকার দশ বছর পূর্ণ হল; এটা এদেশের শিক্ষানুরাগী সব মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে এক পরম আনন্দ সংবাদ। দশ বছর আগে নব-প্রকাশিত কার্তিক ১৩৯৪ (অক্টোবর ১৯৮৭) সংখ্যা শিক্ষাবার্তার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল: "সমস্ত অর্থেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন। আমরা প্রতিনিয়ত তার বিভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করছি। লক্ষ্যহীনতা, অবক্ষয়, অদক্ষতা, বৈষম্য, নিম্নমান, দুর্নীতি প্রভৃতি আজ গ্রাস করছে আমাদের শিক্ষা জীবনকে। ..." এর আগের পুরো এক যুগ ধরে দেশে চলেছে স্বৈরাচারের দুঃশাসন। দেশ থেকে গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত সকল রকম সুনীতি। শিক্ষাব্যবস্থার 'মহাসঙ্কট' প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সমাজ জীবনের মহাসঙ্কটেরই যেন প্রতিধ্বনি। সেদিন এই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে শিক্ষাবার্তা জ্বালিয়েছিল একটি আলোকবর্তিকা। ঘনায়মান সঙ্কটের সমাধানের জন্য শিক্ষানুরাগী সকল মানুষের কাছে ঐক্যের ডাক পৌঁছে দিয়ে সেই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল: "...সকলের মতামতের মধ্য দিয়ে একটি ঐকমত্য সাধনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়, সমগ্র জাতির। তাই এর সমাধান সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই কেবল সম্ভবপর। ..."

এর মধ্যে দশ বছর সময় কেটে গেলেও এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্কট আজও দূরীভূত হয় নি। তবে আশার কথা এই যে, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে কিছু নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তিকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিচ্যুত করে যে অরাজক শক্তি ক্রমেই চতুর্দিকে বিষাক্ত থাবা বাড়াচ্ছিল তা আজ পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করেছে। গণতন্ত্র ও প্রগতির শক্তি ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের অনুসরণে দেশে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। বিগত এক দশকে শিক্ষাক্ষেত্রের বহুমুখী সমস্যার সমাধানে শিক্ষাবার্তা নিষ্ঠার সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে তা এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এই পত্রিকার পাতায় দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের নানা সমস্যা ও সে সবের সমাধানে নানা ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। দেশের বিদগ্ধজন তাঁদের সুচিন্তিত মতামতে সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের চিন্তার জগৎকে। পত্রিকার দশম বার্ষিকী উপলক্ষে এসব চিন্তার সমাহারকে একসূত্রে গেঁথে এই সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করায় এসময়ে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব চিন্তার স্রোত বয়েছে তার একটি সামগ্রিক পরিচয় পাঠক অতি সহজে পেয়ে যাবেন। তাতে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের বহুমুখী সমস্যার সমাধানে যেমন সহায়তা হবে তেমনি এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে।

শিক্ষাবার্তায় গত দশ বছরে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি শিক্ষার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। তাতে যেমন আছে প্রাথমিক স্তরের সমস্যার বিষয় তেমনি আছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সমস্যার প্রসঙ্গ; যেমন আছে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের কথা তেমনি আছে বিজ্ঞান শিক্ষার বা শিক্ষকদের সমস্যার কথা। এতে যেমন প্রকাশিত হয়েছে দেশের নানা আনাচে-কানাচের শিক্ষাক্ষেত্রের চিত্র তেমনি আছে বাইরের বিশ্বের শিক্ষার নানা প্রসঙ্গ। শিক্ষাক্ষেত্রের আজকের দিনের সমস্যার আলোচনার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে অতীতের শিক্ষাক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা। বলাই বাহুল্য এমন বিচিত্র প্রসঙ্গের নানামুখী রচনা একসঙ্গে পাবার ফলে সকল শিক্ষানুরাগী পাঠক এই সঙ্কলনগ্রন্থে এক বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারে অবগাহন করতে পারবেন।

এদেশের সকল শিক্ষক, শিক্ষাক্ষেত্রের নীতিনির্ধারক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বইটি পড়ে প্রচুর আনন্দ ও চিন্তার খোরাক পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষাবার্তার অক্লান্তকর্মী সম্পাদিকা এবং তাঁর সহযোগীদের এই মূল্যবান সঙ্কলনগ্রন্থটি উপহার দেবার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আবদুল্লাহ আল-মুতী

আবদুল্লাহ আল-মুতী

আমাদের কথা

অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে 'শিক্ষাবার্তা' এ বছর পূর্ণ করল দশটি বছর। এই দশটি বছর শিক্ষাবার্তা কোনো কুসুমাস্তীর্ণ পথ ধরে এগোয় নি। প্রথম পাঁচ বছর শিক্ষাবার্তা প্রকাশিত হয়েছিল বছরে ৬টি করে। 'মাসিক' ডিক্লারেশন নিয়ে 'দ্বি-মাসিক' হিসেবে প্রকাশিত হওয়ায় প্রতি বছরই চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তরে হেনস্তা হতে হয়েছে। পাঁচ বছর অতিক্রম করার পর লিখিতভাবে বন্ড দিতে হয়েছিল আগামীতে আর এমনটি হবে না, ধীরে ধীরে নিয়মিত অর্থাৎ প্রতি মাসে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে। তাই ষষ্ঠ বছরে প্রকাশিত হয়েছিল ৮টি সংখ্যা। না, তাতেও হলো না। পত্রিকাটিকে মিডিয়া লিস্ট ভুক্তির তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর আবার হুমকি দিল। মহাপরিচালকের সঙ্গে দেখা করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম — আর এমনটি হবে না, সামনের বছর প্রতিমাসেই প্রকাশিত হবে। সত্যিকথা বলতে কি শিক্ষাবার্তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালের অক্টোবর। কিন্তু সেবছরে আর প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নি। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে ৫টি সংখ্যা। এই নিয়ে হিসেব 'প্রথম' বছরের। '৯৭তে পূর্ণ হলো দশ বছর। স্থির করলাম সপ্তম বছরে যে করেই হোক ১২টি সংখ্যা প্রকাশ করতেই হবে। অনেক কষ্ট করে যখন ডিসেম্বরে ১২ নম্বর সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল (যদিও বিজ্ঞাপন একটিও ছিল না) তখনই মন আনন্দে মেতে উঠল। আলোচনা করলাম উপদেশকমণ্ডলীর অনেকের সঙ্গে। তাঁদের পরামর্শে ৩ ডিসেম্বর সভা ডাকা হলো উপদেশক ও সম্পাদনা পরিষদের। সেদিন বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ছিল– তার পরেও এ সভাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার (সদ্যপ্রয়াত), অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা, অধ্যাপক আ. মু. মুয়াজ্জেম হুসেইন ও উপদেশকমণ্ডলীসহ সম্পাদনা পরিষদের কজন। মনে আছে ৩ জানুয়ারি সেই সাত বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের ব্যানারে লেখা হয়েছিল "সাত বছর পূর্তি-উৎসব"। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বললেন, শিক্ষকদের প্রকাশিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিকের সাত বছর পূর্তি সত্যিই খুব আনন্দের– তাই এ অনুষ্ঠানকে বলা হয়েছে 'সাত বছর পূর্তি-উৎসব'।

শিক্ষাবার্তা মাসিক প্রকাশনা ছাড়াও কিছু কিছু সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও "শিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন" কর্মসূচির আয়োজনও করে আসছে: ১৯৯৫ সালে রবীন্দ্রজন্মতিথিতে আমরা আয়োজন করেছি "রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান শিক্ষাভাবনা", অতঃপর "শিক্ষাদর্শন : লক্ষ্য ও সমাজ", "বিজ্ঞানচর্চা : সমকালীন বাংলাদেশ",

"বাংলাদেশের পাবলিক পরীক্ষাপদ্ধতি" এবং এবার "দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষাপ্রসার"। ইতঃপূর্বে দুটো সেমিনারের কার্যবিবরণী নিয়ে আমরা প্রকাশ করেছি দুটো বই— "শিক্ষাদর্শন : লক্ষ্য ও সমাজ", "বিজ্ঞানচর্চা : সমকালীন বাংলাদেশ"। বাংলাদেশের রজতজয়ন্তীতে আমরা আয়োজন করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শিক্ষকদের শ্রদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষকদের সম্মাননা অনুষ্ঠান। দশ বছর পূর্তিতে আমরা প্রকাশ করতে চলেছি শিক্ষাবার্তার নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন। এ চিন্তা আমরা তিন মাস আগেই করেছিলাম এবং সে- হিসেবে কিছু প্রবন্ধ নির্বাচন করেছিলাম। খুব যে সুচিন্তিতভাবে—সে দাবি করব না। কেন না শিক্ষাবার্তা সব সময় শিক্ষা, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানশিক্ষা, সাহিত্য সমালোচনা, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশ করে এসেছে। তাই সামান্য খেয়াল রেখেছি একটা দশকের মধ্যে বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তা, শিক্ষার আন্দোলন-সংগ্রামের একটি চিত্র যেন ফুটে ওঠে। শুধু এইটুকু। ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা বাদ পড়েছে। পড়ত না যদি কম্পোজিটররা তিন মাস পূর্বেই কাজে হাত দিত। নানা অজুহাতে বাড়ি যাওয়া এবং দীর্ঘদিন ছুটি ভোগ করা, হরতাল পালন, বিদ্যুতের ঘন ঘন আসা-যাওয়া, কম্পিউটারের অসহযোগিতা, ভাইরাসের আক্রমণ ইত্যাদি নানা কারণে ইচ্ছানুযায়ী প্রবন্ধ নির্বাচন করা গেল না। অনেক লেখক শিক্ষাবার্তায় দশ বছর ধরে প্রচুর লিখেছেন। সময়ের বিবেচনায় আমরা তাদের দু-একজনের হয়ত একাধিক লেখা নিয়েছি। আর ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেকেরই লেখা নিতে পারি নি। ৩০ ফর্মার বইটি আর বাড়াতে সাহস হয় নি। তবে এটি প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালেই।

শিক্ষাবার্তার দশ বছর পূর্তিতে বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁদের কথা, যাঁরা শিক্ষাবার্তার প্রকাশনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, উপদেশকমণ্ডলীতে ছিলেন, শিক্ষাবার্তার উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে এসেছেন, গ্রাহক হয়ে প্রকাশনাকে উৎসাহিত করেছেন— কিন্তু আজ আর আমাদের মাঝে নেই।

যাঁদের সাহায্য ছাড়া এই সঙ্কলনটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হতো না, যাঁরা নিজেদের প্রুফ ও অন্যদের প্রুফও দেখে দিয়ে প্রকাশনাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্বীকার করছি— তাঁরা হলেন আমার অগ্রজ তুল্য অধ্যাপক মোতাহার হোসেন সুফী, অধ্যক্ষ জাহানারা হক, অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা, মিসেস নিলুফার বানু, হান্নানা বেগম, ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক আনু মোহম্মদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র উত্তমকুমার রায়, কম্পোজিটর গিয়াস উদ্দীন, গণেশ হাওলাদার, আলী আকবর এবং সবশেষে আমার ছোট ছেলে সবে এইচ.এস.সি. পাশ করা আদরের অরূপ। এই সাহায্য ছাড়া দুঃসাধ্য কাজটি শেষ করা সম্ভবপর ছিল না।

এই সঙ্কলন প্রকাশের প্রস্তাব দেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান— যাঁর উপদেশ শিক্ষাবার্তাকে এগিয়ে চলতে সর্বদা সাহায্য করেছে। দশম বর্ষপূর্তির ধারণা দিয়েছিলেন অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম, শিক্ষাবার্তার প্রকাশনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সর্বদাই যিনি সচেষ্ট।

শিক্ষাবার্তার দশ বছর পূর্তিতে ধন্যবাদ জানাতে চাই শিক্ষাবার্তা প্রকাশের জন্য প্রথম যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মজুমদার এবং ডিক্লারেশন পেতে যিনি সাহায্য করেছিলেন ড. আবদুল্লাহ আল-মুতীকে। তাঁদের উদ্যোগ ছাড়া এ পত্রিকার হয়ত জন্মই হতো না।

দশ বছর পূর্তিতে ধন্যবাদ জানাতে চাই যাঁরা লেখা দিয়েছেন কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয়, ভালবাসার তাগিদে, শিক্ষকদের মাঝে সুস্থ চিন্তা-চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে একটি সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রত্যয়ে। ধন্যবাদ জানাতে চাই এই দশ বছর যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদেরও। পত্রিকাটি ব্যবসায়িক ভিত্তির না জেনেও সামাজিক কর্তব্যবোধ থেকে যারা দিয়েছেন ডেল্‌টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাফায়েত আহমদ চৌধুরী, গ্রীন ডেল্‌টা ইনস্যুরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাসির আহমেদ চৌধুরী, প্রজেক্ট বিল্ডার্সের প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রকৌশলী ইফতেখার কাজল, চিটাগাং স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রেজাউল করিম, কনফিডেন্স ট্রেড লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কবিরুল ইসলাম, মডার্ন ইরেক্সান-এর জওয়াহেরুল গণিসহ আমার স্বামী অধ্যাপক গোলাম মহিউদ্দীনের বুয়েট '৭০-এর বন্ধুর। সিঙ্গার কোম্পানির বার্ষিক চুক্তি আমাদের উপকৃত করেছে। নানা সময়ে আমাদের অনুষ্ঠানে পেছনে থেকে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন অপরূপা গার্মেন্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইকবাল আহমেদ।

শিক্ষাবার্তা-র এই দশ বছর পূর্তিতে নির্বাচিত রচনা সঙ্কলনটি প্রকাশ করতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই আনন্দিত। কিন্তু কষ্ট পেয়েছি যখন বানানের নিয়ম নিয়ে বিভ্রান্তির মাঝে পড়েছি। বাংলা একাডেমি বলছে এক নিয়ম, আবার অন্যরা বলছে ভিন্ন নিয়ম। কাজেই বানান বিভ্রাটের দোষে আমরা দোষী নই। তবে অনেক কষ্টের পরও চোখের ভুল থেকেই গেল। এর সব দায়ভার সম্পাদকের উপরই পড়ে— আর সে অপরাধও মাথা পেতে নিলাম।

নির্বাচিত রচনা সকলের ভালো লাগবে সে কথা বলব না। তবে যাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে ভাবেন, প্রয়োজনে তাঁদের যে এটি পড়তেই হবে সে কথা হলফ করে বলতে পারি।

ধন্যবাদসহ
এ. এন. রাশেদা
সম্পাদক
মাসিক *শিক্ষাবার্তা*

সূচিপত্র

বাঙালির আত্মপরিচয় : সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত

কবীর চৌধুরী

কোনো ব্যক্তি কি পরিপূর্ণভাবে নিজের পরিচয় লাভ করতে পারে? কিন্তু নিজের পরিচয় সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে সে কিভাবে, কোন পথে, নিজেকে গড়ে তুলবে? আত্মপরিচয় অনুসন্ধান তাই প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বা অন্যভাবে ঐক্যবদ্ধ সকল জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

উক্ত অনুসন্ধান পর্ব চালাতে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে যে কোথাও কোথাও বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। কিন্তু নিরাবেগ তীক্ষ্ণতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে এও দেখা দেখা যাবে যে সেটা রয়েছে উপরের স্তরে, গৌণ বিষয়কে ঘিরে। মুখ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, জীবনের গভীরে, বিরাজ করছে একটা মৌল ঐক্য ও সংহতি। সুস্থ ব্যক্তির মতো সুস্থ জাতিও সংহত ও সমন্বিত, খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন নয়, এলিয়েনেটেড বা ডিসওরিয়েন্টেড নয়।

একটা জাতির সার্বিক পরিচয় লাভের জন্য তার সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নৃবিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক প্রমুখ এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছেছেন। তবে সংস্কৃতির রূপ, চরিত্র কিংবা উপাদান সম্পর্কে তাঁরা যে সব সময় এক ধারণা পোষণ করে এসেছেন তা নয়।

বাঙালি তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে, প্রধানত স্বৈরাচারী শাসক কর্তৃক শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে, নানা বিভ্রান্তি ও বিতর্কের শিকার হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু বলবার আগে সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে দু-একটি কথা বলে নেয়া যাক। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে অবশ্য কোনো বিস্তৃত বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তবে এটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণা কালের যাত্রার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে বর্তমানে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সংস্কৃতি সম্পর্কে তার অতীতের ধারণা থেকে তা স্বতন্ত্র। কোনো এক সময় সংস্কৃতির সঙ্গে জাতিতত্ত্ব বা রেসিজমের আত্যন্তিক যোগ ছিলো। বিংশ শতাব্দীতেও এডলফ হিটলার এরিয়ান কালচার নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, যদিও তখন ওই

১ম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৮

ধারণা এ্যানাক্রনিস্টিক হয়ে গিয়েছিলো। অন্য কোন এক সময় ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ প্রভৃতিকে একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিলো। সংস্কৃতি গঠনে যে জীবিকার উপর সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতিনীতি, ললিত কলা, শিল্প-সাহিত্য এবং জীবন উপভোগের যাবতীয় ব্যবস্থা ও উপকরণ বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল সে তথ্য অনেকে ভুলে গিয়েছিলেন। "Many writers had accepted the fallacious explanations of racism while others who avoided the errors of race were forced to fall back on environmental explanations which went astray because it had not recognized either that the culture interposes between the individual and his physical environment or that the society itself has often erected a secondary environment more important than the original or primary one." (David M. Potter, People of Plenty, published by the University of Chicago, 1954.)

আমরা বর্তমানে সংস্কৃতি বলতে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী প্রভাবিত ব্যাপক অর্থেই তাকে গ্রহণ করি। কোনো একটি জনগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার, থাকা খাওয়ার রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, তার সংস্কার কুসংস্কারসহ জীবনের হাজারো উপকরণ ও উপাচার, তার ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য সব মিলেই তার সংস্কৃতি। বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিশেষ কোন একটি বা কয়েকটি উপাদান অন্যান্য উপাদানগুলির চেয়ে অধিকতর প্রভাববিস্তারী হয়ে উঠতে পারে, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর টোটাল সংস্কৃতি নির্মাণে সাময়িকভাবে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু তাই বলে সর্বাবস্থায় সর্বকালের জন্য কোনো বিশেষ উপাদানকে প্রধানতমরূপে চিহ্নিত করলে আমরা অস্বচ্ছ চিন্তা ও বিভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেবো। এক সময় পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদী শাসকগোষ্ঠী সেদেশের সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা, ভৌগোলিক পরিবেশ, অতীত ইতিহাস, জীবনের উপকরণ, ঐতিহ্যিক আচার-আচরণ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে শুধু ধর্মকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছিলো। ফলে প্রশ্রয় পায় চরম ভ্রান্তি। পরিণামে যা রাষ্ট্রীয় স্তরে তার জন্য অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ডেকে আনে। পাকিস্তান আমলে স্বৈরাচারী শাসন ও উপনিবেশবাদী শোষণের স্বার্থে তার শাসকচক্র সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালির সংস্কৃতির স্বাভাবিক স্রোতধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলো। সে-ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মন্তব্যগুলি শেষ করার আগে আরো দু-একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। সচরাচর সংস্কৃতি বলতে আমরা এর মানসসম্পদের কথাই ভাবি, যার পরিচয় মেলে কোনো জনগোষ্ঠীর শিল্প-সাহিত্য-ললিতকলায়। কিন্তু এগুলি শুধু সংস্কৃতির একটা দিক। গোপাল হালদার তাঁর "সংস্কৃতির রূপান্তর" গ্রন্থে সংস্কৃতির তিন অবয়ব বা তিন প্রকার অবলম্বনের কথা উল্লেখ করেছেন: "প্রথমত ইহার মূল ভিত্তি সেই জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means); দ্বিতীয়ত সংস্কৃতির প্রধান

আশ্রয় সমাজদেহের বাস্তব ব্যবস্থা (social structure) : আর তৃতীয়ত সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস সম্পদ— উহা এই হিসাবে সমাজসৌধের শিখর চূড়া মাত্র (superstructure)। তাহা হইলে সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার জাতিগত, দেশগত, বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটা অর্ধসত্য তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার মানে কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত তাহাও তেমনি আরেকটি অর্ধসত্য।" এ প্রসঙ্গে এটাও আমরা সবাই লক্ষ্য করি যে, বর্তমানে কোন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির একটা বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র রূপ কল্পনা করা যায় না। নানারকম মিশ্রণ , গ্রহণ বর্জন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হয়। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানি যে নানারকম গ্রহণ বর্জন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ও উঠছে। আমরা জানি যে ধর্ম আমাদের সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। আমরা এও জানি যে আমাদের সংস্কৃতি আমাদের জাতীয়তার অন্যতম আশ্রয়। তবে এই সঙ্গে আমরা এটাও জানি যে, সমন্বয়ই সুস্থ জাতীয়তাবোধের সদা-অন্বিষ্ট। সুস্থ জাতীয়তাবোধের ঝোঁক সর্বদাই গ্রহণের দিকে, বর্জনের দিকে নয়। একমাত্র উগ্র ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদই সংস্কৃতিসহ বিভিন্নক্ষেত্রে বর্জননীতি অনুসরণ করে। নাৎসি জার্মানিতে বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের বহ্ন্যুৎসবের বর্বর কাহিনীর কথা সবারই জানা।

গ্রহণ-বর্জন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে সে সম্পর্কে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', বইতে একটি কৌতূহলোদ্দীপক উক্তি করেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: "আকারে যেমন প্রকৃতিতেও তেমনি বাঙালী ভারতীয়ই বটে। বাঙালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়ত চার আনা ইউরোপীয়, তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে— এবং আট আনা ভারতীয়, বাকী চার আনা সে বাঙালী এবং চার আনার মধ্যে আবার কতটা ভারতীয়তত্ত্বের বাঙালী বিকার— বাকীটুকু খাঁটি বাঙালী অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙালী।" সুনীতিবাবুর মন্তব্যের সূত্র ধরে আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের মতো দেশে যেখানে শতকরা প্রায় নব্বই জন লোকের বাস পাড়াগাঁয়ে এবং যাদের পেশা প্রধানত কৃষিকর্ম সেখানে সংস্কৃতির মূল ধারক ও বাহক পল্লীগ্রাম ও পল্লীর জনগণ। তার সকল সীমাবদ্ধতা নিয়েই লোকজ ঐতিহ্যসমৃদ্ধ গ্রামীণ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপরই আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতিবিষয়ক সকল আলোচনায় আমরা সচরাচর যার কথা বলি তা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষের সংস্কৃতি, এর জন্ম ও অবস্থান মূলত শহরে, এবং এটা প্রধানত মানস সংস্কৃতিরই ইতিহাস বহন করে, জীবিকাগত বা বাস্তব উপকরণগত সংস্কৃতির বিশেষ খোঁজ রাখতে চায় না।

জীবিকাগত ও বাস্তব উপকরণগত, তথা অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়টি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক বিকাশ যখন সুষম হয়, যখন তা

সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে ইতিবাচক ও ধনাত্মকভাবে স্পর্শ করে তখনই প্রকৃত অর্থে সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ খুলে যায়। তখন পল্লী ও নগরের ব্যবধান কমে আসে, লোকজীবন ভিত্তিক সংস্কৃতির সঙ্গে নগর-সংস্কৃতির একটা স্বাভাবিক যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে তার রাখীবন্ধন ঘটে। আমাদের মতো শোষণভিত্তিক শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় যথার্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য যা শুধু আকাঙ্ক্ষিত নয় অপরিহার্য, অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের সুস্থ উন্নত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন, তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না।

এবার আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করা যাক, যদিও এর আভাস রয়েছে উপরের আলোচনাতেই। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ঘটনাবলী এবং বহির্বিশ্বের বহুমুখী প্রভাব সেদেশের সংস্কৃতিতে একটা জাগরণের তরঙ্গ তুলতে পারে, সেই অভিঘাত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানস গঠনে, তার সাংস্কৃতিক বিকাশে, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার কোনো একটি বিশেষ সময়ে কোনো একটি দেশে কতিপয় যুগস্রষ্টা ব্যক্তির কর্মকাণ্ডও সেদেশে একটা সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সূচনা করতে পারে। তবে সাধারণত আর্থ-সামাজিক জাগরণের সড়ক বেয়েই সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। এবং এর সঙ্গেই অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, রুচি, সৃজনী প্রতিভা এবং সকল সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা।

এবার আমরা আরেকটু প্রত্যক্ষভাবে বাঙালি সংস্কৃতি এবং তার সূত্র ধরে বাঙালির আত্মপরিচয় লাভের প্রয়াস সম্পর্কে কিছু কথা বলব। আমরা প্রধানত বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখবো। কারণ অস্বচ্ছতা একে ঘিরেই। সাম্প্রতিককালের প্রেক্ষাপটে যখন মন্তব্য করবো তখন আমাদের বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বাঙলাদেশের বাঙালি, ধর্মে যারা মুসলমান। এও সেই একই কারণে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে তার মাটি, প্রকৃতি ও পরিপার্শ্ব থেকে প্রাণরস আহরণ করে একান্তভাবে দেশজ ও লোকজ ঐতিহ্যলালিত এক ধরনের ইন্টিগ্রেট বা সমন্বিত বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো। সম্প্রদায় ভেদে, শ্রেণীভেদে, ধর্মভেদে, পেশাভেদে, কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপর স্তরে বিভিন্নতা থাকলেও মৌলস্তরে ঐক্য ছিলো। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রে তলের দিকে বিদ্যমান ওই মৌলিক ঐক্যই সমাজকে তখন বেঁধে রেখেছিলো, তার সুস্থতা সুনিশ্চিত করেছিলো। বাঙালির লোকসঙ্গীত, লোকগাথা, লোককাব্য, বাউল তত্ত্বসাধনা ও গ্রামীণ মেলাসহ নানা লোক-উৎসবের মধ্যে আমরা তা লক্ষ্য করি।

আধুনিককালে ইংরেজের এই উপমহাদেশে আগমন, বাংলায় তাদের প্রথমে বাণিজ্য ও পরে রাজত্ব বিস্তার, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, সীমিত নগরায়ণ, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার

অনুপ্রবেশ প্রভৃতি তার সকল দোষগুণ নিয়ে বাঙালি বুর্জোয়ার উদ্ভবের সূচনা করলো। শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত বাঙালি সংস্কৃতির একটা রূপান্তর হলো। কিন্তু এ-রূপান্তরে সমন্বয় আর থাকলো না। রাজনৈতিক ঐতিহাসিক কারণে গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে, এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ অবধি, উপর্যুক্ত রূপান্তর বাঙালি মুসলমানের জীবনকে ইতিবাচকভাবে স্পর্শ করলো না। ফলে এ যাবৎকাল যে লোকজ ঐতিহ্যভিত্তিক সমন্বিত বাঙালি সংস্কৃতির একটা ধারা গড়ে উঠছিলো তার বিকাশের পথে বাধার প্রাচীর তৈরি হতে শুরু করলো। রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিবেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধকে উদ্দীপ্ত করতে শুরু করেছিলো। বঙ্গভঙ্গ আইন ও তা রোধ-আন্দোলন, বাঙালি মুসলমানের সর্বক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা ও তজ্জনিত ক্ষোভ, সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত অমুসলমান নেতৃবর্গের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা মি. জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার প্রভৃতি বিষয় ওই বাধার প্রাচীরকে দৃঢ় করে তোলে। আর অবশ্যই উপনিবেশবাদী বিদেশী ইংরেজ শাসকবর্গ তাদের কুটবুদ্ধিজাত "ভাগ কর এবং শাসন কর" নীতি অনুসরণ করে এই প্রক্রিয়ায় ইন্ধন যোগায়। ফলে শিক্ষিত নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালির চিত্তে, সাধারণভাবে, বুর্জোয়া বিকাশ রেনেসাঁসের পথ না ধরে রিভাইভেলিজমের পথ ধরে অগ্রসর হলো। সপ্তদশ শতকের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি, শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, বাংলাভাষাকে নিজের ভাষা জ্ঞান করে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করলেন, কাহিনীর পাত্র-পাত্রী হিন্দু কি মুসলমান তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না, নিঃসঙ্কোচে লোকাচারকে তাঁদের রচনায় স্থান দিলেন। কবি আব্দুল হাকিম তো যারা বাংলাদেশে বাস করে, বাংলার অন্নজলে পুষ্ট হয়ে, বাংলাকে মাতৃভাষা বিবেচনা করতে দ্বিধা করে তাদের সরসরি বেজন্মা বলে আখ্যায়িত করলেন। সেই অবস্থান থেকে সরে এসে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কতিপয় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মাতৃভাষা নিয়ে অহেতুক বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন তুললেন। বাঙালি মুসলমান কোন ভাষাকে আঁকড়ে ধরবে, কোন ভাষাকে প্রাধান্য দেবে? বাংলাকে, নাকি আরবি, ফার্সি, অথবা উর্দুকে? ইসলামি সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। মিলন ও সমন্বয়ের জায়গায় দানা বাঁধতে শুরু করলো বিরোধ বিচ্ছিন্নতা। আমরা কি বাঙালি, নাকি মুসলমান, কিংবা বাঙালি মুসলমান? এবং যদি বাঙালি মুসলমান হই, তবে কি আগে বাঙালিও পরে মুসলমান, নাকি আগে মুসলমান ও পরে বাঙালি? এই জাতীয় কৃত্রিম বৈপরীত্য ও বিরোধের অবতারণা করে, কৃত্রিম অগ্রাধিকারের প্রশ্ন তুলে মিথ্যা আত্মাভিমানী, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ, বাঙালি সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও অখণ্ড এযাবৎকাল প্রবহমান স্রোতধারাকে আবিল ও খণ্ডিত করে তুললো। অবশ্য বাংলার গ্রামজীবনের গভীরে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতামুখী নাগরিক তৎপরতাকে উপেক্ষা করে তখনো একধরনের ঐক্যস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছিলো। সমন্বিত বাঙালি সংস্কৃতির সেই রূপ আমরা ঘুরে ফিরে বারবার প্রত্যক্ষ করি লালনসহ বহু বাউল-সাধকের গানে, তাছাড়া

কোনো কোনো নগরকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বও এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। শিল্প-সাহিত্যের ভুবনে এ প্রসঙ্গে সহজেই কাজী নজরুল ইসলামের নাম মনে পড়ে। তাঁর অজস্র গানে ও কবিতায় আচারসর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ বিভেদসৃষ্টিকারী ধর্মের প্রসঙ্গ অনায়াসে উপেক্ষিত ও অতিক্রান্ত হয়েছে। তার জায়গায় সেখানে ফুটে উঠেছে একটা সুস্থ সুসমন্বিত নির্ভেজাল বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জ্বল ছবি। ঢাকাকেন্দ্রিক বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হলেও এখানে আরেকটি ধারার উল্লেখও অসঙ্গত হবে না। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ঢেউ একসময় বাংলাদেশেও এসে পৌছায় এবং সেই বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে বিশেষভাবে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে, বাঙালির সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আাদর্শ সংবলিত একটা নতুন ধারাও যুক্ত হয়েছিলো।

সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে রচিত দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রসার তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও ঔদার্যের অভাবজনিত ব্যর্থতা বিপুল নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর সাময়িক অন্ধ ভাবাবেগ, সুবিধাবাদী শ্রেণীর ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি এবং ইংরেজের কূট রাজনীতির ফলে শেষপর্যন্ত ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হলো। বাংলাদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়ে তার এক অংশ পরিণত হল ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিম বাংলায়, অন্য অংশ পাকিস্তানের পূর্ব শাখা পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে। রাষ্ট্রীয় ও নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাঙালি বিভক্ত হয়ে গেল, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিভাজন এত সহজ সূত্র ধরে ঘটে না তার একটা নিজস্ব লজিক আছে। কিন্তু পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশবাদী শাসকবর্গ সে সত্য মানতে চায় নি। তারা শোষণের স্বার্থে পশ্চিম বাংলার বাঙালি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য স্থায়ী পার্থক্য গড়ে তুলতে চান। বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্যকে তারা নানাভাবে মুছে ফেলবার চেষ্টা করেন। হিন্দুসমাজের চিত্র পরিবেশিত হয়েছে, এই জাতীয় নানা হাস্যকর কুযুক্তির অবতারণা করে তাঁরা বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের অবমূল্যায়নে ব্রতী হন। এমন কথাও বলা হল যে রবীন্দ্রনাথকে খুব বড় করে দেখা ঠিক হবে না, বস্তুতপক্ষে তিনি আমাদের কবি নন, তাঁকে প্রয়োজনবোধে বর্জন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হলো নজরুলকে। মহান, মানবতাবাদী, বিদ্রোহী, সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, জাত-অসাম্প্রদায়িক, বাঙালির সুস্থ জীবনবাদী সমন্বিত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম ধারক নজরুলকে তুলে ধরা হল একান্ত খণ্ডিতরূপে, শুধু মুসলমান কবিরূপে। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু বাঙালি সংস্কৃতিসেবীও হয় ভ্রান্ত, নয়তো অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, কিংবা নেহাতই আত্মস্বার্থ বুদ্ধির কারণ উক্ত প্রক্রিয়ায় সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। সেদিন সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়ায় সম্বিত হারিয়ে তাঁরা নজরুলের কবিতা ও গানে সর্বজন পরিচিত পঙক্তিমালা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে এগিয়ে আসেন। এর ফলে কবির বিখ্যাত গান "চল্ চল্ চল্"-এর "নব নবীনের গাহিয়া গান/সজীব করিব মহাশ্মশান" হল "নব নবীনের গাহিয়া গান/সজীব করিব

গোরস্থান"। তাঁর অনবদ্য শিশুতোষ কবিতা "ভোর হল দোর খোল"-র "জয় গানে ভগবানে তুষি বর মাগো রে" হল "জয় গানে রহমানে তুষি বর মাগো রে"। এসব উদ্যোগ যে কি রকম নির্বোধ, অবিবেচনাপ্রসূত ও হঠকারী ছিলো তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আরো দু একটি তথ্যের উল্লেখ করছি। ১৯৪৯ সালে গঠিত পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটির সংস্কার সাব-কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী "আমি তোমায় জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না" বাক্যটি কোনো মুসলমানের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ কোনো মুসলমান জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে না। মুসলমান প্রেমিক-প্রেমিকা বড় জোর এই বলতে পারে যে "আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না"। সেই সময় আমাদের জনৈক কবি পরামর্শ দেন যে আমাদের উচিত হবে দাতা কর্ণের বদলে দাতা হাতেম লেখা, বিদ্যাদিগ্গজের বদলে এলেমের জাহাজ, অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের বদলে অনেক পীরে মোজেজা নষ্ট, বাঘের মাসীর বদলে বাঘের খালা ইত্যাদি বলা। একজন শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক ও ব্যঙ্গরচয়িতা পূর্বপাকিস্তানী বাংলার আঞ্চলিকীকরণের স্বপক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী "অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যকে গণসাহিত্য করিবার প্রয়োজনের তাগিদে যে কারণে কলকাতার কথ্যভাষাকে সাহিত্যের সম্মান দিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথ্যভাষাকেও আমাদের সাহিত্যের ভাষায় মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী কোন নিজস্ব ভাষা ঢাকার নাই; তাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গোড়াতে কলিকাতারও ছিল না.... পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক ডায়ালেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুরী ডায়ালেক্ট যেমন তাদের ভাষিক একতার নিয়ক্লিয়াস হইয়াছিল, আমাদের বিক্রমপুরী ডায়ালেক্ট তেমনি ঢাকাইয়া বাংলার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।" পাকিস্তানি শাসনের এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট আইউব খান আরো সাংঘাতিক বৈপ্লবিক(?) পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন। বাংলা ও উর্দু মিলেজুলে একটা নতুন পাকিস্তানি ভাষা তৈরি করার চেষ্টার কথা বলেছিলেন তিনি। তাছাড়াও পাকিস্তানি স্বৈরাচারী দুঃশাসনের আমলে বাংলা বর্ণমালা, বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতির সংস্কার, বাংলাভাষা সরলীকরণ, রোমান হরফে বাংলা লেখা প্রবর্তন প্রভৃতি উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষাকে, এবং সেইসূত্রে বাংলাসাহিত্যকে, দুর্বল ও বিকৃত করে বাঙালি সংস্কৃতিকে পঙ্গু ও খণ্ডিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছিল। কিন্তু ওইসব প্রয়াস সফল হয় নি। প্রতিক্রিয়াবিরোধী শক্তিসমূহ প্রথম থেকেই এসব উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলাভাষা আন্দোলনের কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। ১৯৫২ সালের গৌরবদীপ্ত ভাষা আন্দোলনের কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু আমরা কেউ কেউ সম্ভবত মনে রাখি না যে, ১৯৪৭-এর শেষ ভাগে ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই যখন বাংলাভাষা তথা বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার প্রথম উদ্যোগ গৃহীত হয় তখনই তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৪৮ সালের শুরুতে কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে মি. জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সদম্ভ উক্তি ও তার বিরুদ্ধে

কতিপয় শ্রোতার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন, তারও কিছুদিন আগে মন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে ঢাকা জেলাবোর্ড হলে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সংগ্রামী প্রতিবাদী সভা এবং ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলা ভাষা আন্দোলনের গণহরতাল প্রভৃতির কথা অবশ্য স্মরণীয়। এই সব আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি। বাঙালির আত্মপরিচয় সংহতকরণে তার সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে এর ভূমিকা অপরিসীম। অবশ্য ১৯৫২-এর পরেও বাঙালির ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয়া ঔপনিবেশিক শাসক-শোষকদের চক্রান্ত থেমে যায় নি। কিন্তু আমাদের ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতিকে তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়ে বিকশিত হবার বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত প্রতিরোধ করে দেশের সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কার্যাবলী। এরাই বাঙালি সংস্কৃতির উপর চরম বিধ্বংসী কুঠারাঘাত হানতে দেয় নি। এদের জন্যই বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি বা রোমান হরফ চালু হয় নি, বাতিল হবার পরিবর্তে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসনামলেই সারা বাংলাদেশে পরম উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হয়, বাংলাসাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি পায়, এবং সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার পরিবর্তে একটা উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, জীবনধর্মী, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করে। ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ সেদিন মেয়েদের টিপ পরা, উৎসব অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা, বাংলা নববর্ষ পালন করা, ঋতুভিত্তিক বসন্ত উৎসব কি বর্ষবরণের আয়োজনসহ বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন সহজ স্বাভাবিক প্রকাশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। শোষণবাদী শক্তি নিজেদের শোষণকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই ধর্মের অপব্যাখ্যা করে সংস্কৃতির প্রশ্নে সুপরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়েছিলো সেদিন। কিন্তু সে প্রয়াস সফল হয় নি। বাঙালি সংস্কৃতির দীপ্ত চেতনাকে আশ্রয় করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকশিত হলো। এবং তারপর ধাপে ধাপে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ওই প্রগতিশীল ধারাসমূহ আরো উজ্জ্বল ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠলো। "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।" "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা", "জয় বাংলা" প্রভৃতি শ্লোগানের মধ্য দিয়ে শুধু বাঙালির সংস্কৃতি একটি সংগ্রামী চরিত্রেও তার যৌথ অবচেতনা দানা বেঁধে উঠেছিলো। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে এরই প্রতীকী প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি কতিপয় ক্ষেত্রে। আমাদের জাতীয় ফুল হল শাপলা, জাতীয় পাখি দোয়েল, জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের গান "সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি", টেলিভিশন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক সুর মূর্চ্ছনা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান "ধন ধান্য পুষ্পভরা"-র সুর, সামরিক কুচকাওয়াজের গান নজরুলের "চল্ চল্ চল্"।

কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই; বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের পর চার বছর পূর্ণ হবার আগেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ নিজেদের নতুন করে সংহত করে নিয়ে

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যোগসাজসে বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং সেইসূত্রে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ থেকেই আমাদের সুস্থ জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। পরে এরই পর্যায়ক্রমিক বিকাশ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত করে এবং অনিবার্য করে তোলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু বিগত এক যুগাধিক কাল ধরে যেসব শক্তি এক সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলো, যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি বাঙালি সংস্কৃতিকে কখনো অন্তর থেকে স্বীকার করে নি, সেই প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহ একদা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত বিষয়গুলিকে নতুন বিতর্কের বস্তু করে নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় জীবনে সর্বধ্বংসী বিরোধের বীজ বপন করে চলেছে। এরাই এখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে আবার প্রশ্ন তুলছে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নতুন করে অপপ্রচার চালাচ্ছে, নজরুলকে আবার উপস্থিত করছে খণ্ডিতরূপে। এদেরই উদ্যোগে আমরা প্রায় চেতনাহীন, জড়বুদ্ধি, অসুস্থ, প্রতিবাদে অক্ষম, এককালের মহাবিদ্রোহী নজরুলকে তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগে দেখলাম কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে সরকারিভাবে সংবর্ধিত হতে। কাজী নজরুল ইসলাম মাঝে মাঝে মাথায় টুপি পরতেন বৈ কি, বিশেষ করে সভা সমিতি বা অনুষ্ঠানে, কিন্তু সে টুপি ছিলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামী ঐতিহ্য-ঘেঁষা নেতাজী সুভাষ বসুর ধাঁচের টুপি, কদাপি আমাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গমাখা কিস্তি টুপি নয়। এমনিতে এগুলি তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহ যখন সুপরিকল্পিতভাবে এই সব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় তখন আর তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা যায় না।

বাঙালি সংস্কৃতির প্রশ্নে, তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে, সাধারণ সরল দেশবাসীর মনে নানা কূটচালের মাধ্যমে দ্বিধা ও সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পারলেই যে প্রতিক্রিয়ার চক্রের স্বার্থ অনেকখানি রক্ষিত হবে এটা তারা ঠিকই বোঝে। সেই উদ্দেশ্যেই তাদের কোনো কোনো মহল ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবস পালন করে না, আয়োজন করে বাংলা ভাষা দিবসের। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের অপরাধে(?) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কতিপয় ছাত্রকে বহিষ্কার করার ঘটনার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। ওই একই উদ্দেশ্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাঙালি বনাম বাংলাদেশীর এক অনাবশ্যক অর্থহীন বিতর্কের ধূম্রজাল। অথচ বিষয়টির মধ্যে বিতর্কের কিছু নেই। এক দিক থেকে প্রশ্নটি খুব নতুনও নয়। একসময় পশ্চাদমুখী রক্ষণশীল ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়ার চক্র 'আমরা বাঙালি না মুসলমান' এই প্রশ্নকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেছিলো। কিন্তু তারপর বাঙালি মুসলমান ঘরে ফিরতে শুরু করে, সংস্কৃতি সম্পর্কে তার চিন্তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে এবং তারা উপলব্ধি করে যে তারা একাধারে বাঙালি

ও মুসলমান, এবং এর মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই। আজ বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের নাগরিকরূপে তারা নিজেদের পরিচয় দিতে পারে একই সঙ্গে বাঙালি, মুসলমান ও বাংলাদেশীরূপে।

বাংলাদেশীরূপে আজ আমাদের দেশের একজন মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে একদা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে একটি জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তার সে-পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে তার পাসপোর্টে, যে অন্য কোনো দেশের নাগরিক থেকে সবার সামনে তার একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট পরিচয় দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরে। মুসলমান হিসাবে সে নিজেকে আবিষ্কার করে একটা ধর্মীয় বৃত্তের মধ্যে, যা একান্তভাবে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অন্তর্গত, এবং যা তাকে বিশ্বের সকল ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে এক আত্মিক মেলবন্ধনে বেঁধে দেয়। আর বাঙালিরূপে সে নিজেকে আবিস্কার করে একটা গৌরবদীপ্ত ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকারী হিসাবে, যেখানে কোনো ভৌগোলিক গণ্ডী বা ধর্মীয় বৃত্ত মুখ্য নয়, বরং নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক বিবেচনাই বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। বিশ্বের মানুষের এই জাতীয় একাধিক পরিচয়ের বিষয়টি নতুন কিছু নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিচয় একই সঙ্গে পাঞ্জাবি ও ভারতীয়, তামিল ও ভারতীয় গুজরাটি ও ভারতীয়, বিহারি বা ওড়িয়া ও ভারতীয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিচয়ও তেমনি একই সঙ্গে পাঞ্জাবি ও পাকিস্তানি, বালুচ ও পাকিস্তানি, পাঠান ও পাকিস্তানি ইত্যাদি। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলির মানুষের একটা পরিচয় হচ্ছে যে তারা সবাই আরব। সেখানে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের পরিচিতির মুখ্য উপাদান। অন্য পরিচয়ে তারা কেউ কুয়েতি, কেউ জর্দানিয়, কেউ সৌদি, কেউ বা অন্যকিছু। পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি উভয় রাষ্ট্রের মানুষের একটা পরিচয় এই যে তারা সকলেই জার্মান। এই পরিচয়ে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি যে জার্মান মানস গড়ে তুলেছে তার উপরই প্রধান ঝোঁক ন্যস্ত। তাদের অন্য পরিচয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ে, তারা কেউ জিডিআর-এর নাগরিক, কেউ এফআরজি-র নাগরিক। সেখানে গুরুত্ব পাচ্ছে দুটি ভিন্ন জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে তাদের নাগরিক সত্তার ভিন্নতাটুকু। দুটি সত্তাই যথার্থ ও দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। কোন সত্তাটি কখন প্রধান হয়ে উঠবে তা নির্ভর করবে স্থান কাল পরিবেশ পরিস্থিতি তথা সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের উপর। আজ কোনো কোনো মহল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিতর্ক তুলে আমাদের বাঙালি মানস ও সংস্কৃতি তথা আমাদের বাঙালি পরিচয়কে অবমূল্যায়িত করে এক অহেতুক ও চরম ক্ষতিকর সঙ্কট সৃষ্টি করে চলছে। এর সুযোগ নিয়েই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিগুলি আবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা ম্লান ও ধূসর হয়ে তার জায়গায় ধর্মান্ধতার কালো মেঘ সুস্থ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে বসেছে, আমাদের আত্মপরিচয়কে ঘোলাটে করে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গনে সঙ্কীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী নতুন প্রতিক্রিয়াশীলতার জাল বিস্তৃত হচ্ছে। শুধু নিজেদের নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করতে

চাইলেই আমরা এই সত্য বিস্মৃত হতে পারি যে উগ্র জাতীয়তাবাদই হচ্ছে ফ্যাসিবাদের সূতিকাগার।

আমরা অবশ্যই বাংলাদেশী। এতো তর্কাতীত স্বতঃসিদ্ধ। আমরা বাঙালিও। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। ভারতবর্ষের পশ্চিমবাংলার লোকও বাঙালি। অবশ্যই তারা ভারতবর্ষের বাঙালি, আমরা বাংলাদেশের বাঙালি। মনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আমাদের উভয়ের অতীতের যৌথ সংস্কৃতি ও সভ্যতা। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি উভয়ের ক্ষেত্রে এমন একটা বাঙালি মানস গড়ে তুলেছে সেখানে সহমর্মিতার স্বরূপ প্রকট। আবার এটাও সত্য যে উভয়ের মধ্যে একটি স্তরে পার্থক্যও রয়েছে। পশ্চিমবাংলার মানুষের বাঙালিত্বের উপর অভিঘাত পড়ছে। তাদের বাঙালিত্বের চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে রয়েছে ভারতীয়ত্বের চেতনা; যা আমাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং আর্থ-সামাজিক একান্ত বাস্তব পরিবেশ দু অঞ্চলে বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশধারায় ভবিষ্যতে একটা সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলবে। '৫২-র ভাষা আন্দোলন ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ আর তাদের মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতি আমাদের দেশের মানুষের চেতন-অচেতন মনে এই আতঙ্ক বিকাশধারার অন্যতম নিয়ামক শক্তি রূপে কাজ করবে। একই সঙ্গে বহুক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ও ঘটতে থাকবে, সাংস্কৃতিক ঐক্যও দৃঢ়তর হবে। কিন্তু এসব ঘটতে দিতে হবে সহজ বিকাশের পথ ধরে, নির্বাচন-গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয়ের স্বাভাবিক ধারা অনুসরণ করে। উগ্র জাতীয়তাবাদ, কূপমণ্ডূকতা, সঙ্কীর্ণ বর্জননীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক ফরমান উপরোক্ত বিকাশধারাকে ত্বরান্বিত ও মসৃণ না করে তাকে বিভ্রান্ত, বিকৃত ও পঙ্গু করবে। আমরা আমাদের বাঙালিত্বকে আশ্রয় করেই আমাদের বাংলাদেশীয়ত্বকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারবো। ওই পথেই আমাদের আত্মপরিচয় লাভের প্রয়াস পূর্ণতা পাবে। একাজে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিই হবে অন্যতম আলোকবর্তিকা, কোনো গতানুগতিক ধর্মীয় চেতনা নয়। আমরা বাঙালি আজ যদি একথা বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করি তবে হয়তো আগামী কোনো এক দিন আমরা বাংলাদেশী একথা বলবার অধিকারও আমরা হারাবো।

[*অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*]



বাংলাদেশে শিক্ষানীতি ও তার ইতিহাস : সাংবিধানিক উৎস

ড. শরিফা খাতুন

সংবিধান একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জাতির আদর্শ ও দর্শন সংবিধানে প্রতিফলিত হয়। জাতীয় নীতির উৎসও সংবিধান। শিক্ষানীতিও এই দলিলের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়।

গত চার দশকে বাংলাদেশে বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে নতুন সংবিধান তৈরি হয়েছে, কখনও আমূল সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানের সংকটের জন্য জাতীয় নীতি তথা শিক্ষানীতিও দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে দীর্ঘ চার দশক সময় পর্যন্ত বাঞ্ছিত ও সুস্পষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হতে পারে নি।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কিত এ কয়েকটি অনুমান পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে—

প্রথমত, প্রাক স্বাধীনতা যুগে জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণে সংবিধানের ভূমিকা ছিল পরোক্ষ।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ে সংবিধান বাতিল বা পরিবর্তিত হলেও জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকাল ধরে অপরিবর্তিত ছিল।

তৃতীয়ত, পুনঃপুনঃ সংবিধানের পরিবর্তনের ফলে জাতীয় শিক্ষানীতিতে সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের সংবিধান ও শিক্ষানীতি

ভারত বিভাগের পর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়ে সংবিধানের ইতিহাস বৈচিত্রপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। প্রথমেই সংবিধান রচনা নিয়ে সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে 'আদর্শ প্রস্তাব' বিলম্বে প্রণীত হয়। এরপর প্রথম সংবিধান দীর্ঘ নয় বছর পর গৃহীত হয় পুনরায় দেড় বছরের ব্যবধানে নতুন সংবিধান বাতিল হয়। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান অপর একটি সংবিধান রচনা করেন। ষাট দশকের শেষে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে খসড়া সংবিধান ও লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার প্রণীত হয়। তবে শিক্ষণ ক্ষেত্রে শেষোক্ত দুটি সাংবিধানিক দলিলের ভূমিকা নেই। পাকিস্তান আমলে সংবিধান প্রণয়ন নিয়ে

১ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা, জুন - ১৯৮৮

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা : পর্যায় বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শিশির কুমার ভট্টাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় মানেই একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। অতীতের অনেক উন্নতমান সভ্যতার কথাও আমরা জানি যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নামক সংস্থাটির কোন অস্তিত্ব ছিল না। শিক্ষার সামাজিক মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সমাজের প্রত্যাশাও তাই সবচেয়ে বেশি। বর্তমান যুগে যে কোন দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মূলত তিনটি। শিক্ষাদান, গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন এবং সমাজের কল্যাণে লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগ। অবশ্য অনেকের মতে, "Training and bringing up of high ranking experts and development of science and technologly are two basic tasks of university education" অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নই কি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র লক্ষ্য? মানুষ কি রোবট? মনন বা সমাজ ও সংস্কৃতির চর্চার কি কোন প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির বিরোধ কোথায়? সংস্কৃতি একটি সৌন্দর্য যা মানুষের চিন্তা ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তরণ ঘটায়। আর বিজ্ঞান হলো মহাজগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে মানুষ যা অনুভব করে সেই অনুভূতিরই অভিব্যক্তি। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে মানব অনুভূতিরই প্রকাশ। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় বলেছেন, "বিজ্ঞান যেমন সত্য, সৌন্দর্যও তেমনি সত্য। বিজ্ঞানের সহিত সুষমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী নহে।" সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা আছে। গোড়ার দিকে বিজ্ঞান চর্চা মানেই ছিল জ্ঞানার্জন, কৌতূহল প্রশমন এবং নতুন নতুন সমস্যা ও বিস্ময় সৃষ্টির আনন্দ। বিজ্ঞানীরা পণ্ডিত বলে আখ্যায়িত হলেও সমাজে তাঁদের তেমন কদর ছিল না। কালক্রমে যখন দেখা গেল যে বিজ্ঞান মানুষের অন্ন বস্ত্র যোগাতে সক্ষম তখনই সমাজে বিজ্ঞানীরা সমাদৃত হলেন। একদল প্রয়োগবিদ তৈরি হলো যারা বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, যানবাহন,

২য় বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৯৮৯

বিনোদন প্রভৃতি নানা আয়োজন মেটাতে সক্ষম হলেন। এভাবেই বিজ্ঞান ও সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হলো। সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমাজকে বাদ দিয়ে নয়। মনন চর্চার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের ভূমিকা কম গুরুত্বের নয়। মনন চর্চা মানুষের মনকে পরিশীলিত করে, বিজ্ঞান মানুষকে করে তোলে যুক্তিবাদী। তাই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার লাভ মানেই একটি জাতির সার্বিক অগ্রগতি।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস খুব গৌরবের নয়। পঞ্চাশ বছর আগেও এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার যে ধারা প্রচলিত ছিল, আজ পঞ্চাশ বছর পরেও বলতে গেলে সেই একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতার ফলে স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত এই উপমহাদেশের তেমন কোন বিজ্ঞান চর্চা গড়ে ওঠে নি। ব্রিটিশ সরকার এদেশে কিছু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেও তার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারা কিছু কর্মী বাহিনী তৈরি করা। সৃজনকারী প্রতিভার বিকাশ ঘটানো তাদের কোন উদ্দেশ্য ছিল না যদিও স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কয়েকজন বিরল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতের সৌভাগ্য যে স্বাধীনতা লাভের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্বকে তারা পেয়েছিল তাদের নেতা হিসেবে। তাঁরই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞান পরিকল্পনার ফলে ভারত আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণদরদী সরকার খুব বেশি একটা পাই নি। আমাদের অধিকাংশ সময় কেটেছে সামরিক শাসনের বন্ধ্যাত্বের মধ্যে। অন্ধ কুসংস্কার বর্জিত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি আমরা কখনোই পাই নি। ফলে জনকল্যাণমুখী বিজ্ঞান চর্চাও এদেশে গড়ে ওঠে নি। ব্রিটিশ প্রভুদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া শিক্ষাব্যবস্থাই এখনও চলে আসছে। অর্থাৎ 'নিজে শিখ এবং অপরকেও শিখাও' নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এদেশের বিজ্ঞান তথা গোটা শিক্ষাব্যবস্থা। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞানের যে কোন ভূমিকা থাকতে পারে দেশবাসীর মধ্যে সে বোধ এখনও জন্মায়নি। ফলে গড় ওঠেনি কোন স্বনির্ভর বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি। পরিকল্পনাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থার অনিবার্য সৃষ্টি ক্ষুধা, বেকারত্ব এবং এক শ্রেণীর ব্যুরোক্র্যাট। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অভ্যন্তরেও বিরাজ করছে এক নৈরাজ্য। শিক্ষকরা তাঁদের পেশার প্রতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। ছাত্ররা হারিয়ে ফেলেছে শেখার প্রতি তাদের আগ্রহ। তাদের মূল লক্ষ্য এখন পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট। এসব বিষয়ে আলোচনা করতে হলে হয়তো আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করতে হবে। তবে আমাদের বিজ্ঞান পরিকল্পনা এবং শিক্ষাপদ্ধতি যে বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতির অন্যতম কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মুমূর্ষু জাতিকে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের

অভিশাপ থেকে বাঁচাতে হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে হলে আমাদের অবিলম্বে প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু বিজ্ঞান পরিকল্পনা এবং শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন।

বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রধানত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন পঠনীয় বিষয়সমূহের তালিকা বা পাঠ্যসূচি, পাঠ্য পুস্তক, ছাত্র ভর্তি ও শিক্ষক সমস্যা, শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা প্রাপ্তদের কর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব এবং আমাদের ভূমিকা।

পাঠ্যসূচি

নিউটন নাকি সারাজীবন জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়িয়েছেন। আধুনিককালের জ্ঞানের ভাণ্ডার এতই সমৃদ্ধ যে নিউটনের সেই সমুদ্র আজ মহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। একটি বিষয় নিয়ে সারাজীবন অধ্যয়ন করলেও অনেক কিছুই অজ্ঞাত থেকে যায়। তাই জ্ঞান সাধনার জন্য পাঠ্যসূচি নির্ধারণ অনেকটা তামাশার মতোই শোনায়। তবু আমাদের জীবন যেহেতু ছোট এবং তার মধ্যে আবার খুব কম সময়ই আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের জন্য ব্যয় করতে পারি তাই এই স্বল্প সময়ে কোন বিষয়ে পারঙ্গমতা লাভের জন্য সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবে আমাদের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। সহজ থেকে কঠিন এই ধারণার ভিত্তিতেই বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যসূচি তৈরি করা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞানের দুটি শাখায় শিক্ষাদান করা হয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং প্রয়োগ বিজ্ঞান। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি প্রণয়নে বিষয়সমূহের সাম্প্রতিক অবগতির প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মানগত যে পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয় তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমাদের পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি সামনে রেখেই কলেজ এবং কলেজকে সামনে রেখে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। স্কুল বা কলেজের পাঠ্যক্রম নির্ধারণে তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানই বিভিন্ন প্রযুক্তির জন্মদাতা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের একটি মাত্র তত্ত্ব থেকে বহু প্রয়োগিক বিজ্ঞানের জন্ম হতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রযুক্তির চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োগ বিজ্ঞানের পাঠ্য তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন। আমাদের দেশ প্রধানত কৃষি নির্ভর। একজন প্রয়োগিকের তাই কৃষি, অর্থনীতি এবং সমাজ কাঠামো সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। প্রয়োগ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে এই বিষয়সমূহের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞান শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণিত। গণিত আজ শুধু বিজ্ঞানের ভাষাই নয়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও বটে। বিজ্ঞানের যে জগতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি এমন কি কল্পনা শক্তিও প্রবেশ করতে অক্ষম গণিতের সেখানে অবাধ যাতায়াত। বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে গণিতকে তাই প্রাধান্য দিতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক

পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্যতম প্রধান অঙ্গ। পাঠ্যসূচি সামনে রেখেই সাধারণত পাঠ্যপুস্তক বা টেক্সট বই প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। তবে উৎকৃষ্টমান যে কোন টেক্সট বইয়ের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

(১) বিষয়ের মৌলিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ,
(২) বিষয়ের সাম্প্রতিকতম অগ্রগতির প্রতিফলন এবং
(৩) সহজ ও কঠিনের সমন্বয়ে সৃজনীশক্তির বিকাশে গুরুত্ব আরোপ।

আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে যাঁরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করে থাকেন তাঁদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত নন। প্রায়শই তাঁদের মধ্যে সহজ সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থ করার উপযোগী বই রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মৌলিক গুণাবলীর দিকে তাঁদের যতটা না লক্ষ্য তার চেয়ে বেশি লক্ষ্য থাকে ব্যবসায়িক দিকে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বইগুলিও যে সব ক্ষেত্রে টেক্সট বই হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী তা নয়। তবে রেফারেন্স বই হিসেবে অবশ্যই ব্যবহারের উপযোগী। পাঠ্যপুস্তকের এই সঙ্কট উত্তরণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগসমূহ উদ্যোগ নিতে পারে। প্রত্যেক বিভাগে একটি করে পাঠ্যপুস্তক সেল গঠন করা প্রয়োজন। এই সেলগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হবে বিশেষজ্ঞ দ্বারা ফরমায়েসী পুস্তক রচনা।

ছাত্র ও শিক্ষক

যে কোন উপবৃত্তেরই দুটি উৎকেন্দ্র বা ফোকাস (focus) থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় নামক উপবৃত্তটিরও দুটি ফোকাস আছে, ছাত্র ও শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে তাই ছাত্র ও শিক্ষকের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সর্বোচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা তাই বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ও শিক্ষকের সমাবেশই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যারা পড়তে আসছে তাদের অধিকাংশেরই উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্যতা নেই, অথচ তারা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে এসে ঠিকই ভিড় করে। কারণ চাকরির বাজার মন্দা। প্রত্যেকেই মনে করে এমএ পাশ করলে হয়তো একটা চাকরি জুটে যেতেও পারে। সবাই এমএ পড়ছে, সুতরাং আমিই বা পড়ব না কেন। আমরাও ছাত্রদের এই চাপের মুখে বিশ্ববিদালয়ের আসন সংখ্যা সামর্থ্যের তুলনায় বাড়িয়েই চলেছি। ফলে উচ্চশিক্ষা পরিণত হয়েছে এক গণশিক্ষায়। ফলে শিক্ষার মান গেছে নেমে। তাই উচ্চশিক্ষা সীমিতকরণের কথা বলছেন অনেকে।

বিশ্ববিদালয়ের জন্য ভালো শিক্ষক পাওয়াও আজকাল দুরূহ হয়ে পড়েছে। কারণ ভালো ছাত্র ভালো শিক্ষা পেলে তবেই না ভালো শিক্ষক হবে। তবে এর মধ্যেও বিভিন্ন

পরীক্ষায় যারা ভালো ফল করছে তারাও অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক অবস্থা এসব উভয়ই নিম্নমুখী। শিক্ষকতার প্রমোশনও সহজে হবার নয়। সারাজীবন জ্ঞানের সাধনা করে সৃজনশীল অবদান রাখতে পারলে তবেই প্রমোশন সম্ভবপর। পক্ষান্তরে সমপর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনক্রম এক হলেও তাদের রয়েছে নানারকম সুযোগ-সুবিধা, ক্ষমতা এবং প্রমোশন পাওয়ার সহজ ব্যবস্থা। কাজেই একজন মেধাবী প্রতিভাবান সুশিক্ষিত যুবক শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হবেন কেন? অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বার্থে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ অপরিহার্য।

শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি

একজন বিজ্ঞান শিক্ষক শুধু বিজ্ঞানীই নন, একজন শিক্ষাবিদও বটে। শিক্ষাদানকালে একজন বিজ্ঞানীকেও তাই শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। ছাত্রছাত্রীরা যখন ক্লাসে আসে জগত ও জীবন সম্বন্ধে তাদের পুরনো ধ্যান-ধারণা নিয়েই আসে। এই ধারণা কখনও বা অস্পষ্ট কখনও বা ভ্রান্ত। এই ধ্যান-ধারণা ধর্মীয় সংস্কারের মতো এমনই বদ্ধমূল যে তাদের পরিহার করে নতুন সত্যকে গ্রহণ করা অনেক সময়ই খুব সহজ হয় না। একজন বিজ্ঞান শিক্ষককে এই বাস্তব সত্যটি সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থেকে শিক্ষাদানে ব্রতী হতে হয়। বিজ্ঞান যে বাস্তব, কোন কল্পকাহিনী নয় এই সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আমাদের পুরনো শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক ওয়েজহাম বলেন, "To many young minds the traditional approach is so remote from the world in which they live that they decide that the whole business is quite irrelevant."

সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষাদানকালে যতটা সম্ভবপর বাস্তব উদাহরণ প্রয়োগ করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা হাতে-কলমে শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আস্থা অর্জন করাই একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আমার মনে হয় ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন,

(১) শিক্ষাদান ও গবেষণার সমন্বয় সাধন,

(২) শিক্ষাদানের দ্বারা গভীরতা এবং গতি,

(৩) বিষয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বা ঝোঁক এবং

(৪) ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি আস্থাশীলতা অর্জন।

শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের লব্ধ জ্ঞানের মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষার রেওয়াজ সব দেশেই আছে। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি যে সর্বত্রই এক তা কিন্তু নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যে

পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তাকে আমরা 'এ্যানুয়েল এগ্‌যামিনেশন সিস্টেম' বলে থাকি। এই সিস্টেমে বছরে বছরে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা চালু আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সম্মান কোর্স তিন বছরের। প্রতি বছরের জন্য আলাদা কোর্স নির্ধারণ করে তিন বছরে তিনটি পর্বে সম্মান পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। তৃতীয় পর্বের পরীক্ষা শেষে সকল পর্বের ফলাফল সমন্বয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। অনুরূপভাবে অনুসঙ্গী বিষয়সমূহের পরীক্ষাও দুটি পর্বে সমাপ্ত হয়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোর্স এক বছরের বলে উক্ত পরীক্ষা এক পর্বেই সমাপ্ত হয়। এখানে স্পষ্টই লক্ষণীয় যে প্রত্যেক সম্মান পরীক্ষার্থীকে কমপক্ষে পাঁচটি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। প্রতিটি পরীক্ষা নিতে এবং রেজাল্ট দিতে তিন থেকে ছয় মাস সময় লেগে যায়। সুতরাং অর্ডিন্যান্সের বিধি মোতাবেক সম্মান কোর্স সমাপ্ত করে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উন্নীত হতে সময় লাগে চার থেকে ছয় বছর। অর্থাৎ সেশনের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেশন জট নামক যে মারাত্মক ব্যাধিটি দেখা দিয়েছে তার অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে আমাদের পরীক্ষাবিধিও একটি কারণ। সঙ্গত কারণেই তাই বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তত্ত্ববিদরা মনে করেন যে বিজ্ঞান অনুষদের জন্য প্রকৃত কোর্স পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত যুগোপযোগী। কোর্স পদ্ধতিতে প্রতিটি বছরকে কয়েকটি টার্মে ভাগ করা হয়। প্রতি টার্মের জন্য কতগুলো ইউনিট এবং প্রতি ইউনিটের জন্য কোর্স ডিজাইন করে পরীক্ষা পদ্ধতি কেমন হবে, উত্তরপত্র মূল্যায়ন কীভাবে হবে, কতজন ইন্টারন্যাশনাল বা এক্সটারনাল থাকবে, কতদিন ছুটি ভোগ করা হবে ইত্যাদি সব বিষয় নিয়ে একটি কোর্স ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়। এই ক্যালেন্ডার অনুসারেই শিক্ষাদান করা হয়। এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা সব সময়েই একটা পড়াশুনার চাপে থাকে এবং তার ফলে নিয়মিত পড়াশুনার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেই পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। এখানে মুখস্থ বা নকলের অবকাশ কম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাদের যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাতে কোর্স ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা কতটা সম্ভবপর। ছাত্রছাত্রীদের আমরা হলে সিট দিতে পারছি না। তাদের না আছে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না আছে জীবনের নিরাপত্তা। অস্ত্রের ঝন-ঝনানি এবং সন্ত্রাসের মুখে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একের পর এক পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে। এ হেন অবস্থায় কোর্স পদ্ধতি অচল হয়ে পড়তে বাধ্য। যাঁরা বাস্তববাদী তাঁরা মনে করেন বর্তমান সামাজিক অবস্থায় আমাদের সনাতন পদ্ধতিতেই ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। সনাতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনেক কম, দ্বিতীয় বর্ষ শেষে সাবসিডিয়ারী এবং তৃতীয় বর্ষ শেষে সম্মান মাত্র দুটি পরীক্ষা। এক্ষেত্রে একটা সুবিধে হলো এই যে, কোন কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি দুই চার মাস অঘোষিত ছুটিও থাকে তাহলেও তিন বছরের মধ্যে একে সহজেই সামলে নেয়া যায়। এ কারণেই সনাতন পদ্ধতিকে অনেকেই great shock absorber বলে অভিহিত করে থাকেন। তবে সনাতন পদ্ধতির

কতগুলো ত্রুটিও রয়েছে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়াশুনার তেমন চাপ থাকে না। ফলে উদ্দাম তারুণ্যের পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতিতে বা বিলাসবহুল উপকরণ সজ্জিত শহুরে জীবনে মেতে ওঠা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। পরীক্ষার আগে কয়েকটি প্রশ্ন বেছে নিয়ে মুখস্থ করা বা নকল করার প্রবণতা তাই সহজেই চোখে পড়ে। সনাতন পদ্ধতির আরেকটি দুর্বলতা হলো অনুসঙ্গী বিষয়। যেহেতু শুধু পাশ করলেই চলে তাই ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও গুরুত্ব সহকারে অনুসঙ্গী বিষয়গুলো পড়ে না। ফলে তৃতীয় বর্ষে উন্নীত হয়ে সম্মান বিষয়ে শিক্ষা লাভে প্রায়শই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এইসব বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ যে সমন্বিত কোর্স পদ্ধতির সুপারিশ করেছে তা প্রণিধানযোগ্য। এই পদ্ধতির মূল বক্তব্য হলো মূল বিষয়ের সঙ্গে অনুসঙ্গী বিষয় একত্র করে সম্মান পর্যায়ের জন্য একটি সমন্বিত কোর্সমালা প্রণয়ন করে শিক্ষাদান। এই পদ্ধতির উল্লেখ করার মতো কয়েকটি দিক আছে। এখানে প্রতিটি কোর্সই গুরুত্ব সহকারে পড়াশুনা করতে হবে। অনুসঙ্গী বিষয়ের অপ্রাসঙ্গিক অংশসমূহ বাদ দিয়ে তৎপরিবর্তে মূল বিষয়ের প্রয়োজনীয় অধিকতর কোর্স সংযোজন সম্ভবপর হবে। আবার পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য অন্য বিভাগের মুখাপেক্ষীও হতে হবে না। কারণ এখানে প্রতিটি বিভাগই স্বনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার সংখ্যাও অনেক কমে যাবে। প্রয়োজন বোধে দ্বিতীয় বর্ষ শেষে একটি এবং তৃতীয় বর্ষ শেষে একটি এই মোট দুটি পর্বেই সম্মান পরীক্ষা সমাধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি একদিকে যেমন পারঙ্গমতা লাভের সহায়ক অন্যদিকে সেশন জট সমস্যার সমাধানেও সহায়ক হবে। বিজ্ঞান অনুষদের জন্য সমন্বিত কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন নিঃসন্দেহে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ।

কর্মসংস্থান

আমাদের দেশে বিজ্ঞানীর সংখ্যা মোট কত তা আমার জানা নেই। তবে বর্তমানে অধিকাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী যে তাঁদের লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের সুযোগ না পেয়ে অন্যান্য পেশা বেছে নিচ্ছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনেক বিজ্ঞানীই দেশ ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন। কাজেই বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থাকে যতই ঢেলে সাজান হোক না কেন যদি সমাজের কল্যাণে শিক্ষাপ্রাপ্তদের অধীত জ্ঞানের সদ্ব্যবহার না করা যায় তাহলে সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের কর্মসংস্থানের জন্য দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। এক, দেশের শিক্ষানীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্তদের অধীত জ্ঞানের সরাসরি প্রয়োগ এবং দুই, উচ্চতর গবেষণার সুযোগ। দেশের মেধাবী এবং প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের ধরে রাখার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের উভয় শাখায় গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন একান্ত প্রয়োজন।

প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব এবং আমাদের ভূমিকা

সমস্যাটা যত সহজে তুলে ধরা গেল সমাধান কিন্তু তত সহজ নয়। আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে, দেশের অর্থনীতিতে তার প্রতিফলন ঘটাতে হলে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রথমেই দরকার বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে দেশের প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এক সুষ্ঠু বিজ্ঞান পরিকল্পনা প্রণয়ন। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা, অভিজ্ঞ এবং যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় মেধা আকৃষ্ট করা, শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শিক্ষাপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদি কয়েকটি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। তবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে বহিরাগতদের প্রবেশ যদি বন্ধ করা না যায়, বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করে যদি আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে না। দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার ভবিষ্যত তাই নির্ভর করছে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনের সদিচ্ছার উপরে।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বিজ্ঞান উন্নয়নে তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাদেরও কিছু ভূমিকা আছে। যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, নতুন বিভাগ খোলা, সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকতার মান উন্নয়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। শিক্ষক হিসেবে আমাদেরও একটি বড় নৈতিক দায়িত্ব হলো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের দায়িত্ব পালন করা। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের প্রয়োগিক কর্ম সম্পাদনকালে যে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে সে বিষয়ে অবশ্যই অবহিত করা প্রয়োজন। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের এ সম্পর্কে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের সমস্যা ও তার সমাধানের আলোচনার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থীর নিকট বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োগিক কর্মের সামগ্রিক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের প্রজ্ঞা, সমাজ সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার উপরেই তাই নির্ভর করে আমাদের অনেকখানি ভবিষ্যৎ।

[*অধ্যাপক গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়* ।]

বিশ্বের পরিণতি

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

বিশ্বের এখন যৌবনকাল; আমরা তার যৌবনের ফসল। বিশ্বের শৈশব ছিল অবাধ বিপর্যয়ের কাল। এর জন্ম হয় অতি উত্তপ্ত, অতি ঘন অগ্নিকুণ্ডের বিরাট বিস্ফোরণে। আদিম আবর্তনশীল গ্যাস মেঘ থেকে ছায়াপথ (Galaxy)-সহ গঠিত হওয়ার পরেও, অনেক ছায়াপথই তাদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কোয়াসারের নৃশংসতার শিকার ছিল। আমাদের ছায়াপথ (Milky way)-সহ অধিকাংশ ছায়াপথই বর্তমানে কর্মমুখর। এ সমস্ত ছায়াপথে তারাসমূহের জন্ম হচ্ছে, বিবর্তন হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে। মাঝে মাঝে অত্যুজ্জ্বল নবতারার (Supernova) বিস্ফোরণে এই শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে, এবং সেই সঙ্গে নতুন তারাবংশের ভ্রূণের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক তারার চারপাশে হয়তো তাদের গ্রহসমূহ অবিচলিতভাবে অবিরাম গতিতে পরিভ্রমণ করে চলেছে। আর বিশ্বের চরম উৎকর্ষের সময়ে, হয়তো এই সমস্ত গ্রহের কোন কোনটায় প্রাণিসমূহ পরিপূর্ণভাবে জীবন উপভোগ করছে।

কিন্তু কারো যৌবনই চিরস্থায়ী নয়, বিশ্বের নয়। এ যৌবন অতিক্রান্ত হবে, বার্ধক্য আসবে। অবশেষে মৃত্যু এসে কি এ বিশ্বকে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবে? ছায়াপথসমূহও কি মরণশীল? এরাও কি জরায় আক্রান্ত হবে এবং শেষ তারাটি জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছায়াপথসমূহ কি অতি দীর্ঘ ভয়াবহ শীতল মৃত্যুর অপেক্ষা করবে?

জ্যোতির্বিদগণ, তাঁদের নানা প্রকার শক্তিশালী দূরবীক্ষণের ও ততোধিক শক্তিশালী তত্ত্বের সাহায্যে, বিশ্বের প্রসব বেদনা থেকে আরম্ভ করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রম নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। ওই সমস্ত তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানকে সময়ে সীমাবদ্ধ রাখে না; ভবিষ্যতে বিশ্বের পরিণতি কি হবে তারও সন্ধান দেয়। এই সমস্ত তত্ত্বের সাহায্যে প্রাপ্ত ফল কেবল কল্পনামাত্র নয়; আমরা জানি, বৈজ্ঞানিক বিধিসমূহ, গবেষণাগারে অণুবীক্ষণের নিচে যেভাবে প্রযোজ্য, সুদূর ছায়াপথ ও কোয়াসারেও সেগুলি সমভাবে প্রযোজ্য। আর এই বিধিসমূহ, সেই আদি বিরাট বিস্ফোরণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমভাবে প্রযোজ্য হয়ে আসছে। এবং সেই সমস্ত

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৯০

বিধি ও বিধি-সমন্বয়কারী তত্ত্বসমূহ অত্যন্ত নিশ্চিত নির্ভরতার সঙ্গে প্রয়োগ করে ভবিষ্যতে বিশ্বের পরিণতি কি হবে, তা নির্ণয় করা যেতে পারে।

আদি বিরাট বিস্ফোরণ বিশ্বে যে সম্প্রসারণ বেগ সৃষ্টি করে, সেই বেগ এখনও আছে, সম্প্রসারণ এখনও চলছে। ছায়াপথ-স্তবকসমূহ একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিরাট ছায়াপথ-স্তবকসমূহ তাদের প্রচণ্ড ভরবেগের জন্য আরো দূরে সরে যেতে থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ব কি চিরকাল সম্প্রসারিত হতেই থাকবে?

এটাই প্রধান প্রশ্ন। সুদূর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কোন প্রকার পূর্বাভাস দেওয়ার পূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। একটিমাত্র বল আছে, যা বিশ্বের সম্প্রসারণে বাধা দেয়; সেটি হল ছায়াপথ-স্তবকসমূহের ভিতরে পরস্পরের আকর্ষণ-বল বা মহাকর্ষ-বল। এই মহাকর্ষ-বলে, একটি পদার্থ অন্য একটি পদার্থকে আকর্ষণ করে; এবং ছায়াপথ-স্তবকসমূহের ভিতরে একই মহাকর্ষ-বল সম্প্রসারণ-বেগকে শ্লথ করতে চেষ্টা করে। এই হচ্ছে সম্প্রসারণশীল বিশ্বের ভরবেগ এবং সুদূরপ্রসারী মহাকর্ষ-বলের মধ্যে টানাপোড়েন। ছায়াপথের ভরবেগের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলে বিশ্ব অনন্তকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে থাকবে। অন্যদিকে মহাকর্ষ-বল প্রাধান্য লাভ করলে দ্রুত অপসারণশীল ছায়াপথসমূহের বেগ মন্দীভূত হতে থাকবে। এবং অবশেষে এক সময় অপসারণ থেমে যাবে। মহাকর্ষ-বলে ছায়াপথসমূহ আবার একত্র হবে। বিশ্ব সমস্ত পদার্থ একত্র হয়ে আপন ভরে ধসে পড়বে; একটা বিরাট অন্তঃস্ফোরণ (implosion) ঘটবে। আদি বিরাট বিস্ফোরণ যে ক্রমে বিশ্বের জন্ম দিয়েছিল, ঠিক তার বিপরীতে ক্রমে বিরাট অন্তঃস্ফোরণ ঘটতে থাকবে। এই সম্ভাব্য অগ্নিময় পতনকে 'big crunch' বলে; আমরা একে 'বিরাট ধস' বলতে পারি।

যদি মনে করা যায় যে, সুদূর ভবিষ্যতে মহাকর্ষ-বলই প্রাধান্য লাভ করবে, তাহলে সেই বিরাট ধসের সময়সূচি আমরা নির্ণয় করতে পারি। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ফ্রিম্যান ডাইসন শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের নিম্নরূপ চিত্র এঁকেছেন : বিরাট ধসের একশ কোটি বছর পূর্বে একত্রে অপসারণশীল ছায়াপথ-স্তবকসমূহের ভিতরের খালি জায়গা ভরাট হয়ে আসতে থাকবে। বিরাট ধসের দশ কোটি বছর পূর্বে পৃথক পৃথক ছায়াপথের ভিতরের জায়গা কমে আসতে থাকবে এবং সমস্ত ছায়াপথ একীভূত হয়ে যাবে। সারা বিশ্ব তখন কেবল তারা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। বিভিন্ন তারার ভিতরের দূরত্ব প্রায় আমাদের ছায়াপথের তারাসমূহের ভিতরের দূরত্বের মতোই হবে।

সারা আকাশ তারায় পরিপূর্ণ হবে, রাত্রি-দিনের কোন পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু এই সুন্দর অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হবে, ছায়াপথসমূহ একীভূত হয়ে যাবে, মহাকর্ষ-বল প্রবলতর হবে; তারাসমূহ পরস্পরের নিকটবর্তী হতে থাকবে। বিরাট ধসের এক লক্ষ বছর পূর্বে তারাসমূহ পরস্পরের এত কাছাকাছি চলে আসবে যে, আকাশ শুধু চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল হবে না, প্রচণ্ড রকমের উত্তপ্তও হবে। এই

অবস্থায় বিশ্বের কোন গ্রহেই কোন প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই উত্তাপে সমুদ্র উপগ্রহগুলো ফুটে বাষ্পীভূত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারাসমূহ এত নিকট দিয়ে যাবে যে, তাদের তাপে সমস্ত কঠিন শিলা দ্রবীভূত হয়ে যাবে, প্রচণ্ড উত্তাপে এই গলিত শিলাও ফুটে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিরাট ধ্বসে বিশ্ব লোপ পাওয়ার এক হাজার বছর পূর্বে, শ'য়ে শ'য়ে তারার ভিতরে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটবে এবং হাজার হাজার তারা একত্র হয়ে কালো গহ্বর (black hole)সমূহের সৃষ্টি করবে। বিরাট ধ্বসের শেষ অঙ্কে, এই সমস্ত কালো গহ্বর একত্র হয়ে একটাতে পরিণত হবে, আর এই একটার ভিতরে একদা-বিশাল বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও তেজ একটা অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হবে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন, বিরাট ধ্বস যদি ঘটেই, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা বিরাট বিস্ফোরণও ঘটবে, এবং নতুন একটি বিশ্বের সৃষ্টির সূচনা করবে। যদি এরূপ ঘটেও, তাহলেও, যে বিশ্বে মহাকর্ষের প্রাধান্য বিরাজমান, সে বিশ্বে জীবনের স্থায়িত্বের কোন সম্ভাবনাই নাই। বিরাট ধ্বসের বিধ্বংসী ঘটনার পরে কোন প্রাণীর পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব নয়।

বিরাট ধ্বসই শেষ পরিণতি, অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে চান না। তাঁদের মতে ছায়াপথসমূহের ভরবেগের প্রাধান্যই বজায় থাকবে; মহাকর্ষ সর্বদা দ্বিতীয় বল হিসাবেই কাজ করবে। ফলে বিশ্বের বিস্তৃতি অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকবে।

বিশ্বের বস্তুর গড় ঘনত্বই বিশ্বের পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করে। ছায়াপথের ভিতরের এবং আন্তঃছায়াপথের বস্তুসমূহকে সারা বিশ্বে সমভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কল্পনা করা যেতে পারে। যেহেতু অধিকাংশ স্থানই প্রায় বস্তুশূন্য অবস্থায় আছে, এইভাবে ছড়িয়ে দেওয়ায় বিশ্ব-বস্তুর গড় ঘনত্ব অত্যন্ত অল্প হবে। এক ঘন আলোকবর্ষ পরিমিত স্থানে বস্তুর গড় ভর যদি আমাদের চাঁদের ভরের সমান বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে মহাকর্ষ প্রাধান্য লাভ করবে; সে ক্ষেত্রে বিরাট ধ্বসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। আর যদি চাঁদের ভরের চেয়ে কম হয়, তাহলে বিশ্ব চিরদিন বিস্তৃত হতেই থাকবে। বৈজ্ঞানিকগণ যখন বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে সমভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার কল্পনা করে হিসাব করেন, তখন তাঁরা দেখতে পান যে, মহাকর্ষ প্রাধান্য লাভের জন্য যে পরিমাণ বস্তুর প্রয়োজন, তার মাত্র ত্রিশ ভাগের এক ভাগ বস্তু দৃশ্য বিশ্বে বিদ্যমান আছে।

বর্তমানে অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বে বিপুল পরিমাণে নিউট্রিনো নামে অদৃশ্য বস্তু ছড়িয়ে আছে। বিশ্বে এই নিউট্রিনোর পরিমাণ বিশ্বের সমস্ত দৃশ্য বস্তুর পরিমাণের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। এই অদৃশ্য বস্তু নিউট্রিনোর পরিমাণ যদি যথেষ্ট হয় তাহলে মহাকর্ষ প্রাধান্য লাভ করতে পারে। এই অদৃশ্য বস্তুর সরাসরি সন্ধান পাওয়া যায় না, তবে বর্তমান বিশ্বে তারা ও ছায়াপথসমূহের উপরে এর মহাকর্ষ প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। গত কয়েক বছর কয়েকজন জ্যোতির্বিদ চেষ্টা করেছেন— ঠিক কি

পরিমাণ নিউট্রিনো, কালো গহ্বর এবং ধূসর বামন তারার মতো অদৃশ্য বস্তুসমূহ বিশ্বে বিদ্যমান আছে, তা নির্ণয় করতে। তাঁদের মতে এই অদৃশ্য বস্তুর পরিমাণ দৃশ্য বস্তুর পরিমাণের চেয়ে অন্ততপক্ষে দশগুণ বেশি। যদি ছায়াপথের ভিতরে ও আন্তঃছায়াপথ স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ অদৃশ্য বস্তু থাকেও, তাহলেও উপরের হিসাব মতে দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর ভরের পরিমাণ মহাকর্ষের প্রাধান্য লাভের মতো যথেষ্ট নয়। সুতরাং আশা করা যায় যে, বিশ্ব অনন্তকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে থাকবে।

যখন সমস্ত ছায়াপথ-স্তবক দ্রুত অপসরণ করতে থাকবে, তখন বিভিন্ন ছায়াপথের ভিতরের দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তবে অ্যাণ্ড্রোমিডা ছায়াপথ সমেত, আমাদের স্থানীয় ছায়াপথ-স্তবকের (local group of galaxies) কয়েক ডজন ছায়াপথ আমাদের কাছাকাছি থাকবে। এখন থেকে ৫০০–৬০০ কোটি বছর পরে সূর্যের মৃত্যু ঘটবে; অন্তিম সময়ে সূর্য লোহিত দানব আকার ধারণ করে ফুলে উঠবে এবং পৃথিবীকে ধ্বংস করে ফেলবে। ততদিনে মানুষ হয়তো অন্য কোন তরুণ তারার গ্রহে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করে দেবে।

আমাদের ছায়াপথ চিরকাল ধরে তারা প্রসব করে যাবে, এমন আশা করা যায় না। অন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিমেঘ থেকেই সাধারণত তারাপদার্থ ঘনীভূত হয়ে তারাশিশুর জন্ম দেয়। যদিও মরণকালে তারাসমূহ কিছু পরিমাণ গ্যাস নিষ্ক্রান্ত করে, তবুও এর অধিকাংশ গ্যাসই শ্বেত বামন ও নিউট্রন তারারূপে তারার শবে আবদ্ধ থাকে। সময় যতই অতিবাহিত হতে থাকবে, আমাদের ছায়াপথের অধিকতর পরিমাণ বস্তু ততই মৃত ধ্বংসাবশেষ আকারে অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং নতুন তারার বংশ সৃষ্টির মতো গ্যাস খুব কমই অবশিষ্ট থাকবে। যে সামান্য পরিমাণ গ্যাস ছায়াপথে থেকে যাবে, তা কুড়িয়ে কোনমতে ছায়াপথের তারাবংশের দুই একটা শেষ বংশধরের সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের তারার রাজ্যের এই শেষ বংশধরেরা কোনমতে ছায়াপথের মৃত, শীতল, সঙ্কুচিত তারাসমূহের রাজ্যে বাতি দেখাবে, তাদের সমাধি আলোকিত করবে। এক সময়ে আমাদের তারার রাজ্যের এই শেষ বংশধরেরা মৃত্যুমুখে পতিত হবে, আমাদের ছায়াপথ একটা অন্ধকার মৃতের রাজ্যে পরিণত হবে।

এই কি শেষ পরিণতি, না এর পরেও আরো কিছু ঘটবার সম্ভাবনা আছে? বিজ্ঞান এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে সক্ষম। আমাদের তারার রাজ্যের শেষ বংশধর নির্বংশ হবে এখন থেকে প্রায় এক লক্ষ কোটি বছর পরে। এরও এক লক্ষ কোটি বছর পরে নতুন ঘটনার সূচনা হবে। বিলুপ্ত ছায়াপথে পরিভ্রমণশীল অন্ধকার শ্বেতবামন ও নিউট্রন-তারাসমূহ একে অন্যের পরিভ্রমণ পথের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ফলে কোন কোনটিতে হয়তো বা ছায়াপথ থেকে একেবারে বহিষ্কৃত হবে, কতকগুলো হয়তো এর কেন্দ্রস্থলে ঘনীভূত হবে এবং একত্রে সংযোজিত হবে। এর ফলে ছায়াপথের আদিবস্তু সমষ্টি দিয়ে একটা বিরাট কালো গহ্বরের সৃষ্টি হবে।

এখানেই শেষ নয়। কালো গহ্বর চিরস্থায়ী নয়: এরা অনবরত অব-পরমাণু-কণা (sub-atomic particle) ও বিকিরণে পর্যবসিত হয় এবং বিশেষ বিস্ফোরণে এদের পরিসমাপ্তি ঘটে। যে কালো গহ্বর এক সময় আমাদের ছায়াপথ ছিল, সেটা অসংখ্য কণা ও বিকিরণ স্রোতে বিস্ফোরিত হবে।

এরপরে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদেরও স্বচ্ছ ধারণা নেই। বিশ্ব তখন শূন্য অন্ধকার স্থানে পরিণত হবে। মাঝে মাঝে দুই একটা অব-পরমাণু-কণার সন্ধান পাওয়া যাবে। এই হল এক সময়ের উজ্জ্বল ছায়াপথের ধ্বংসাবশেষ।

ভিক্টোরিয়ান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বকে একটা ঘড়ির সঙ্গে তুলনা করতেন। সেটা একবার চাবি দেওয়া হলে চলতে থাকবে এবং ক্রমাগত চালনা শক্তি হারাতে থাকবে: অবশেষে এক সময় ক্রিয়াকলাপ শেষ হয়ে যাবে। কোন কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনে করেন, এমন কিছু ঘটতে পারে যাতে ঘড়ির স্প্রিংকে ধাক্কা দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং সেই কিছু হচ্ছে কালো গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'এককত্ব' (singularities)। কালো গহ্বরের বিস্ফোরণের পরে এই সমস্ত 'এককত্ব' বিশ্বে নগ্ন অবস্থায় বিরাজ করবে। এবং এই 'এককত্ব' এমন যে, এ একেবারে শূন্য থেকে বা একেবারে 'কিছুই নাই', থেকে তেজ, আলো, তাপ সৃষ্টি করতে পারে। এরা বিজ্ঞানের বিধি মানে না: আপনা-আপনি বস্তু গঠন করতে পারে। বিশ্ব হয়তো একটা নতুন অস্তিত্বের নতুন স্তরে উপনীত হবে।

মাত্র চারশ বছর পূর্বেও মানুষ বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং তারাসমূহ আকাশ-গোলকে বিদ্ধ পিনসদৃশ্য। এমনকি চল্লিশ বছর পূর্বেও আমরা জানতাম কখন কীভাবে বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। মাত্র ১৯৫৭ সালে স্পুটনিক মহাশূন্যে যাত্রার পথ প্রদর্শন করে। কয়েকশ কোটি বৎসরের বিশ্বের বা সৌরজগতের বয়সের তুলনায় এই সময় অতি নগণ্য। সাংঘাতিকভাবে সামান্যতম সময়ে, মাত্র ২৮ বছরের 'মহাশূন্য যুগে' মানুষ অদ্ভুত সফলতা লাভ করেছে। মানুষ এর মধ্যেই অন্য দুনিয়ায়, চাঁদে, পদচারণা করেছে, সেখানকার মাটি নিয়ে এসেছে: বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের কাছাকাছি গিয়ে আলোকচিত্র গ্রহণ করেছে: সৌরজগৎ অতিক্রম করে অন্য তারা পথে যাত্রা করেছে। ইতোমধ্যে মানুষ মহাশূন্যে বাস করবার এবং অন্য গ্রহকে বাসোপযোগী করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মানুষ যদি সময়কে জয় করতে পারে, তাহলে সে হয়তো ছায়াপথে বসতি স্থাপন করবে, হয়তো বা অতি রহস্যময় 'এককত্ব'কে পোষ মানিয়ে, বিশ্ব-ঘড়ির বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করবে। সূর্যের মৃত্যুর এখনও ৫০০-৬০০ কোটি বছর দেরি আছে। হয়তো লক্ষ কোটি বছর পরে আমাদের ছায়াপথের শেষ তারাটিও নিভে যাবে। এমনও হতে পারে, সে সময় মানুষ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে এই ধ্বংসলীলা দেখবে না; মানুষই হয়তো এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে

বর্তমানে কোন কোন জ্যোতির্বিদ মনে করেন যে, বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে মানুষের একটা আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমরা বিশ্বের গঠন প্রক্রিয়া ও ক্রিয়া পদ্ধতি যতই অবহিত হচ্ছি, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আমাদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর বিকাশের জন্য এ বিশ্ব আদর্শ স্থান।

বিকাশের যে দীর্ঘ ধারায় পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তার পাশাপাশি প্রয়োজন হয়েছে একই সঙ্গে সংঘটিত একটা পূর্ণ ঘটনাশৃঙ্খল। এদের কতকগুলো বেশ অস্পষ্ট। এদের মধ্যে দার্শনিক সীমারেখা থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার ফিজিকসের জটিলতা পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। বিশ্ব যে একটা সুশৃঙ্খল স্থান সে তথ্য দিয়েই আরম্ভ করা যাক। একবার একটা সুস্পষ্ট ধারা প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে। সাধারণত তার কোন পরিবর্তন হয় না। অন্য কিছুর জন্য যদি এই ধারার পরিবর্তন ঘটে, সেটাও ঘটে অন্য একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে। পরিবর্তনকারী কারণ জানা থাকলে, প্রকৃতির বিধি অনুযায়ী সে সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পৃথিবী প্রায় ৪০০ কোটি বছরে ধরে প্রায় একই পথে সূর্যের চারদিকে পরিভ্রমণ করছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে; মানুষের বিবর্তন ঘটেছে। এ সমস্তই ঘটেছে প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী। আমরা এমন একটা বিশ্বের কল্পনা করতে পারি, যেখানে প্রকৃতির বিধান অন্য প্রকারের; এমন কি কোন বিধান নাও থাকতে পারে। সেখানে পৃথিবী হয়তো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। একবার হয়ত বুধ গ্রহের কাছে গেল, পরবর্তী লাফে হয়তো মঙ্গলের কাছে গিয়ে হাজির হল। এমন একটা বিশৃঙ্খল বিশ্বে জীবনের বিকাশ ও বিবর্তন সম্ভব নয়।

আমাদের বিশ্ব যে কেবল সুশৃঙ্খল তাই নয়, এর প্রকৃতির বিধানসমূহও সযত্নে নির্বাচিত। মনে হয় যে, এই বিশ্বের প্রকৃতির বিধানসমূহ এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যেন সেগুলি বুদ্ধিমান জীবের বিকাশে সহায়তা করে। ব্রিটিশ বিশ্ব-তত্ত্ববিদ মার্টিন রিস বলেছেন, "দৈনন্দিন পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা এবং জ্যোতির্বিদ্যার সমস্ত দৃশ্য প্রধানত পদার্থবিদ্যার কয়েকটি মৌলিক বিধি এবং ধ্রুবক দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন পরমাণুসমূহের ভর এবং পরমাণুর ভিতর যে সমস্ত মৌলিক বল কাজ করে তাদের আপেক্ষিক শক্তির ভিতরে অনেক ক্ষেত্রেই একটা অতি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বা সুসমতা বিদ্যমান থাকে।"

উদাহরণস্বরূপ কেন্দ্রকণীয় বিক্রিয়ার উল্লেখ করা যেতে পারে। কেন্দ্রকণীয় বিক্রিয়া, প্রবল কেন্দ্রকণীয় বল ও বৈদ্যুতিক বলের সমতার উপর নির্ভরশীল। এই দুটি অণু-পরমাণু কণাকে আকর্ষণ করে এবং দ্বিতীয়টি তাদের বিকর্ষণ করে। আমাদের জন্য এই সমতা একটা ক্ষুরধার সীমার উপর অধিষ্ঠিত। কেন্দ্রকণীয় বল যদি সামান্য একটু দুর্বল হত তাহলে অণু-পরমাণুসমূহ একত্রে সংযোজিত হতে পারত না। ফলে একমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু ছাড়া অন্য কোন পরমাণুর সৃষ্টিও সম্ভব হতো না। অন্যদিকে এই

কেন্দ্রকণীয় বল যদি সামান্য পরিমাণে প্রবলতর হত, তাহলে বিরাট বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বের আদি সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হত; হাইড্রোজেনের কোন অস্তিত্বই থাকত না। হাইড্রোজেন দুভাবে আমাদের প্রয়োজনে লাগে। জীবন্ত কোষ যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা গঠিত, হাইড্রোজেন তাদের একটি প্রধান উপাদান। এই হাইড্রোজেনই একমাত্র জ্বালানি যা শত শত কোটি বছর ধরে সূর্যকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে পারে। আর জীবনের বিকাশের ও বুদ্ধিমান জীবের বিবর্তনের জন্য এই দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। অন্য কোন জ্বালানি এতদিন চলতও না, জীবন বিকাশের সুযোগও হত না।

দুর্বল কেন্দ্রকণীয় এবং মহাকর্ষ-বলও অনুরূপভাবে অতি সূক্ষ্ম সমতা বজায় রাখে। এর উপরে অব-পরমাণুকণার ভরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রোটনের ভর যদি তার চারপাশে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রন কণার ভরের চেয়ে ১৮৩৬ গুণ বেশি না হত, তাহলে পৃথিবীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া অন্য প্রকার হত। বিশেষ করে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল অণু (যেমন প্রোটিন, ডিএনএ ইত্যাদি) স্থায়ী হত না; ফলে জীবনের বিকাশ ও বিবর্তনও হত না।

এমনিভাবে দেখা যায় যে, বিশ্বে নানা প্রকার ঘটনা, বিশেষ করে জীবনের বিকাশ ও বিবর্তন, একে অন্যের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, এই সমস্ত ঘটনাকে 'হঠাৎ' ঘটে যাওয়া বলে চালিয়ে দেওয়া কঠিন। এটা স্বীকার করতেই হয় যে, বিশ্বে বিশেষ কতকগুলো বিধি কার্যকরী আছে বলেই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব আছে। প্রশ্ন জাগে, এই সমস্ত বিধি কার্যকরী হল কেন?

এই সমস্ত সমকালীন সংঘটিত ব্যাপার যাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন, সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের অধিকাংশই 'মানবীয় তত্ত্ব' (anthropic principle) নামে একটা পৃথক মতবাদে বিশ্বাস করেন। অতি দুঃসাহসী ভাষায় এই তত্ত্বে বলা হয় যে, 'আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই বিশ্বে এভাবে গঠিত'। কথাটা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ার মতো শোনালেও, এককভাবে এটা বোঝা যেতে পারে যে, প্রকৃতি বিপুল সংখ্যক পৃথক পৃথক বিশ্ব সৃষ্টি করেছে; এরূপ প্রত্যেকটি বিশ্বের নিজস্ব বিধি আছে; হয়তো বা কোন বিশ্বের তেমন কোন বিধি নাও থাকতে পারে। আমাদের বিশ্বের বিধিসমূহ জীবনের বিকাশ ও বিবর্তনের জন্যই নির্বাচিত হয়েছে।

যে সমস্ত বিশ্বে কোন বিধি নেই, তাদের পরিণতি বিশৃঙ্খলা; সেখানে কোন বুদ্ধিমান জীবের বিকাশের সম্ভাবনা নেই। যে সমস্ত বিশ্বের বিধিসমূহ সমতা রক্ষা করে না, সেখানে কোন দীর্ঘস্থায়ী তারা সৃষ্টির সুযোগ থাকে না; স্থায়ী রাসায়নিক দ্রব্য গঠিত হতে পারে না, অথবা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল যৌগেরও সৃষ্টি হতে পারে না। মার্টিন রিস বলেছেন "অধিকাংশ বিশ্বই মৃতবৎসা; এদের ভেতরে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে না. এদের ভেতরে সামান্য দুই একটিতে জটিল যৌগের গঠন হতে পারে এবং তা থেকে বুদ্ধিমান জীবের বিবর্তন ঘটতে পারে।" আমাদের বিশ্বে বুদ্ধিমান জীব আছে,

সে হল মানুষ। আমাদের বিশ্ব, বিশ্ব সমষ্টির একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র, যেখানে সুশৃঙ্খলা ও সু-সমতা বজায় আছে। বিশ্বে আমাদের অবস্থান যে সুশৃঙ্খল ক্ষুরধার সু-সমতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যে বিধি-বিধানসমূহ দ্বারা আমাদের বিশ্ব পরিচালিত তা থেকেই। এর কোনটার জন্য কোনটা হয়েছে সেটা 'ডিম আগে না মুরগি আগে' এই বিতর্কের মতো।

'মানবীয় তত্ত্ব' বিশ্বের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দেশ করে; আমাদের শরীর যে তারাধূলি দিয়ে গঠিত, এই প্রাকৃতিক তথ্য থেকে মহাশূন্য জয়ে বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার-সমস্ত স্তরেই একথা বলা চলে যে, বিশ্ব আমাদের প্রত্যেকের অংশ। মানুষ যদি সময় জয় করতে পারে, তাহলে সে ছায়াপথ পর্যন্ত বসতি বিস্তৃতি করতে পারবে। পাঁচশ বছরের কম সময় পূর্বে কলম্বাস নতুন দেশ আবিষ্কার করেছিলেন; এখন থেকে পাঁচশ বছর পরে মানুষ হয়তো তারার দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং হয়তো ৫০০,০০০ বছর পরে দুলক্ষ আলোক-বর্ষ দূরের অ্যান্ড্রোমিডা ছায়াপথের উদ্দেশে যাত্রা করতে পারবে।

মহাশূন্যের মহাসমুদ্রের তীরে আমরা সবেমাত্র পা রেখেছি। এই মহাসমুদ্র অশান্ত; মহাশূন্য হিমায়িত, বায়ুশূন্য এবং বিপজ্জনক বিকিরণ-রশ্মিতে পরিপূর্ণ। পালসার, কালো গহ্বর, অত্যুজ্জ্বল নবতারা বা সুপারনোভা প্রভৃতি মহাশূন্যের বিভিন্ন স্থানে ওত পেতে আছে। অবশ্য মানুষ এতে ভয় পাবে না বা তার অভিযান থেকে বিরত হবে না; যেমন হয় নি পৃথিবীর বাঘ-ভালুক, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র জয় করে পৃথিবীকে নিজের বাসস্থানে পরিণত করতে।

অধ্যাপক (প্রাক্তন) গণিত বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রয়াত, ২০ জুলাই, ১৯৯৩



অস্ত্রোপচার। তিনি রাজি হন নি। ঘাড় সামান্য বাঁকিয়েই তাঁকে চলাফেরা করতে হত। কণ্ঠস্বরটি ছিল গমগমে, তাঁর অন্তরের উচ্ছলিত স্নেহপ্রবাহের মর্মরে জিয়োনো।

অজিত দা বাংলাদেশ দেখে যান নি।

১৯৬৯ সালের ১২ নভেম্বর কুমিল্লা শহরের সুপারিবাগান এলাকায় নিজ বাসভবনে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। বেশিক্ষণ ভুগতে হয় নি তাঁকে। প্রচণ্ড হার্ট-অ্যাটাকের শিকার। অবিশ্যি এ সময়ে ঘোরতর মানসিক টেনশনের মধ্যে ছিলেন তিনি। তাঁর মত সুদক্ষ অধ্যাপক বেকার, চাকরি ছিল না। তিনি জীবিকা খুইয়েছিলেন। অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহিতা। ১৯৬৯-এর উত্তাল দিন। এক রাজাকার চিফ সেক্রেটারি এবং রাজাকার কিছু অধ্যাপকের ষড়যন্ত্রে তিনি চাকুরিচ্যুত হন। দাদার মৃত্যু সংবাদও পেয়েছিলাম একদিন পরে। আমার ১৯৬৯ সালের জার্নালে লেখা আছে...আর সহ্য হয় না। এতো মৃত্যু ধাক্কায় মুষড়ে-মুষড়ে কদিন আর বাঁচব?

.........অধ্যাপক অজিত গুহ, না, দাদা গত বারো তারিখে রাতে কুমিল্লায় নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

অজিতদা, তোমার এই প্রয়াণ আমি কিছুদিন মনে জায়গা দিতে পারব না। তোমার মৃত্যু অত সহজ নয়।..........

স্মৃতির বোঝা নিয়ে আমরা পেছনে পড়ে রইলাম।

১৪

ফ্রাইডে

২৮ কার্তিক

৩১ রমজান।

ধর্ম প্রচারক সব মহাপুরুষই বলে গেছেন, স্রষ্টার অধিষ্ঠান সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে। বহু মানুষ মহাপুরুষদের অনুসারী হয়। আবার বিরল সংখ্যক জীবন-যাত্রী ঈশ্বরের পথে এগিয়ে যান।

স্রষ্টার অনুসারী, সকল সম্প্রদায়ের উর্ধ্ব আপন আসন বিছিয়ে ছিলেন লোকান্তরিত অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ।

তুমি যেখানেই থাকো, আজ আমার সালাম গ্রহণ করো, হে নমস্য।

[*কথা সাহিত্যিক।*]

বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম ও বাংলা ভাষা

আলী আসগর

বাংলা ভাষাকে আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এবং শিক্ষার প্রতি স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুতরাং বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমও বাংলা হতে হবে। এটা একটা দাবি। একটা অনুসিদ্ধান্ত। কিন্তু বাংলাকে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রবর্তিত করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন স্তর পর্যন্ত বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করলে তা সুফলপ্রদ হবার সম্ভাবনা রাখে? এটা একটা প্রশ্ন। এ প্রশ্ন উপস্থাপন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটুক এ কথা প্রায় সবাই আমরা বলে থাকি। আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে সক্ষম না হলে আমাদের মত অনুন্নত দেশগুলো যে তাদের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে পারবে না সে ব্যাপারেও কোন মতানৈক্য নেই। কিন্তু কিভাবে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যগুলো কাজে লাগিয়ে আমাদের জীবনযাত্রায় অর্থনৈতিক প্রগতি সাধিত হতে পারে? সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট।

এর কারণ আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ধারা এখন পর্যন্ত কৃত্রিম ও উপরিগত। বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার সাধনে ও বিজ্ঞানকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে এনে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করার কাজে ভাষার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার যতটুকু ঘটেছে সেটা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ব্যাপার। ফলে, বিজ্ঞান শিক্ষার ভাষা কি হবে সে প্রশ্নটাও নতুন। এ ছাড়া ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তা ছিল মূলত প্রশাসন কাজের সহায়ক সৃষ্টির উদ্দেশ্য। শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর পাঠক্রমও সেইভাবে রচিত হয়েছিল। ফলে, বিজ্ঞান শিক্ষার ভাষা কি হওয়া উচিত? এ প্রশ্ন অতটা প্রাসঙ্গিক মনে হয়নি অনেকের কাছে।

বিজ্ঞান এক আন্তর্জাতিক ও সর্বকালীন বুদ্ধিগত ক্রিয়া। এর উদ্দেশ্য স্থান কাল নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান। নতুন সৃষ্টিশীলতায়, প্রগতি ও পরিবর্তন সাধন। যে অর্থে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্প কোন দেশের জাতীয় ঐশ্বর্য বা গর্ব সে অর্থে বিজ্ঞান জাতীয় বা প্রাদেশিক হতে পারে না। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে অন্তত দেশজ ও দেশোত্তর দুটো

চতুর্থ বর্ষ : ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

বিশেষণ ব্যবহার করা চলে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশজ বলে কিছু নেই। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? এ প্রশ্নের মীমাংসা তাই কোন আবেগ বা জাতীয়তাবাদের মধ্যে খুঁজলে ভুল হবে। বাংলা ভাষা তার নিজস্ব দাবিতে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোন স্তর পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে, সেটাই বিচার করে দেখতে হবে আমাদের।

শিক্ষার বাহন ভাষা। ভাষার মূল সমগ্র জীবনের গভীরে গ্রোথিত। ভাষাকে অবলম্বন করেই সমস্ত ভাবনা, জ্ঞান বিজ্ঞানের সচেতন চিন্তা, জাতীয় জীবনে ও জাতি থেকে বৃহত্তর মানব সমাজে সঞ্চারিত হয়। ভাষার মাধ্যমেই সভ্য মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রকাশ পেয়ে সৃষ্টি করে সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান। যে শিল্পী ছবি আঁকে, তার বাহন অবশ্য রং। কিন্তু রং-এর বৈচিত্র ও রংএর মাধ্যমে আঁকা বিভিন্ন রেখা ও ছাপ এ ক্ষেত্রে ভাষার কাজ করছে। সাহিত্যিক বা কবি তার বক্তব্য প্রকাশ করেন শব্দ, শব্দের বিভিন্ন অনুষঙ্গ, বাক্য, ও ছন্দের সাহায্যে। জটিল অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত তার যুক্তির জাল সৃষ্টি করতে সঙ্কেত, প্রতীক ও সংখ্যা ব্যবহার করেন। অঙ্কন শিল্পীর রং ও তুলির সাহায্যে যা প্রকাশ করেন, তা আমাদের কাছে একটা অনুভূতি বা আবেশ সৃষ্টি করে মাত্র। কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না। এর ফলে বিভিন্ন দর্শকের কাছে একই চিত্র শিল্পের বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেতে বাধা নেই।

কবি তার বক্তব্যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হতে চান। তার ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ ও তাদের বিশেষ সমন্বয় একটি বিশেষ অর্থ বহন করলেও কিছুটা অনিশ্চয়তা তার বক্তব্যেও থেকে যায়। কারণ শব্দের অর্থের সীমা নির্ধারণ কবির কাজ নয়। বরং এই অনিশ্চয়তা তার কাম্য, যার সাহায্যে তিনি আমাদের বাস্তব ও কল্পনার মাঝামাঝি একটা মনোজগতে তার শব্দগুচ্ছ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাতে সক্ষম হন।

অঙ্ক শাস্ত্রের জটিল যুক্তির জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাষাকে ব্যবহার করার স্বাধীনতা নেই। কারণ, এসব শব্দের অর্থ পাঠকের অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক অন্য শব্দগুলোর উপরও নির্ভরশীল। অঙ্ক শাস্ত্রের সূক্ষ্ম যুক্তির অবতারণার জন্য এ ধরনের অনির্দিষ্টতা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সঙ্কেত ও সংখ্যার সাহায্য নেয়া অপরিহার্য। যাতে করে, পরিমাণগত নির্দিষ্টতা বজায় থাকে বক্তব্যে। বৈজ্ঞানিকের অবস্থা অনেকটা গণিতবেত্তা ও সাহিত্যিকের মাঝামাঝি।

যেহেতু বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান সৃষ্টি বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যার কাজে নিয়োজিত, তার পক্ষে গণিত শাস্ত্রের বিমূর্তন সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে প্রচলিত ভাষাকে ব্যবহার করতে হয় অধিকাংশ সময়। অর্থাৎ শিল্পী বা কবির বক্তব্যে অনিশ্চয়তা গ্রহণযোগ্য নয়। তার উদ্দেশ্য অনুসন্ধানলব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রমাণ করে পরিমাণগতভাবে বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপন করা। প্রয়োজনবোধে বার বার পরীক্ষা করে সকল সন্দেহের নিরসন ঘটানো।

বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে ও সকল ক্ষেত্রেই যে এই নির্দিষ্ট ও মাত্রিক যুক্তি দাঁড় করান সম্ভব, তা নয়। কিন্তু লক্ষ্য থাকে বক্তব্যকে যতদূর সম্ভব সুনির্দিষ্ট করার দিকে। বিজ্ঞানীর আবেদন সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির কাছে, অনুভূতির কাছে নয়। এই জন্যেই বিজ্ঞানের ভাষার সজ্জা কম। এবং পুষ্পময় ভাষা বিজ্ঞানে অবাঞ্ছিত। প্রত্যেকটা শব্দ মেপে মেপে ব্যবহার করার প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের বা পদের সংজ্ঞা স্থির করতে হয়। কারণ, সাহিত্যিক বা শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও সত্যবোধ অনেকটা ব্যক্তিগত ও ব্যক্তি নির্ভর হবার অবকাশ পেলেও, বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতা যতক্ষণ না ব্যক্তি নিরপেক্ষ, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সমাজগত হচ্ছে, ততক্ষণ বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

কোন ভাষায় যখন বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লেখা হয়, তখন লেখক ও পাঠকের মধ্যে প্রতিটি শব্দের একটি নির্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে বোঝাপড়া হয়ে ওঠে। সাহিত্য বা সাধারণ জীবনযাত্রায় সে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও, বিজ্ঞানী এ অর্থের বিভিন্নতা কমিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট রূপদান করেন। এই নির্দিষ্টতা যত নিশ্চিত হয়, বক্তব্য ততই যুক্তি নির্ভর ও বিজ্ঞান সম্মত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা ভাষার চরিত্র নির্ধারিত হয় সেই ভাষায় লিখিত সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বইপত্রের পরিমাণগত ও মানগত উন্নতি ও উপস্থিতির দ্বারা। আমাদের অনেকেরই এটা বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, কোন আলোচনা বাংলাতে শুরু হলেও, আলোচনা যতই সূক্ষ্ম দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তর্কের দিকে ধাবিত হয়, ইংরেজি শব্দ বা বিদেশী শব্দ আমাদের বক্তব্যে প্রবেশ করতে থাকে। বিজ্ঞানের আলোচনায় ইংরেজি শব্দ অপরিহার্য হয়ে ওঠার অর্থ এই নয় যে আমাদের ইংরেজির জ্ঞান বাংলার তুলনায় কিছু বেশি, বা বাংলা ভাষায় এই শব্দগুলো নেই। পরিভাষাগত যে অসুবিধা আমরা অনুভব করি, তার অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার নিজস্ব দৈন্যে নয়। যে কোন ইংরেজি শব্দের একটা অভিধানগত বাংলা শব্দ হয়ত পাওয়া যাবে। কিন্তু সে শব্দটা আমাদের মনঃপুত হয়না। কারণ, পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে একটা শব্দের সঙ্গে একটা বিশেষ বৈজ্ঞানিক অর্থ আরোপিত হবার নিরন্তর ব্যাপারটা বাংলা ভাষায় ঘটেনা, বাংলায় বিজ্ঞানের চর্চা নেই বলে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা বক্তব্য যদি বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়, পাঠকের মন তখন বিশেষ শব্দের সঙ্গে বিশেষ অর্থকে সংযুক্ত করার কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

প্রতিটি বাংলায় লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বাংলা ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের বাহন হিসেবে উপযোগী করে তোলার কাজে এগিয়ে নিয়ে যায়। নতুন কিছু বিজ্ঞানের বই ও প্রবন্ধ লেখার পথ সুগম করে। ভাষার এই পরিবর্তনশীলতা আছে বলেই কোন ভাষাকে বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেয়া চলে না। অবশ্য প্রত্যেক ভাষাকেই প্রথমে বৈজ্ঞানিক ভাষা হিসেবে উত্তীর্ণ হয়ে উঠতে হবে। এবং সেটা সময় সাপেক্ষ। বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে যে এখনও সহজে ব্যবহার করতে পারছি না, এর সমাধান তাই বাংলা ভাষা থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়। বরং বৈজ্ঞানিক কাজে পুনঃ পুনঃ

ব্যবহার দ্বারা আমাদের বাংলা চিন্তায় ও ভাষা চেতনায় প্রয়োজনীয় বিবর্তন সাধন করা। এবং বাংলাভাষার গঠনে দৃঢ়তা ও নির্দিষ্টতা এনে একে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা।

বাংলায় বিজ্ঞানের প্রচার ঘটাতে গিয়ে পরিভাষাগত যে সমস্যা আমরা অনুভব করছি, তা বহুলাংশে কমিয়ে ফেলার একটা উপায় হচ্ছে- ভাষা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব উদার ও বাস্তবমুখী করে তোলা। যদি আমরা স্মরণ রাখি যে, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রসার সহজতর করার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষা প্রচলন করা হচ্ছে। খাঁটি বাংলা ভাষা জীবন যাত্রার সকল স্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বলেই নয়। তাহলে বাংলা ভাষার রাসায়নিক বিশুদ্ধতা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

যে বিদেশী শব্দগুলোর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান সমাজ গ্রহণ করেছে তার বাংলা প্রতিশব্দ বের করা অপরিহার্য নয়। যদি বিজ্ঞান শিক্ষার কাজ সহজতর করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, তাহলে সেক্ষেত্রে পরিভাষা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় বিদেশী শব্দ বা পদগুলোকে রেখে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। আর এই হিসাব করবার সময় মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে এক পর্যায়ে এসে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। এবং তখন বৈজ্ঞানিক পদগুলোর সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হবার প্রয়োজন দেখা দেবে। প্রথম থেকেই বিদেশী পদগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া সেদিক থেকে লাভজনক।

বাংলাদেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন হচ্ছে বাংলাভাষা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি এখনও বাহনরূপে প্রচলিত আছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বাধা কোথায়? অন্য বিষয় সম্পর্কে না গিয়ে শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলা চলে যে, বাংলায় যথেষ্ট বই ও পত্রিকা নেই।

পরিভাষাগত অসুবিধার কথা অবশ্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ফলে, ইংরেজি বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষা না জেনে, শুধু বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব। এ অবস্থার পরিবর্তনের একটা পথ হচ্ছে প্রচুর বিজ্ঞানের বই বাংলাভাষায় অনুবাদ করা। সে জন্যে চাই এমন একদল লেখক যারা অন্তত দুটো ভাষায় পারদর্শী। এবং বিজ্ঞানের যে বই সে অনুবাদ করবে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন। উপরন্তু অনুবাদ করার মতো যথেষ্ট সময় থাকতে হবে, তাদের হাতে। স্মরণ রাখতে হবে অনুবাদ ভীষণ এক ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ, ক্রমাগত নতুন নতুন বই প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে, যা সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। ধরা যাক, কোন বিষয়ের উপর লিখিত একটা ভাল বই অনুবাদ করানো হলো। অল্প দিনের মধ্যেই আরো একটা হলো। কিছু দিনের মধ্যে আরো একটা ভাল বই সেই বিষয়ের উপরে প্রকাশিত হলো। সেটাও অনুদিত হলো। কিন্তু তারপর সেই বিষয়ের উপরে আরো একটা নতুন বই এবং আরো একটা। এ সবই কি অনুবাদ করা সম্ভব? যদি মনে করি যে, বাংলায় যারা বিজ্ঞান পড়বে, তারা একটা বিষয়ের উপরে দু

একটার বেশি বই পড়ার সুযোগ নাই বা পেল। ত' হলে শিক্ষার মানগত মর্যাদা অনেকটা বিসর্জন দিতে হবে। এবং বিজ্ঞানের নতুনতম বই পড়ার সুযোগ থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হবে।

অনুবাদ সম্পর্কে আরো একটা উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হলো, প্রত্যেকটা অনুবাদেই মূল লেখা থেকে একটা পার্থক্য থেকে যায়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়টা যখন জটিল ও সূক্ষ্ম যুক্তির বিষয় হয়ে ওঠে, তখন অনুবাদের মধ্যে সেই জোরালো বক্তব্য অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রকাশ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কোন সামান্যতম ভুলও যদি অনুবাদক করে বসেন, এবং সে বিষয়ের উপর প্রামাণ্য মূল বই পড়ার সুযোগ যদি পাঠকেরা না পান, তাহলে, ভুলের পৌনঃপুনিকতা ঘটতে থাকে তাদের মধ্যে।

বিজ্ঞান হচ্ছে গতিশীল ও ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপ। প্রতিদিন এর নতুন যাত্রা নতুন অভিজ্ঞান। অনুবাদের মধ্যে এই গতিশীলতা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব। একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত আহরণ করা জ্ঞানটুকুর সঙ্গে পরিচিত হয়েই বিজ্ঞানী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। যে প্রবাহ চলছে সত্য উদঘাটনের, তার সঙ্গে সংযোগ রাখতে হবে। এ সমস্যার সমাধান হলো বিজ্ঞানের জ্ঞান অন্যের কাছ থেকে শুধু ধার করে নেবার চেষ্টা না করে, নিজেদের অংশগ্রহণ করা।

জ্ঞান সৃষ্টিতে অর্থাৎ যতদিন না একদল বিজ্ঞানী তাঁদের চিন্তা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে প্রয়াস পাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিজ্ঞানের মৌলিক বই বাংলায় লেখা হবে এ সম্ভাবনা কম। কারণ, বৈজ্ঞানিক আরো এক সমাজের সঙ্গে জড়িত, যার ভিত্তি তার বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের সামঞ্জস্যে জাতিগত বা ভাষায় ঐক্যে নয়। ফলে, তিনি এমন এক ভাষায় লিখতে সচেষ্ট হবেন, যাতে তিনি এই বৈজ্ঞানিক সমাজের কাছে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। কথাটা মৌলিক আবিষ্কার সম্পর্কেই বিশেষভাবে সত্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাভাষায় যথেষ্ট বই নেই, এবং মৌলিক লেখা যে আরো নেই। তার অন্যতম কারণ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পাঠক নেই, তারও একটা কারণ বই নেই। এ অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র পথ হলো, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপকে বাড়িয়ে দেবার এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাবার রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ। অর্থাৎ বিজ্ঞানের উন্মেষ মাত্র নয় বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। অনেক বই অনুবাদ করতে হবে। অনেক বই বাংলায় লিখতে হবে। তাই শুধু নয়- অনেক বিজ্ঞানের ছাত্র তৈরি করতে হবে, যাতে করে তাদের সংখ্যার বিরাটত্ব বাংলায় বই লেখার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে। এর জন্যে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে, তা গতানুগতিক যুক্তিতে হয়ত কোন সরকার সমর্থন করবে না যদি এর থেকে উদ্ভূত অন্যান্য সুদূর প্রসারী ফলগুলোও হিসেবের মধ্যে না আনা হয়।

বিজ্ঞান বিদেশী ভাষায় পড়ানো হয় বলে আমাদের বিজ্ঞানের ছাত্রদের দুটো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। একটা হলো বিদেশী ভাষা শেখা। অন্যটা হলো, বিজ্ঞানের কঠিন

পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা। বিজ্ঞানের জ্ঞান এক বিদেশী ভাষার মোড়কে জড়ানো বলে সরাসরিভাবে বিজ্ঞানের আলো আমাদের ছাত্রদের কাছে পৌছানো যাচ্ছে না। অনেকেই যারা হয়ত বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র হতে পারত, অথচ বিদেশী ভাষা শেখার দক্ষতা বা সুযোগ পায় নি, তারা প্রথম স্তরেই বাদ পড়ে যাচ্ছে শিক্ষার মূল প্রবাহ থেকে।

বিদেশী ভাষায় লেখা একটা বিজাতীয় জ্ঞান হিসেবে বিজ্ঞানের পরিচয় বলেই, বিজ্ঞান শিক্ষা কৃত্রিমভাবে মুষ্টিমেয় মানুষের জীবিকা হিসেবে টিকে আছে। সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় জীবনে প্রকাশ পাচ্ছে না। এ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শুধু বিজ্ঞানে উৎসাহিত হলেই চলবে না। এর বাইরেও একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে, যা চিন্তা ও কাজে বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। যেমন শিল্পপতি, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, সাধারণ নাগরিক। এরা যদি বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন থাকে এবং বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহী না হয়, তাহলে বিজ্ঞান দেশে অর্থনৈতিক বিবর্তনে সক্রিয় সহায়তা করতে সক্ষম হবে না। ফলে বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জনের জন্যেই শুধু বিপুল অর্থ ব্যয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। বিজ্ঞানকে তাই জনপ্রিয় করে তোলার কাজে, যাকে আমরা বিজ্ঞানের গণতান্ত্রিকীকরণও বলতে পারি, বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন অনেক সহায়তা করবে।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলনের ক্ষেত্রে আরো একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতার কথা অবশ্যই উঠবে। তা হলো, বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানীদের যোগাযোগের অসুবিধা। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত থাকার জন্য এই যোগাযোগ অপরিহার্য। এই সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর জন্যে অন্তত একটি বিদেশী ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখা প্রয়োজন। এটা এমন কিছু নতুন ব্যবস্থা নয়। জাপান, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর অনেক বিজ্ঞানের ছাত্রকে মাতৃভাষার বাইরে বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে অতিরিক্ত ভাষা শিখতে হয়। তাদের প্রত্যেকের ভাষাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলার তুলনায় অনেক উন্নত।

সব বিজ্ঞানের ছাত্র দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজিই শিখবে তার অবশ্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কোনো বিদেশী ভাষা শেখা বেশি লাভজনক তা নির্ভর করে কোন ভাষায় কত বেশি বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বা মৌলিক আবিষ্কার প্রকাশিত হয় বা অনূদিত হয়, তা উপরে।

যারা বিদেশী কোনো ভাষা শিখতেই সম্মত নয়, তাদেরকে গ্যেটের এই উক্তিটি স্মরণ রাখতে হবে- যিনি একটি মাত্র ভাষা জানেন তিনি কোনো ভাষাই জানেন না। এ ছাড়া অনুবাদের সাহায্যে বিজ্ঞানের বই ও পত্রিকার অভাব পূরণ করার যে সমাধান আমরা চেয়েছি, তার মধ্যেই অন্তত বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীর বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা আমরা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করেই নিয়েছি। অন্যথায় বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নতুন বই ও পত্রিকার অনুবাদ বাংলায় পাওয়া কেমন করে সম্ভব?

[অধ্যাপক, *পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।*]

বালি থেকে তেল

দীপক কান্তি দাস[১], আবদুল কাদের[২]

দৈনন্দিন কাজে যে খনিজ তেল (হাইড্রোকার্বন) আমরা শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করি তার উৎপত্তি, উৎস ও আধার সম্পর্কে আমদের মতো সাধারণ মানুষের মনে জাগে বিবিধ প্রশ্ন। মূলত প্রাণিদেহ ও বৃক্ষরাজি থেকে তেলের উৎপত্তি এবং এগুলোই এর উৎস। কোটি কোটি বছর আগে ভূ-পৃষ্ঠ ও সমুদ্রবক্ষের উপর যে সব উলট পালট কাণ্ড ঘটে তারই ফলে সমুদ্রগর্ভে জমে থাকা মৃত প্রাণী, বৃক্ষরাজি ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ বন ভূমি বিভিন্ন সময়ে ভূ-গর্ভে চাপা পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে উপযুক্ত চাপ ও তাপের প্রভাবে এইসব প্রাণী ও বৃক্ষ বিভিন্ন পর্যায়ে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। এই তেল ও গ্যাসের সাধারণ পরিচয় হাইড্রোকার্বন। ভূ-গর্ভের উপযুক্ত শিলাস্তরে এই তেল ও গ্যাস জমা হয়েছে। তবে একটা বিষয় শুরুতে জেনে রাখা ভালো যে হাইড্রোকার্বনের উৎস (source) ও আধার (reservoir) একই শিলাস্তরে অবস্থিত নাও হতে পারে এবং এদের মাঝে অনেক অনেক মাইল ব্যবধান থাকতে পারে। হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানকারীদের কাছে উৎস খুঁজে বের করা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন তেল সমৃদ্ধ দেশ এই জৈব তেলের মালিক। হাজার মিটার গভীর ছিদ্র করে পাথরের বুক থেকে ঐ তেল শুষে নেয়া হচ্ছে মানুষের কাজ। তেলের উৎস ও উৎপাদন সম্পর্কে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের এই ধারণা।

ভূ-গর্ভে সঞ্চিত তেলের উপর থাকছে উপরকার ভূ-স্তরের চাপ। তাই এই তেল তার উৎস থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের দিকে বেরিয়ে পড়ে। এই চলার পথে শিলাস্তরে উপযুক্ত আধার থাকলে তেল সেখানে এসে জমবে। অন্যথায় এই তেল ভূ-পৃষ্ঠে এসে নিঃশেষ হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে এই চলার পথে ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত বালির স্তর পড়লে তেল বালিস্তরে আটকে পড়তে পারে। বিশেষত তেল যদি বেশ ভিসকাস হয় অর্থাৎ আলকাতরা কিংবা চিটাগুড়ের মত, তাহলে কিন্তু এই তেল চলার পথে বালিকে সম্পৃক্ত করে ফেলবে। এই বালিস্তর এক তেলাধারের রূপ নিতে পারে। পৃথিবীর অনেক স্থানেই এ ধরনের তেলের আধার রয়েছে। এরূপ একটি বড় বালি মিশ্রিত তেলাধার রয়েছে কানাডার আলবার্টা প্রদেশে। এই বালি মিশানো বা বালি

চতুর্থ বর্ষ : ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

সম্পৃক্ত তেলকে বলা হয় অয়েল স্যাণ্ড (oil sand) বা টার স্যাণ্ড (tar sand)। এই বালি সম্পৃক্ত বা যুক্ত তেলের আধার সম্পর্কে আমরা অনেকেই হয়তো তেমন কিছু জানি না। অনেকটা খনি থেকে কয়লা তোলার মত এই তেল উত্তোলন। অবশ্য একে তেল উত্তোলন না বলে বালি উত্তোলন বলাই শ্রেয়। সাধারণ তেল উত্তোলন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার (oil drilling and production) সাথে এই বালি মিশ্রিত তেল উত্তোলন এবং তেল আহরণের মৌলিক ও গুণগত পার্থক্য রয়েছে। এখানে দুটো ধাপ রয়েছে : তেল মিশ্রিত বালি উত্তোলন এবং উত্তোলিত বালি থেকে তেল আহরণ (recovery)। বালি থেকে তেল উৎপাদনের যে প্রক্রিয়াটির কথা উপরে বলা হলো তা ব্যবহৃত হচ্ছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র উৎপাদনশীল বালি মিশ্রিত তৈল ক্ষেত্রে যা কানাডায় অবস্থিত।

কানাডার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ আলবার্টার কোর্ট ম্যাকমারি নামক জায়গায় এই তেলক্ষেত্রটিতে তেল উৎপাদনের অতিকায় কর্মকাণ্ডটি চলছে। বিভিন্ন কোম্পানির অংশীদারিত্বের সমন্বয়ে গঠিত সিনক্রুড (syncrude) নামক কোম্পানি এই তেলক্ষেত্রে কাজ করছে। এর বিশালত্ব কয়েকটা পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যাবে। প্রায় ৪৮০০০ বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত এই তেলক্ষেত্র (বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ)। এই তেলক্ষেত্রে বালিতে প্রায় ৮৬০ বিলিয়ন ব্যারেল ভারী খনিজ তেল আছে বলে অনুমান করা হয় যার মধ্যে ৩৩ বিলিয়ন ব্যারেল সারফেস মাইনিং (Surface mining) পদ্ধতিতে উত্তোলনযোগ্য অর্থাৎ যে প্রক্রিয়াটি এখন চালু আছে। এই তেলক্ষেত্রে দৈনিক ৩০০,০০০ টন তেল-বালি শোধন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রতি দুই টন বালি শোধন করে এক ব্যারেল তেল উৎপন্ন হয়। এই হারে তেল উত্তোলন চললে সিনক্রুড আগামী ৫০০ বছর কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। এখানে প্রায় ৪৫০০ জন লোক কাজ করে। সিনক্রুডের কর্মকাণ্ড যেমন বিশাল- এই তেলক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতিটি যন্ত্রপাতির আকারও তেমনি প্রকাণ্ড। যন্ত্রের বিশালত্ব কত বড় হতে পারে এই বিশেষ তেলক্ষেত্রের কর্মকাণ্ড না দেখলে তা বোঝানো দায়। সত্যি বলতে কি যে কোন প্রকৌশলীর (যন্ত্র, তড়িৎ, পুর, কেমি) এই যান্ত্রিক বিশালত্ব সম্বন্ধে ধারণা থাকলে- তার কল্পনা শক্তি বাড়তে বাধ্য। পরের অনুচ্ছেদগুলোতে ধাপে ধাপে এই যান্ত্রিক বিশালত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেবার চেষ্টা করবো।

তেলবালি উত্তোলন : কানাডার আলবার্টা প্রদেশের উল্লিখিত এই তেল মিশ্রিত বিশেষ বালিকে বলা হয় আথাবাস্কা তেলবালি (Athabasca oil)। অবশ্য আথাবাস্কা শব্দটি কোন বিশেষ অর্থ বহন করেনা- শুধুমাত্র একটা বিশেষ অঞ্চলকে প্রাধান্য দেয়া হয়। আথাবাস্কা নদীর অববাহিকায় এই তেলক্ষেত্রটি বিস্তৃত। এছাড়া একই ধরনের বালি রয়েছে পিস রিভার, ওয়াবাস্কা ও কোল্ড লেকের অঞ্চলে। আগেই বলা হয়েছে বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে এই তেলক্ষেত্র বা বালিক্ষেত্র। ভূ-পৃষ্টের প্রায় ১৫ মিটার (এটা গড় হিসাব) নিচে এই বালির অবস্থিতি। মাটির নিচে এই বালির অংশ গড়ে ৪২ মিটার পুরু। প্রথমে ঝোপঝাড় ও মাটি সরিয়ে ফেলা হয়। এই সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয় বিশালকায় হাইড্রলিক শোভেল (Hydraulic shovel)। এই মাটি, যা হচ্ছে বালি, কাদা, কাঁকর,

সিল্ট (silt) ইত্যাদির সংমিশ্রণ, এক জায়গায় জমাকৃত করা হয় এবং পরে তা আবার শূন্য খনি ভরাট (বালি তোলার পর বালির খনিতে যে গর্তের সৃষ্টি হয়) বা ভূমি পুনর্গঠনের (land Reclamation) কাজে ব্যবহৃত হয়। হাইড্রালিক শোভেল দিয়ে মাটি বড় বড় থাবার স্তূপীকৃত করা হয় বিশালকায় ট্রাকের উপর। ট্রাক এই মাটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে জমা করে রাখে। এক একটা ট্রাকের ধারণ ক্ষমতা ১৫০ টনের অধিক (আমাদের দেশের লরিগুলো ৫ থেকে ১০ টন মাত্র!) এই ট্রাক যে কত বড় তার আন্দাজ করার একটা দৃশ্যমান জিনিস হচ্ছে এর চাকা। প্রতিটি চাকার ব্যাস হচ্ছে ১০ ফুট (প্রায় একটা কক্ষের উচ্চতা)। এই মাটি সরিয়ে ফেললে দেখা যাবে কালো রঙের তেল মিশ্রিত বালি সমুদ্রের বিশালত্ব নিয়ে যেন শুয়ে আছে। তেল উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য ছয় মাস আগে থেকেই মাটি সরানোর কাজ চলতে থাকে। অর্থাৎ যেখানে বালি উত্তোলিত হচ্ছে সেখানকার মাটি ছমাস আগেই সরানো হয়েছে এবং যেখানে এখন মাটি কাটার কাজ চলছে সে- বালি তোলা হবে আরও ছমাস পরে। মাটি সরানোর পর যে কাজটা চলে তাকে সারফেস মাইনিং বলা হয়। তেল মিশ্রিত এই বালিকে এখন খনি থেকে তুলে এক জায়গায় স্তূপ করা হয়। মোটামুটি বলা যায় বালির পাহাড় তৈরি করা। আগেই বলা হয়েছে দৈনিক ৩০০,০০০ টন বালি পরিশোধন বা প্রসেস করা হয়। ড্রাগলাইনের (Draglines) সাহায্যে এই বালি উত্তোলন করা হয়। এই ড্রাগলাইন আরও আশ্চার্য এবং অতি বিশাল যন্ত্র। এটা অনেকটা ক্রেনের (Crane) মতো, তবে অনেক বড়। ইঞ্জিন রুমটা একটা বিরাট ৪/৫ তলা ভবনের সমকক্ষ। এরকম চারটা ড্রাগলাইন সিনক্রুডের এই তেলক্ষেত্রে দিবারাত্র কাজ করছে। একটা ড্রাগলাইনের জন্য প্রায় ৩ মেগাওয়াট শক্তির প্রয়োজন পড়ে। অতি উঁচু ডেরিক (Derrick) থেকে একটা বিশালকায় বাকেট (Bucket) প্রতি মিনিটে একবার করে বালি তুলে জড়ো করছে। প্রতিবারে প্রায় ৭০ টন বালি ওঠে। সুতরাং অনুমান করা যায় শুধুমাত্র বাকেটটা কত বড় হতে পারে- এটা একটা বড় সড়ো ঘরের সমান অর্থাৎ এমন বড় যেখানে দুটো গাড়ি সহজেই রাখা যাবে। ইস্পাতের যে দড়ি (Steel Rope) দিয়ে এই বাকেট ডেরিকের সাথে লাগানো তার ব্যাস প্রায় ৪´´। এই দড়ি একটা চেইনের সাথে যুক্ত এবং চেইনটা বাকেটের কোণায় সংযুক্ত। চেইনের প্রতিটি লিংকের ওজন প্রায় ১০০ পাউন্ড। দানব বা দৈত্য বলতে যা ধারণা করা হয় এই যন্ত্রদানবটা তার চাইতেও অনেক গুণে বড় এবং আপাত দৃষ্টিতে ভয়াবহ— যদিও ভয়ের কিছু নেই। এখানে উল্লেখ্য এই তেলক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রায় প্রত্যেকটা যন্ত্র পশ্চিম জার্মানির তৈরি। বালি থেকে তেল নিংড়ানোটি যেমন বিশেষত্বপূর্ণ তেমনি যন্ত্রপাতিগুলোর বিশালত্বটা হচ্ছে নতুন আর এক বৈশিষ্ট্য। চারটা ড্রাগলাইনের পাশাপাশি সারাক্ষণ কাজ করছে চারটা বাকেটহুইলস (Bucketwheels)। স্তূপীকৃত বালির পাহাড় কেটে কেটে এই বাকেটহুইল বালি ফেলছে কনভেয়ার বেল্টে। কনভেয়ার বেল্টে বয়ে নিয়ে চলেছে এই তেলবালিকে শোধনাগারে যেখানে বালি থেকে নিংড়ে নেয়া হবে তেল। প্রত্যেকটা বাকেটহুইলস এর ব্যাস প্রায় চল্লিশ ফুট, চ্যানেলসহ প্রত্যেকটা বাকেটহুইলস

সিস্টেমের দৈর্ঘ্য একটা ফুটবল মাঠের সমান। যে কনভেয়ার বেল্ট বয়ে নিয়ে চলেছে তেলমিশ্রিত বালি সে বেল্টের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫ মাইল। যেন চব্বিশ ঘন্টা একটি পঁচিশ মাইল দীর্ঘ সড়ক সচল রয়েছে।

তেল উৎপাদন : তেল মিশ্রিত বালিকে একবার মাটির তলদেশ থেকে তুলে আনতে পারলে সে বালি থেকে তেল উৎপাদন প্রক্রিয়া মোটামুটি একটা কেমিকৌশল প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়াটা সাধারণভাবে তেলশিল্পে নিয়োজিত সকলেরই বিশেষত কেমিকৌশলীদের জানা। অতি সংক্ষেপে প্রক্রিয়াটা হলো এই তেল মিশ্রিত বালিকে উত্তপ্ত করলে, রাসায়নিকভাবে বালি থেকে তেল আলাদা হয়ে পড়বে এবং সেটলিং কলামের সবার নিচে বালি, তার উপর পানি এবং সকলের উপরে তেল জমা হবে। এবার তেলটা আলাদা করে নেয়া যেতে পারে। এবার এই তেল বেশ কটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ও আরও কয়েক ধাপ পরিশোধনের পর রূপান্তরিত হল সিনথেটিক ক্রুডে যা অন্যান্য ক্রুডের মতই তেল শোধনাগারে শোধিত হয়ে বাজারজাত করা হচ্ছে। ফোর্টম্যাকমারীর এক তেল ক্ষেত্রে সিনক্রুড এই প্রক্রিয়াটাই অবলম্বন করছে। এখানে দৈনিক ১২৫,০০০-১৩০,০০০ ব্যারেল সিনথেটিক ক্রুড উৎপাদিত হচ্ছে। এর সঙ্গে বাড়তি পাওয়া যাচ্ছে ৭০০ টনের অধিক বিশুদ্ধ গন্ধক (sulfur)। তবে যত সহজে প্রক্রিয়াটাকে ব্যক্ত করা হল বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ অত সহজ সরল নয়-অনেক পার্শ্ব প্রক্রিয়া সংযোগের প্রয়োজন পড়ে। আগেই বলা হয়েছে আলোচ্য তেলক্ষেত্রটি একটি ব্যাপক প্রকৌশল ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। এখানে সব কিছুই যেন বৃহৎ। দৈনিক ৩০০,০০০ টন তেল মিশ্রিত বালি থেকে তেল বের করে নিতে যে জলীয় বাষ্প প্রয়োজন হয় তার জন্য দৈনিক প্রায় ৫ কোটি গ্যালনেরও অধিক পানি প্রয়োজন পড়ে। অবশ্য এই পানির ৯০% পূর্ণ ব্যবহার (recycle) করা হয়। উল্লেখ্য বালি থেকে প্রায় ৯০ ভাগ তেল নিংড়িয়ে নেয়া হয়। দৈনিক এই পরিমাণ পানি সরবরাহ, মেকআপসহ যাতে নির্বিঘ্নে চলে তার জন্য তৈরি হয়েছে কৃত্রিম হ্রদ যার আয়তন প্রায় ৭ বর্গমাইল এলাকা। যেহেতু ১০% পানি পূর্ণ ব্যবহৃত হচ্ছেনা এবং যেহেতু এই পানিতে কিছু তেলজাতীয় পদার্থ থেকে যাচ্ছে তাই এই হ্রদের পানি পরিবেশকে দূষিত করে তুলতে পারে। কিন্তু তা যেন না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। হ্রদ পরিষ্কার রাখা, পাখিরা যাতে এই হ্রদের পানির সংস্পর্শে না আসে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বড় কথা হলো তেল উৎপাদন করতে গিয়ে যেন সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট না হয় সেদিকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বালি তোলার পরে- আবার খনিকে মাটি ও শোধিত বালি দিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে যাকে বলা হচ্ছে land reclamation. এই প্রবন্ধের মাধ্যমে তেল উৎপাদনের গতানুগতিক প্রক্রিয়া অবহিত করানো নয় বরং ব্যতিক্রমধর্মী তেল উৎপাদন সম্পর্কে অবহিত করা সর্বোপরি মেকানিক্যাল ইক্যুপমেন্টের বিশালতা সম্পর্কে ধারণা দেয়াই প্রধান লক্ষ্য।

[[1]অধ্যাপক, যন্ত্র কৌশল বিভাগ, [2] অধ্যাপক, কেমিকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।]



সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় : ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষয়ক্ষতিরোধ

মোহাম্মদ শাহজাহান

সূচনা

বাংলাদেশের ব-দ্বীপসমূহ এবং ৭০০ মাইল উপকূলীয় এলাকার জন্য মৌসুমী ঝড় এবং টর্নেডো সত্যিই খুব উদ্বেগের কারণ। এইসব ঝড়— জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে দুর্যোগ সৃষ্টি করে থাকে। এই ঝড় সাধারণত বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উৎপত্তি লাভ করে এবং পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়ে ভারতের পূর্ব উপকূলে উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রে আঘাত হানে। কোন কোন সময়ে উত্তর দিকে এবং মাঝে মাঝে উত্তর-পূর্বদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও বার্মা উপকূলে আঘাত হানে। এই ঝড়ে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয় তা অনুমান করা যাক সম্প্রতি ২৯-৩০ এপ্রিল ১৯৯১ সালে সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালীসহ চট্টগ্রাম উপকূলের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে। যেখানে সরকারি হিসেবে দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কয়েক মিলিয়ন মানুষ গৃহহীন হয়েছে এবং বিপুল সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। প্রাণহানির সংখ্যা বেসরকারি হিসেবে আরও অনেক বেশি।

বাংলাদেশ অঞ্চলে গত দুশ বছরের মধ্যে যেসব ধ্বংসাত্মক ঝড় বয়ে গেছে তার একটি হিসেব সারণী-১ এ পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ১৭৯৩ সাল থেকে মে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ৪৩টি সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ের উল্লেখ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, এইসব ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড়ের স্পন্দনের দ্রুততা প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর— এর মধ্যে ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ৯টি সাংঘাতিক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘন্টায় ৫৪ মাইল বা ৯০ কিলোমিটারের উপরে হলে তাকে সাংঘাতিক ঘূর্ণিঝড় বলা হয়ে থাকে।

ঘূর্ণিঝড়ের ২০০টি উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে চট্টগ্রাম অঞ্চলই (সীতাকুণ্ড থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত দ্বীপসহ সমগ্র এলাকা) সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা এবং এখানে প্রায় ৫০% ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে। পরবর্তী ঘূর্ণিঝড় এলাকা হচ্ছে বরিশাল ও ভোলা অঞ্চল। এই ক্ষেত্রে ৩য় স্থানে রয়েছে সুন্দরবন ও বাগেরহাট এলাকা। এখানে চৌদ্দ শতাংশ ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে। নোয়াখালী ও মেঘনা মোহনা অঞ্চল (estuary) অন্যান্য এলাকার তুলনায় কম ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা— যেখানে প্রায় ৮% ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে।

৪র্থ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, জুন ১৯৯১



যন্ত্রপাতি কিনবেন না মাস্টার রোলের বেতন দেবেন, না রাসায়নিক পদার্থ কিনবেন, না অন্য কোন মেরামতের কাজ করাবেন? অথচ বিদ্যুৎ বন্ধ হলে, পানি সরবরাহ না থাকলে, কলেজ নোংরা হলে শিক্ষক উপস্থিত না হলে, সকল দায়-দায়িত্ব অধ্যক্ষের। যে-কোনো সময় যে-কোনো কারণে তাঁকে ঘেরাও হতে হয়। অবমাননা তাঁর দৈনিক পাওনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তির নিয়মানুযায়ী স্নাতকোত্তর কোর্সে ন্যূনতম ২৫ জন শিক্ষক প্রয়োজন অথচ সরকারি শিক্ষা প্রশাসন এ ব্যাপারে নির্বিকার ও নির্মমভাবে প্রতিটি বিভাগে ৩ থেকে ৭ জন শিক্ষক দ্বারা একাদশ থেকে স্নাতকোত্তর কোর্সের দায়দায়িত্ব পালনে বাধ্য করাচ্ছেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রয়োজনে একবার সুপারনিউমারা পদ সৃষ্টি আবার তা অবলুপ্তির কারণে নিয়োজিত বহু বিশেষীকৃত শিক্ষককে অতিরিক্ত ঘোষণা করা হয়েছে ও তাঁরা ২ বছরের মতো বেতন পাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে এটা অমানবিক এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতার ফল। এ ধরনের পরিস্থিতি কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। প্রশাসনিক কারণেও তাই শিক্ষার উত্তম পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারছে না।

সবশেষে অধ্যক্ষ এবং ছাত্রাবাস প্রশাসন সম্পর্কিত দু একটি কথা বলা যাক। সরকারি প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন-এ দুই প্রশাসন থেকে কলেজগুলিলকে মুক্ত করে অর্থনৈতিক সাশ্রয় না দিলে, স্বায়ত্তশাসন না দিলে এরপর কলেজের অধ্যক্ষ ও ছাত্রবাসের সুপারিনটেন্ডেন্টদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন কিছুতেই সম্ভব হবে না। অধ্যক্ষ, সুপারদের মতো ২৪ ঘণ্টা উদ্বেগের মধ্যে বসবাসকারীদের জন্য বিশেষ ভাতা, বাসা ভাতা, ফ্রি টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, দারোয়ানের সুবিধা না দিলে প্রশাসনকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য কেউ আসবে না। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক মূল্যায়নের দ্বারা বদলি করা, অন্যত্র থেকে দক্ষ শিক্ষক আনার ক্ষমতা কলেজ কর্তৃপক্ষকে না দিলে শিক্ষা পরিবেশ উন্নত হবে না। বিশেষীকৃত দক্ষ শিক্ষকদের বদলি করতে হলে অধ্যক্ষ বা বিভাগীয় প্রধানদের অনুমোদন নিতে হবে। ছাত্র সন্ত্রাস যে কোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে। কোন নতুন ইমারত নির্মাণ করলে তার সাথে আনুষঙ্গিক কর্মচারী দিতে হবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। কলেজ, ছাত্রাবাসগুলির জন্য নিরাপত্তা প্রহরী, দারোয়ান, পিয়ন, সুইপার, মালী, ইলেকট্রিশিয়ান ও প্লাম্বার মিস্ত্রি দিতে হবে। সমস্যা বহু, সমাধান কিন্তু অসম্ভব নয়। সমস্যার উৎস সন্ধান চিহ্নিতকরণ, কারণ অনুধাবনসহ সমাধান খুঁজতে হবে। উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান হলে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হতে বাধ্য।

[*অধ্যক্ষ, সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা।*]

মহাবিশ্বের পরিণতি

জামাল নজরুল ইসলাম

মহাবিশ্বের পরিণতি অথবা চরম ও চূড়ান্ত অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমে দুই একটা কথা ভূমিকাস্বরূপ বলতে হয়। প্রথমত, বিশ্বের নিয়তি সম্বন্ধে বুঝতে হলে এটার উদ্ভব, বিবর্তন ও বর্তমান গঠন সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের নিয়তি সম্বন্ধে কিছু বলা মানে এক ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করা। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি আমাদের বর্তমান জ্ঞানের যে পরিসর আছে সেটার উপর ভিত্তি করে করতে হবে। নতুন তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণীটিরও পরিবর্তন হতে পারে। অবশ্য এটা বলা যায় যে মোটামুটিভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে সাধারণ বিজ্ঞানীরা একমত হবেন। তৃতীয়ত, বর্তমান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেও বিশ্বের নিয়তি সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, কারণ এখানে কয়েকটা অনিশ্চয়তা রয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের নিয়তি কি হবে সেটা কয়েকটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়। এই সম্ভাবনাগুলির ব্যাখ্যা করা হবে পরবর্তী আলোচনায়।

বিশ্বের মৌলিক উপাদান হলো নীহারিকাগুলি (galaxies)। একটি নীহারিকার মধ্যে গড়ে প্রায় $১০^{১১}$ বা দশ হাজার কোটি নক্ষত্র থাকে। তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে অভিকর্ষ সূত্র (law of universal gravitation) অনুযায়ী এবং তার ফলেই তারা একত্রে থাকে। সাধারণত নীহারিকাগুলো বিভিন্ন দলে থাকে এবং একটি দলে কয়েকটি অথবা কয়েক হাজার নীহারিকা থাকতে পারে।

সারা বিশ্বে নীহারিকাগুলির বিন্যাস গড়ে সব দিকে সমান বা সুষম। আমাদের সূর্য যে নীহারিকায় অবস্থিত সেটাকে ছায়াপথ (Milky way), ইংরেজিতে The Galaxy-ও বলা চলে।

একটি নীহারিকার আকৃতি একটি বিরাট চাকতির (disc) মতো যেটার ব্যাস প্রায় এক লক্ষ আলোক বৎসর এবং পুরুত্ব (thickness) কয়েক হাজার আলোক বৎসর (এক আলোক বৎসর হলো— যে দূরত্ব প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগে এক বছরে অতিক্রম করে; আমাদের নিকটতম নক্ষত্র alpha centaur প্রায় তিন আলোক বৎসর দূরে)। প্রত্যেকটি নীহারিকা চাকতির মতোই ঘূর্ণায়মান (rotating)।

৫ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯২

বিশ্বের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকান জ্যোতির্বিদ ইপি হাব্‌ল (E.P Hubble) ত্রিশ দশকে। তিনি পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে বিশ্ব সদা সম্প্রসারণশীল, অর্থাৎ নীহারিকাগুলো পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যার দূরত্ব বেশি তার সরে যাওয়ার গতিবেগও বেশি। এই সরে যাওয়ার হার থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রায় এক হাজার থেকে দুই হাজার কোটি বছর আগে সব নীহারিকাগুলো পরস্পরের খুব কাছে ছিল। অনুমান, ঐ সময় বিশ্বে মহা বিস্ফোরণ (big bang) সংঘটিত হয়েছিল যার ফলে সব বস্তু প্রচণ্ড গতিবেগে চারদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। কালক্রমে পদার্থসমূহ জমাট হয়ে নীহারিকাগুলি সৃষ্টি করে। বর্তমানকালে বিশ্বের যে সম্প্রসারণ তা সেই আদি মহা-বিস্ফোরণের জের মাত্র।

বিশ্বের এই সম্প্রসারণ (expansion of the universe) কি ভবিষ্যতেও থাকবে, না তা থেমে গিয়ে সঙ্কোচন শুরু হবে? যদি বিশ্বে সর্বদা সম্প্রসারণ চলতে থাকে তাহলে ঐ ধরনের বিশ্বকে উন্মুক্ত বিশ্ব (open universe) বলে। অন্যথায় আমরা পাই আবদ্ধ বিশ্ব (closed universe)। সুতরাং প্রশ্ন হলো, আমাদের বিশ্ব উন্মুক্ত না আবদ্ধ? প্রশ্নটি বিশ্বতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর অন্যতম। কিন্তু এর উত্তর বৈজ্ঞানিকরা এখনো সঠিকভাবে জানেন না। বিশ্বের নিয়তি বা পরিণাম কি এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের যে সব বিষয় জানা দরকার তা সব সঠিকভাবে জানা নেই। একটি বিষয়, বিশ্বের সম্প্রসারণের হার কি পরিমাণে কমছে তা সঠিকভাবে জানা। আরেকটি হলো যে, বিশ্বে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্ব। যদি ঘনত্ব (density) একটি নির্দিষ্ট মানের বেশি হয় তাহলে বিশ্ব আবদ্ধ হবে। এই নির্দিষ্ট ঘনত্বকে বলে সঙ্কট ঘনত্ব (critical density)। এই সঙ্কট ঘনত্বের মান হলো প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে প্রায় $১০^{-৩০}$ থেকে $১০^{-২৯}$ গ্রাম (10^{-30} to 10^{-29} per cubic centimeter)। যদি বিশ্বের গড় ঘনত্ব সঙ্কট ঘনত্বের কম হয় তাহলে বিশ্ব হবে উন্মুক্ত। সঙ্কট ঘনত্ব নির্ভর করে বর্তমান সম্প্রসারণের হারের উপর (rate of expansion)। এই রাশিটি নির্ধারিত হয় আরেকটি ধ্রুব সংখ্যা থেকে যার নাম হাব্‌ল ধ্রুব (Hubble constant)। বিশ্ব উন্মুক্ত না আবদ্ধ তা জানবার আরেকটি পদ্ধতি হলো তার বয়স সঠিকভাবে নির্ণয় করে "হাব্‌ল সময়ের" (hubble time) সঙ্গে তুলনা করা। হাব্‌ল সময় বিশ্বের সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে এখন পর্যন্ত অতিবাহিত সময়, যদি সম্প্রসারণের হার বর্তমান হারের সমান বলে ধরে নেয়া যায়। হাব্‌ল সময় পাওয়া যায় হাব্‌ল ধ্রুবক থেকে। বিশেষ এককে হাব্‌ল ধ্রুবকের বিপরীত সংখ্যাই (reciprocal) হাব্‌ল সময় (এটাকে হাব্‌ল কালও বলা চলে)। সুতরাং বিশ্ব উন্মুক্ত না আবদ্ধ, সে প্রশ্নের সঙ্গে অনেক তত্ত্বীয় ও পর্যবেক্ষণমূলক ধারণা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। বর্তমান কালে এই সব উপাত্তের মধ্যে অনেকটা অনিশ্চয়তা আছে। তবে সব কিছু আলোচনা করে মনে হয় যে বিশ্ব আসলে উন্মুক্ত।

বিশ্ব যদি সত্যিই উন্মুক্ত হয়, তবে তার নিয়তি কি ধরনের হবে? যেহেতু বিশ্বের প্রধান উপাদান হলো নীহারিকাগুলি, তাই একটি প্রতিরূপ (typical) নীহারিকা নিয়ে আলোচনা করা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের ছায়াপথ এই ধরনের একটি নীহারিকা। দশ হাজার কোটি বছর পরে, নীহারিকার সব নক্ষত্র তাদের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌছবে। নক্ষত্রের তিনটি চূড়ান্ত অবস্থা হলো শ্বেত বামন (White dwarf) নিউট্রন-নক্ষত্র (Neutron star) অথবা কৃষ্ণ বিবর (Black hole)। একটি শ্বেত বামনের ব্যাস প্রায় পৃথিবীর ব্যাসের সমান কিন্তু তার ভর (mass) সূর্যের ভরের সমতুল্য। একটি নিউট্রন নক্ষত্রের ভরও সূর্যের ভরের সমতুল্য কিন্তু তার ব্যাস প্রায় দশ কিলোমিটার। অর্থাৎ একটি নিউট্রন নক্ষত্র একটি অত্যন্ত ঘনবস্তু। একটি কৃষ্ণ বিবরের ভর সূর্যের ভরের সমতুল্যও হতে পারে আবার সূর্যের ভরের অনেক বেশিও হতে পারে শ্বেত বামন এবং নিউট্রন নক্ষেত্রের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে একটি শ্বেত বামনের ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি হতে পারে না। এই তথ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ত্রিশ দশকে আবিষ্কার করেন যার জন্য তিনি ১৯৮৩ সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পান। একটি কৃষ্ণবিবরের পদার্থসমূহ অত্যন্ত ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ যার ভিতর থেকে কোন ধরনের আলোক রশ্মি বের হয় না, কারণ এটাতে অভিকর্ষ বল (gravitational force) এত বেশি যে আলোক কণাগুলিকে ভিতরের দিকে টেনে নেয়। একটি কৃষ্ণ বিবরের ব্যাস তার ভরের উপর নির্ভর করে। যদি তার ভর সূর্যের ভরের সমান হয় তাহলে ব্যাস হয় প্রায় তিন কিলোমিটার আর ভর বেশি হলে সেই অনুপাতে সেটার ব্যাসও বেশি হয়। নক্ষত্রের এই তিন ধরনের মৃত্যু অর্থাৎ তিন ধরনের চূড়ান্ত পরিণাম কি কারণে ঘটে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

তাহলে প্রায় দশ হাজার কোটি বছর পরে (অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের বয়সের প্রায় দশগুণ সময় অতিবাহিত হলে) সব নক্ষত্র শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র অথবা কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে। আরো ছোট ছোট পদার্থের টুকরো থাকবে, যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূলিকণা ইত্যাদি। এইসব বস্তুও পরস্পরের আকর্ষণে একত্রে থাকবে অর্থাৎ তারা একই নীহারিকায় থাকবে। কিন্তু ঐ নীহারিকা থেকে অতি সামান্য পরিমাণে বিকিরণ নির্গত হবে কেননা সব বস্তুই তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যেসব নীহারিকা একদলে নয় তাদের মধ্যে দূরত্ব এখনকার চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং তারা পরস্পর থেকে আরো দূরে সরে যেতে থাকবে। কালক্রমে নীহারিকার গতিময় বিবর্তনের (dynamical evolution) ফলে অধিকাংশ নক্ষত্র নীহারিকা থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। এই প্রক্রিয়া বিশ্বের বর্তমান বয়সের তুলনায় অনেক দীর্ঘকাল ধরে ঘটবে, এখন পর্যন্ত তা শুরু হয় নি। যেসব নক্ষত্র নীহারিকায় অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো মিলিত হয়ে একটি বিরাট কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে। এই নীহারিকা- কৃষ্ণ বিবরের ভর হবে প্রায় একশত কোটি সূর্য ভরের সমান। তার শোয়ার্তশিল্ড ব্যাসার্ধ হবে প্রায় তিনশত কোটি

কিলোমিটার বা আড়াই আলোক ঘন্টা (একটি কৃষ্ণ বিবরের যে কেন্দ্রস্থলীয় অংশের মধ্যে তার পদার্থসমূহ আবদ্ধ এবং যেটার থেকে আলোক রশ্মি বাইরে যায় না সেটা তার শোয়ার্তশিল্ড ব্যাসার্ধের (schwarzschild radius) ভেতর হয়। আলোক ঘন্টা হলো যে দূরত্ব আলোক রশ্মি এক ঘন্টায় অতিক্রম করে)।

এই অবস্থায় পৌছাতে নীহারিকার সময় লাগবে $১০^{১৮}$ থেকে $১০^{২৭}$ বছর। একদল নীহারিকা শুধু একটি মাত্র কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে। তাই $১০^{২৭}$ বছর পরে সমগ্র বিশ্ব এই নীহারিকা-কৃষ্ণবিবরের সমষ্টিতে পরিণত হবে। তাদের মাঝখানে থাকবে বিশাল শূন্যস্থান যেখানে কতগুলো পথভ্রষ্ট শ্বেত বামন, নিউট্রন-নক্ষত্র বা কৃষ্ণ বিবর একা একা ভ্রমণ করতে থাকবে। একটি কৃষ্ণবিবর চিরস্থায়ী নয় বরং তা সামান্য পরিমাণে বিকিরণ নির্গত করে বহুকাল পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিকিরণতত্ত্বের ভিত্তি আবিষ্কার করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী S.W Hawking (এস. ডব্লিউ হকিং) এবং এটা হকিং বিকিরণ (Hawking radiation) নামে অভিহিত। সূর্য ভরের সমান ভর বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণ বিবর বাঁচে প্রায় $১০^{৬৭}$ বছর। নীহারিকা-কৃষ্ণবিবর বহুগুণ বড় এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলো $১০^{১০০}$ বছর পর্যন্ত বাঁচবে। তাই $১০^{১০০}$ বছর পরে বিশ্বের সব কৃষ্ণ বিবর বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বর্তমান বিশ্বে যে নীহারিকাগুলো আছে তাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানব জাতির কি পরিণাম হবে তা বলা কঠিন, কিন্তু কোনো ধরনের প্রাণীর বেঁচে থাকা নির্ভর করে সম্ভাব্য শক্তি-উৎসের উপর। এখানে কৃষ্ণবিবরের একটি ভূমিকা আছে। যতদিন আমাদের সূর্য বেঁচে থাকবে ততদিন আমাদের শক্তির অভাব হবে না। এই সময়টা, হবে কয়েকশত কোটি বছর। সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে গেলে মানবজাতি অন্য কোনো নক্ষত্রে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এজন্য তারা পারমাণবিক কেন্দ্রীয় শক্তি ব্যবহার করতে পারে। প্রায় দশ হাজার কোটি বছর পরে সব নক্ষত্রই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন শক্তির উৎস হবে ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণবিবর (rotating black hole)। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আর পেনরোজ (R.Penrose) আবিষ্কার করেছেন যে, এক ধরনের প্রক্রিয়া দিয়ে ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণ বিবর থেকে শক্তি আহরণ করা যায়।

তত্ত্ব অনুসারে নীহারিকা কৃষ্ণবিবর থেকে মানব-জাতি শক্তি পেতে পারে। কিন্তু তাও চলবে বড় জোর $১০^{১০০}$ বছর পর্যন্ত। তারপরে কি হবে তা বলা অত্যন্ত কঠিন বিশ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে আরো কতগুলো মন্থর প্রক্রিয়া ঘটবে যার সঙ্গে কৃষ্ণবিবরের কিছুটা সম্পর্ক আছে। এই প্রক্রিয়া ঘটে কোয়ান্টাম তত্ত্বের (Quantum theory) সুড়ঙ্গকরণ পদ্ধতি (Quantum tunneling) অনুসারে। চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় বৈদ্যুতিক বিভবের প্রতিবন্ধকতা (electric potential barrier) বা বাধা পার হওয়া যায় না কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে এই বাধা অতিক্রম করা যায়। নীহারিকা থেকে নিক্ষিপ্ত শ্বেত বামনগুলো মহাশূন্যে একা একা ভ্রমণ করবে, কিন্তু প্রায় $১০^{১০৭৬}$ বছর পরে সুড়ঙ্গকরণ প্রক্রিয়া দিয়ে আপনা থেকেই সেগুলো নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হবে। আবার এই

সময়ের মধ্যেই নিউট্রন নক্ষত্রগুলো কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে হকিং বিকিরণে প্রকৃতপক্ষে যে কোনো পদার্থের টুকরো আপনা থেকে সুড়ঙ্গ পদ্ধতি অনুসারে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হতে পারে। যদি কোনো বাইরের বল এক টুকরো পদার্থকে নিষ্পিষ্ট করে তবে এ বলের পরিমাণ যথেষ্ট হলে পদার্থটিকে তার শোয়ার্তশিল্ড ব্যাসের নিচে নামিয়ে তাকে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত করতে পারে। এ ধরনের বল আসলে পদার্থের টুকরোটিকে একটা বিভব বাধা (potential barrier) অতিক্রম করে কৃষ্ণবিবর অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে এই প্রক্রিয়া বাইরের বল ছাড়াও স্বতস্ফূর্তভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু তা ঘটে অনেক দীর্ঘ সময়ের পরিসরে। সুতরাং কোনো একটি পদার্থের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কৃষ্ণবিবরের অস্তিত্বের উপর। এ বিষয় সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে, যেমন সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম কৃষ্ণবিবরের ভর; যদি এই ভর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের হয়, তবে তার চেয়ে ছোট কোনো পদার্থের টুকরো কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হতে পারে না এবং সেই কারণে সেটা হবে স্থায়ী। এই ক্ষুদ্রতম ভর কি তা জানা নেই, কিন্তু অনুমান করা হয়েছে যে তা ১০[illegible] গ্রাম হতে পারে। এটাই তথাকথিত প্ল্যাংকের ভর (Planck mass)।

বিশ্বের অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা বলা হলো তার কিছুটা পরিবর্তন হবে বহুল আলোচিত প্রোটন-ক্ষয় (proton decay) সত্য বলে প্রমাণিত হলে। অভিকর্ষ বল, তড়িৎ চুম্বক বল, ক্ষীণ বল এবং কেন্দ্রীয় বল (gravitatlonal, electromagnetic, weak and nuclear force) প্রকৃতির চারটি মৌলিক বল। পদার্থ বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন হলো এই চারটি বলকে একত্রিত করা। ১৯৬৭-৬৮ সালে এস, এল, গ্ল্যাশাউ (S.L Glashow), আব্দুস সালাম ও এস ভাইনবার্গ (S. Weinberg) ক্ষীণ বল এবং তড়িৎ চুম্বক বলকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই তত্ত্ব থেকে তিনটি নতুন বস্তুকণার ভবিষৎদ্বাণী করা হয়। এ কণাগুলোর নাম দেয়া হয়েছে ডব্লিউ-প্লাস বা ধনাত্মক ডব্লিউ কণা, ডব্লিউ-মাইনাস বা ঋণাত্মক ডব্লিউ এবং জেড-জিরো বা আধানহীন জেড-বস্তুকণা।

এই বস্তুকণাগুলো জেনেভার পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। তত্ত্বের এই সাফল্যের পর অনেকেই চেষ্টা করেছেন এই তত্ত্বের সঙ্গে পারমাণবিক কেন্দ্রীয় বল যোগ করতে। অর্থাৎ ক্ষীণ বল, তড়িৎ চুম্বক বল এবং পারমাণবিক কেন্দ্রীয় বল নিয়ে একটি একীভূত তত্ত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। এই ধরনের তত্ত্বকে বলা হয় পরম একীভূত তত্ত্ব (grand unified theory)। পরম একীভূত তত্ত্বের ফল এই যে, আমাদের চিরপরিচিত প্রোটন তখন আর চিরস্থায়ী থাকে না বরং তার জীবনকাল হয় ১০[illegible] থেকে ১০[illegible] বছর। এই ধারণা যাচাই করার জন্য অনেকগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু প্রোটন ক্ষয়ের কোনো প্রমাণ এ যাবত পাওয়া যায় নি। তবে এর সঙ্গে কৃষ্ণ বিবরের একটা সম্পর্ক আছে।

একীভূত তত্ত্ব সঠিক না হলেও প্রোটন ক্ষয়ের আরেকটি কারণ হতে পারে। অবিকর্ষ বলের জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, প্রোটনের জীবনকাল $১০^{৮৭}$ থেকে $১০^{[illegible]}$ বছর হতে পারে। এটা এস. ডব্লিউ. হকিং নির্ণয় করেছেন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে শূন্যস্থান অবাস্তব কণা (virtual particles) আর বিপরীত কণা (anti-particles) দিয়ে ভর্তি। বহুকাল ধরে বেঁধে থাকা একটি প্রোটনকে একটি অবাস্তব ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবর গ্রাস করতে পারে, এবং তাকে পজিট্রনে পরিণত করতে পারে। কেন না কৃষ্ণ বিবরটি অবাস্তব হলেও তার ভেতরে গেলে প্রোটনের বৈশিষ্ট্য আর বজায় থাকে না। সুতরাং পরম একীভূত তত্ত্ব অনুসারে অথবা অভিকর্ষ সূত্র এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে প্রোটন চিরস্থায়ী না হলে বিশ্বের নিয়তি অন্য রকম হবে।

[গণিত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।]

স্পষ্ট কথা বলতে হবে

এ. ডবলিউ. মামুদ

একটি মসজিদ একদিন ছিল, আজ আর নেই। তার তিনটি গম্বুজে ইতিহাস কথা বলত, আজ আর বলে না! পাঁচশ বছরের ইতিহাসকে একদিনে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হলো। ধর্ম নিরপেক্ষতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও 'বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান'-এর আদর্শকে তছনছ করে দিল কিছু ধর্মোন্মাদ। তাদের হিংস্র নখরাঘাতে লাঞ্ছিত, ভূলুণ্ঠিত, ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত ভারতবর্ষের মাটিতে মৃত মানুষের লাশের স্তূপ। ভারতবর্ষ নামক নানা গন্ধের নানা রঙের ফুলের যে বাহারি মালা, জগতে আর কোথাও যার দেখা মিলবে না, আজ তা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে সচেষ্ট একদল দুর্বৃত্ত। সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটিয়ে, ধর্মীয় বিদ্বেষের কলুষিত বাতাসকে ধর্মীয় সহনশীলতা ও প্রগতিশীলতার বাতাসকে এলোমেলো করে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ যে ভারতকে গড়ে তুলতে চেয়েছি, সরযু নদীর তীরে তা ভেঙ্গে গেছে। যারা ভেঙ্গেছে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষই তাদের ধর্ম, জাতের নামে বজ্জাতি করে হানাহানি চালানো তাদের স্বভাব, সাধারণ গরিব মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে বিভেদের বিষ ঢুকিয়ে দুর্বল করে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য।

কয়েকদিন ধরে যে মৌলবাদ ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তা আসলে একটা দানবীয় জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের চেহারাটা ৩০-এর দশকে জার্মানিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তখন হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসি বাহিনী যে পেশীশক্তি ব্যবহার করে ইহুদি নিধন যজ্ঞে মেতে উঠেছিল, আজকের তথাকথিত সংঘ পরিবারের কার্যকলাপে সেই ফ্যাসিস্ত প্রবণতা প্রকাশিত। ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণাকে পুঁজি করে আর্যত্বের দাবি নিয়ে খুনি সাজতে সেদিন হিটলারের বিবেকে কোন দংশন ছিল না। আজকের এই আদভানি, যোশী, সিংঘালদের কণ্ঠেও ভয়াবহ দাঙ্গায় এগারশো লোকের মৃত্যুর জন্য কোন অনুশোচনা নেই। এটা তাদের কাছে হিন্দুত্বের উত্থানের প্রমাণ। সেদিন জার্মান দানবীয় জাতীয়তাবোধের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে গোটা বিশ্ব বিবেক শিউড়ে উঠেছিল, আজও এই ধর্মান্ধ গেরুয়াধারীদের নৃশংসতায় পৃথিবী শিহরিত। মুসলিম বিদ্বেষকে পুঁজি করে এরা ক্ষমতায় আসতে চাইছে। হিটলারের আসল উদ্দেশ্য যেমন ছিল কমিউনিস্টদের শেষ করে দেওয়া, এদেরও লক্ষ্য দেশের বাম আন্দোলনের মূলে

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংখ্যা- শিক্ষাবার্তা
৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৩

কুঠারাঘাত করা। তাই খেটে খাওয়া মানুষের হৃৎপিণ্ডকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য দাঙ্গা এদের হাতিয়ার। কারণ, এরা জানে মেহনত আর পরিশ্রমের ঐক্যকে ভেঙে দিতে পারলে শোষণের একনায়কতন্ত্রের পথ সুগম হয়। কমিউনিস্ট আন্দোলনের উদ্দিপ্ত যৌবনকে হত্যা করতে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদই এদের অস্ত্র। তাই রক্তাক্ত রথযাত্রা ও সাম্প্রদায়িকতার রণসজ্জায় ফ্যাসিবাদী হুঙ্কার, পুঁজিবাদের নিকৃষ্টতম রূপের বহিঃপ্রকাশ। একদিকে বাস্তবতা আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার আর্দশকে না ধরে আমরা বাঁচতে পারব না, অন্যদিকে এই ফ্যাসিস্ত বাহিনী ধর্মান্ধতাকে উস্‌কে দিয়ে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আর সন্দেহের বাতাবরণে দেশটাকে মুড়ে দিতে চাইছে।

প্রশ্ন হলো, মৌলবাদের মুখোশের আড়ালে এই যে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দিতে চাইছে, কেন আজ তার এত সাহস? এই বর্বর তাণ্ডবাহিনী কেন পারল আমাদের শতাব্দী-প্রাচীন ঐতিহ্যকে কলঙ্কময় করতে? ৬ ডিসেম্বরের ঘটনায় এটা পরিস্কার যে, বিবেকহীন স্বার্থান্বেষী কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা, হিংসায় উন্মত্ত তাদের লক্ষাধিক অনুচর বাহিনী, দুরভিসন্ধিগ্রস্ত রাজ্য সরকার এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন কেন্দ্রীয় সরকার— সবাই মিলে আমাদের ইতিহাসে জঘন্যতম কালিমা লেপন করল। ভারতবর্ষের মতো একটা দেশ যেখানে অল্প শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি, সেখানে ধর্মীয় জিগিরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে সোনায় সোহাগা হয়ে উঠবে বলে এইসব চক্রান্তকারী মনে করে। তাই মসজিদ ভাঙা এবং তার পাল্টা হিসাবে মন্দির আক্রমণের নামে একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে সভ্য ভারতে মধ্যযুগীয় বর্বরতা চালানো হলো। রাষ্ট্র ক্ষমতার লোভে ধর্মকে নিলর্জ্জভাবে ব্যবহার করার ঘটনা আবার আমরা দেখলাম ৬ ডিসেম্বর ,যার প্রথম দৃশ্যটা দেখেছিলাম ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়।

আজ আমাদের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইতিহাসের শিক্ষাকে অস্বীকার করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, ইতিহাসকে যারা ভুলে যায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই তাদের শাস্তি। একসময়ে ব্রিটিশ তার স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। সেই বিভেদকে দূর না করে তাকে জিইয়ে রাখা হলো স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতিতে। তারপর ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কথা বলা শুরু হলো ধর্মতোষণ। যে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথে প্রধান অন্তরায়, দেশের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায় টিকে থাকতে এবং মেহনতী জনগণের উপর শোষণের প্রক্রিয়া অব্যাবহত রাখতে সেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে আপস করেছে। এক সময় অযোধ্যার ওই এলাকায় শিলান্যাসের অনুমতি দিয়ে বিবাদের সূত্রপাত যারা করেছিল, তারাই মুসলিম মহিলা বিল চালু করে ইসলাম ধর্মের মৌলবাদীদের হাত শক্ত করেছে। শাহবানুর চোখের জল সেদিন তারা দেখতে পান নি অথচ আজ সেই মৌলবাদের তকমাধারীদের বিরুদ্ধে এদের মুখে খই ফুটছে। একদিন ওই বিল চালু করে বর্তমান শাসক দল সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করেছিল, আজ দেশের প্রধান বিরোধী দল সেই পথই অনুসরণ করল। সুতরাং যদি বলা হয় যে, শাসক দলের তৈরি করা জমিকে

ব্যবহার করেই ফ্যাসিবাদ আজ আমাদের আদর্শ মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে লুটেরা আর খুনীদের দিয়ে ধর্ষণ করাল, খুব ভুল বলা হবে কি? 'আদালত মানি না' 'সংবিধান মানি না,' অন্যায় দাবির পিছনে রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন সমর্থন যে ছিল, তার আরো প্রমাণ কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে জেনেও লাখ লাখ করসেবক নামক দুস্কৃতকারীদের বিতর্কিত এলাকায় জড়ো হতে রাজনৈতিক নেতাকে অযোধ্যায় ঢুকতে না দেওয়া। মসজিদ ভাঙা শুরু হওয়ার পর ৫ ঘণ্টা ধরে উন্মত্ত তাণ্ডবলীলা চলতে দেওয়া এবং সেইসব সাম্প্রদায়িক সেবকদের কাজ শেষে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের তরফে বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা করা— আর এই এতগুলো ঘটনা যখন ঘটছে, তখন আমাদের কেন্দ্রীয় শাসক দল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। যদিও জাতীয় সংহতি পরিষদ ও উচ্চতম ন্যায়ালয় তাদের নেতার হাতে তুলে দিয়েছিল সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা। আমাদের রাষ্ট্রপতিকে দীর্ঘ সময় ধরে কিছু জানানো হয়নি, যার ফলে বিরোধী নেতাদের সামনে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোন রাষ্ট্রপতি ক্ষোভে, দু:খে, চোখের জল আটকাতে পারেননি। ফ্যাসিস্ত বাহিনীর হাত থেকে বিতর্কিত এলাকা মুক্ত করতে সময় লেগেছে বাবরি মসজিদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়ার পরেও ৩৬ ঘণ্টার বেশি সময় । একের পর এক দাঙ্গা লেগেছে, ছুরি, বোম, গুলি, আগুন মানুষের প্রাণ কেড়েছে অবাধ লুটপাট চলেছে, হাজার হাজার জনগণ আশ্রয়হীন হয়েছে, সন্তানহারা জননীর বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ-বাতাশ কেঁপে উঠেছে, রাজপথ রক্তে লাল, ভোরগুলো, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের বদলে নিয়ে এসেছে কালো দিন-এরজন্য দায়ী অন্ধকারের জীবদের বিরুদ্ধে আমাদের শাণিত চেতনায় আক্রোশ ফুটে উঠেছে, আমরা প্রতি মুহূর্তে চাইছি, বন্ধ হোক এই মৃত্যুলীলা, ধ্বংসের খেলা। আর সমানে ভাবছি, এই হাহাহানি কি ঠেকানো যেত না, রোখা হত না, এই বিদ্বেষের আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার অপচেষ্টাকে। কেন আগেই ব্যবস্থা নেওয়া হলো না সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষায়? তবে কি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে আমরা ধরে রাখতে পারব না, মৌলবাদকে পরাজিত করে হিন্দু ও মুসলমানের গলাগলিকে গালাগালিতে রূপান্তরিত করার পথ কি ছাড়বো না? আস্তিনে লাঠি আর ছোরা নিয়ে পরস্পরের রক্তের স্বাদ আরো কতদিন পেতে চাই? হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, মৌলবাদীরা যে দুপক্ষেরই সাধারণ শত্রু—এ কথাটা বুঝতে ও বোঝাতে আরো সোচ্চার হতে চেয়ে পারছি না। কেন বলা হচ্ছে না, ধর্ম প্রত্যেকের নিজস্ব বিশ্বাস, যার যার ধর্মাচরণ নিজস্ব বিশ্বাস, যার যার ধর্মাচরণ তার নিজস্ব অধিকার, প্রকাশ্যে ধর্ম নিয়ে আদিম উল্লাস চলবে না। আর কত রক্ত ঝরলে, কত মায়ের বুক খালি হলে, স্ত্রী স্বামীহারা হলে এবং দাঙ্গার আগুনে বাতাস আর কতটা উত্তপ্ত হলে একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ এই গোটা বিষয়টাকে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসাবে বিচার করে সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে একে

মোকাবিলা করার চেষ্টা করবেন, বামপন্থীদের মতো স্পষ্ট কথা বলার, সাহস দেখাবেন, তাদের মতো মৌলবাদের খোলাখুলি সক্রিয় বিরোধিতা করবেন?

বহু পিতামাতার সন্তান, যাদের অনেকেই গঙ্গা দেখেনি, এই প্রজন্মে নাগরিক হওয়া সাম্প্রদায়িক বিভেদের নোংরা চেহারাটা যাদের কাছে অজ্ঞাত থাকার কথা, তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ জায়গা করে নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বাবা-মা রা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে সন্তানকে সম্প্রীতির শিক্ষা দেননি, উল্টো গলাধাক্কার বিষ ঢুকিয়ে কলুষিত করেছেন সন্তানের কোমল হৃদয়কে। আজকের যুব সম্প্রদায়ের এক অংশের মধ্যে আচার-আচরণ, কথাবার্তায় তা ফুটে ওঠে। '৪৬-এর দাঙ্গার মারাত্মক পরিণতি দেশ ভাগের কুফল এদের শিক্ষিত করেনি, উন্নত চেতনায় গড়ে তোলেনি তাই সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যখন দরকার তাকে সঠিক ঐক্যের রাস্তাটা চেনানো, তখন কেউ কেউ মনের জঞ্জাল না সরিয়ে 'কাফের' আখ্যা দিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণা করার মনোবৃত্তিকে লালনপালন করছেন। বাবা-মার বোঝা দরকার যে, ভবিষ্যতের ভারত যদি মানুষের লাশের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, তাহলে তার নিজের সন্তানও সেই ধ্বংসের আগুন থেকে রক্ষা পাবে না। পরিবারের অভ্যন্তরীণ ভাবনা-চিন্তার মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা দরকার, সৌভ্রাতৃত্বের মানসিকতার ব্যাপ্তি ঘটানো শুরু করতে হবে আমাদের প্রতি ঘরের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনার সূত্র ধরেই। বিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যেও আনা দরকার বিদ্বেষ-বিরোধী তীব্রতা। ছেলেমেয়েদের পরস্পররে ধর্মের আসল রূপ শেখাতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী, ধর্মীয় পক্ষপাতহীন চরিত্র হিসাবে। পাঠ্যসূচির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানেরা অতীত ইতিহাস থেকে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের অংশকে বাদ দিয়ে সৌহার্দের বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা গড়ে তোলা দরকার, যা পরস্পরের প্রতি ভালবাসার জন্ম দেবে। এই ভালবাসার মাধ্যমেই ধর্মীয় বিদ্বেষকে তৃণমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। না হলে শোষক শ্রেণী তার শোষণের অধিকারকে কায়েম রাখার চেষ্টায় উভয় সম্প্রদায়ের দূরত্বকে ব্যবহার করে যেতে থাকবে। সাধারণ মানুষের এই সত্য বোঝার সময় এসেছে যে, দাঙ্গায় এই সব তথাকথিত উচ্চবিত্তেরা মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত হন না, তাদের ভাষায় যারা নিকৃষ্ট, সেই গরিব, মধ্যবিত্ত, দুর্বল মানুষেরা জীবিকায় টান পড়ে, তারা আশ্রয়চ্যুত হন, তাদের শোষণ বাড়ে।

সুতরাং ধর্মবিদ্বেষহীন একটা ভারতকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য একদিকে যেমন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে সাম্প্রদায়িক উম্মাদদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়াটা জরুরী, অন্যদিকে রাজনৈতিক দল এবং গণসংগঠনগুলিকে লাগাতার প্রচার আন্দোলন চালিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির মুখোশ খুলে দিতে হবে। এই কাজে বামপন্থীরা ইতোমধ্যেই যতটা এগিয়ে গেছেন, অন্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি ভোটের চিন্তা তুলে রেখে, তাদের হাত মজবুত করতে যদি তার সিকিভাগও এগোনোর সাহস দেখাতে পারতেন, তাহলে স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরে আমাদের এভাবে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত

হয়ে পড়তে হতো না। ধর্মের বাঁধন দিয়ে সমাজ বিকাশের নানা বাধা তৈরি করার চেষ্টা বহু শতাব্দীর কাহিনী। কিন্তু তাকে অতিক্রম করেই সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে। ধর্ম কখনোই বিজ্ঞানকে তার রাস্তা ছেড়ে দেয়নি. বিজ্ঞানকে স্বীয় যুক্তির জোর দেখিয়ে কুসংস্কারকে পরাজিত করতে হয়েছে। মানুষই সেই গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের পতাকা উড়িয়েছে। আজ আবার সেই বিজ্ঞানকে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে উন্নত চেতনার সমৃদ্ধির পথে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অলৌকিক অস্তিত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের লড়াইয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে হবে। রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের অশুভ প্রচেষ্টাকে আটকাতে হলে জনজীবনে ধর্মান্ধতার প্রভাব কমানো দরকার। নচেৎ এ ভারতবর্ষে, রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের ঐক্যের ভারতবর্ষে বিদ্বেষ আর হানাহানির কুটিল ষড়যন্ত্র রক্তারক্তি কাণ্ড চলতে থাকবে। মাঝে মাঝে বলপ্রয়োগ করে থামাতে বাধ্য করা হবে মাত্র। শুভবুদ্ধির, সচেতনতার এবং মনুষত্বের ঘটবে পরাজয়। বিশ্ব এই ভারতের দিকে আঙুল তুলে বলবে, "অবশেষে ধর্মকে ঘিরিতে হলো বাহুবল দিয়ে, বাহুবল দুর্বলতা করায় স্মরণ"।

[প্রথম প্রকাশ, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯১— গণশক্তি, পশ্চিমবঙ্গ]

[*সভাপতি, ইতিহাস সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ।*]

সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কোন ক্ষমা নেই

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দেশ আজ এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। স্বাধীনতার পরে সমগ্র জাতির জীবনে এত বড় দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি কখনও উপস্থিত হয় নি। ৬ ডিসেম্বর হিন্দু মৌলাবাদী-সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সংঘবদ্ধ বর্বরোচিত আক্রমণের ফলে বাবরি-মসজিদ ধূলিসাৎ হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ বলে কথিত এই রাষ্ট্রে এত বড় চ্যালেঞ্জ আর কখনও আসে নি। বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হওয়ার পরের যে ইতিহাস তা আমাদের চরম লজ্জা ও আত্ম-অবমাননার ইতিহাস। চরম পরিতাপের কথা, সাম্প্রদায়িকতার কলুষ বহু সংগ্রামের পাদপীঠ পশ্চিমবঙ্গ ও বিশেষভাবে কলকাতা ও তার সংলগ্ন কয়েকটি এলাকায়, তা যে যত সামান্য পরিমাণেই হোক না কেন, স্পর্শ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের গৌরবময় ঐতিহ্যে আজ ক্ষতের দাগ।

এবারের সাম্প্রদায়িক ঘটনার মূল পাণ্ডা বি জে পি

রাম জন্মভূমি নিয়ে বিজেপি-র ভূমিকা কত ন্যাক্কারজনক তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুপ্রিম কোর্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করতে ও কসুর করেনি বিজেপি। বিজেপি এবং তার সহযোগী সংগঠন আরএসএস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ও শিবসেনা-পরিচালিত কুৎসিত আক্রমণে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হওয়ার পর আর এসএসভিএইচপি, রজরং দল ও মুসলিম মৌলবাদী সংগঠন নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশেষ খর ব: তিনটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশেও কেন্দ্রের শাসন জারি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশেও কেন্দ্রের শাসন বলবৎ আছে। কিন্তু বিজেপি এখনও রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃত। স্বীকৃতির সেই মর্যদাকে বিজেপি এখনও তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্যতার কাজে ব্যবহার করছে। বিজেপি শাসিত তিনটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারির নেপথ্য পটভূমির কথা আলোচনা করলেই এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা ও বিজেপি-র প্রতি তার দুবর্লতা উদ্‌ঘাটিত হবে। সংবিধানে স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আনুগত্য জানিয়ে তাকে ভুলণ্ঠিত করার যে কদর্য রাজনীতি বিজেপি অনুসরণ করে চলেছে তার কোন ক্ষমা নেই। থাকতে পারে না। সংবিধান

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংখ্যা শিক্ষাবার্তা
৬ষ্ঠ বর্ষ : ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ১৯৯৩

লংঘনকারী এই দলের রাজনৈতিক স্বীকৃতি আরও কতদিন মেনে নেওয়া হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নরসিমা রাও সরকারের। আমরা জানিনা প্রধানমন্ত্রী আর কতদিন বিজেপি সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন নিষ্ক্রিয়তার নীতি অবলম্বন করে চলবেন। কিন্তু বিজেপি সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

দিল্লির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের উপর নির্ভর করে না থেকে বিজেপি-কে সর্বস্তরে মোকাবিলা করতে হবে। জনজীবন থেকে বিজেপি-কে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার যে সর্বনাশা খেলায় বিজেপি মেতে উঠেছে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহিত করতে হবে। এই কাজে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ভরসা রাখার কোন জায়গা নেই। ভোটের ও গদির রাজনীতি মাথায় রেখে এই দল বারবার হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধরনের মৌলবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

বিজেপি-র সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের গোপন অশুভ আতাতের কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। তাই বিজেপি কে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করার রাজনৈতিক উদ্‌যোগ গ্রহণ করতে হবে। বামফ্রন্টের দলগুলিকেই। রাষ্ট্রীয় মোর্চা, সমাজবাদী পার্টি, বামফ্রন্ট বহির্ভূত বিভিন্ন বামপন্থী দল এবং সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে এই কাজে শামিল করানোর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে তাদের। এ কাজে দলীয় সংকীর্ণতার কোন স্থান নেই, অবকাশ নেই কোন শৈথিল্যের। একথা যেন আমরা না ভুলি। এ মুহূর্তের এটাই সবচেয়ে জরুরি ও বড়ো কাজ।

কংগ্রেসের লজ্জাজনক ভূমিকা : সাম্প্রদায়িকতাবাদের পরিপোষকতা

দেশের এই সর্বনাশের জন্য বিজেপিসহ অন্যান্য হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনসমূহ আজ জনমতের আদালতে প্রধান আসামী হিসাবে অভিযুক্ত। মন্দির-মসজিদ বিতর্কের পরিণতিতে যে চরম অপরাধ অনুষ্ঠিত হলো অযোধ্যার মাটিতে তার দায়িত্ব কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার কোন ক্রমেই এড়াতে পারে না। অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃত্ব বিভিন্ন সময়ে মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহরুও দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে এই বির্তকের মীমাংসায় যথোচিত পদক্ষেপ নেন নি। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে অযোধ্যা প্রশ্নে রাজনৈতিক মাত্রা সংযোজিত হয়। রাজীব গান্ধীর জয়যাত্রা বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়, কালক্রমে সে বিষবৃক্ষ মহীরূহে পরিণতি লাভ করে। একথা সকলেরই জানা আছে যে, রাজীব গান্ধীর আর্শীবাদ নিয়েই রামমন্দিরের শিলান্যাস হয়।

জীইয়ে রাখা হলো অযোধ্যা প্রশ্ন। ১৯৮৯-এ এই প্রশ্ন আরও বড়ো আকারে দেখা দিল। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির মিলিত উদযোগে সাম্প্রদায়িক উগ্রতা সাময়িকভাবে

চাপা পড়ল। ১৯৮৯-এর নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হলো বটে কিন্তু উত্তর ভারতে বিজেপি শক্তিমান হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সর্প আবার ফণা তুলল। আদবানির রাম রথযাত্রা সূচনা করল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং বাধা দিলেন। কিন্তু সমস্যা মিটল না। কংগ্রেস ও বিজেপি -র চক্রান্তে জনতা সরকারের পতন ঘটল।

সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতার বিষাক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দিল্লিতে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো কংগ্রেস। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে দিল্লির তখ্‌তে আসীন হবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস হাত মেলাল বি এজ পি-র সঙ্গে। কংগ্রেস ও বিজেপি-র এই অশুভ আঁতাত যে দেশের সমূহ বিপদ ডেকে আনবে বামপন্থীরা তা সেদিন বুঝেছিলেন এবং সময়মতো কংগ্রেস সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে হুঁশিয়ারি গ্রাহ্য করেন নি নরসিমা রাও-এর সরকার।

জাতীয় সংহতি পরিষদের সর্বশেষ বৈঠকে অযোধ্যা প্রশ্নে যথাকর্তব্য পালনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রীকে নি:শর্ত, সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই ন্যস্ত বিশ্বাস তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করায় তিনি অবহেলা করেছেন। তারই পরিণতিতে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হয়েছে এবং ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস হয়েছে কালিমালিপ্ত কলঙ্কিত হয়েছে বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তি। প্রধানমন্ত্রী সময়োচিত ব্যবস্থা নিলে এই ঘৃণ্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে পারত না। দেশের এই সর্বনাশের দায়িত্ব যেমন বিজেপি ও সংঘ পরিবারের, তেমনি প্রধানমন্ত্রীরও। এই দায়িত্ব থেকে তিনি অব্যাহতি পেতে পারেন না।

ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্য সংগ্রাম কেন?

দেশ বিভাজন ও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কলঙ্কের বোঝা বহন করে শত শহীদের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানেরা মিলিত স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আপস-রফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র। তা সত্ত্বেও খণ্ডিত দেশে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তা গড়ে তোলার সুযোগ ছিল। কিন্তু সে সুযোগ রাষ্ট্র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাটাই দেয় যে মান্ধাতা আমলের সনাতনী মতাদর্শ গ্রহণ করার আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায় না। হিটলারের ফ্যাসিবাদ থেকে ইরানের মৌলবাদ আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। কে না জানে এইসব প্রাচীনপন্থী মতাদর্শ ব্যবহৃত হয় সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহের স্বার্থে। ইতিহাসের চাকাকে যারা পেছনের দিকে ঠেলে দিতে চায় তাদের স্বার্থই রক্ষিত হয় এই সব কালজীর্ণ আদর্শের সংরক্ষণে, পরিপোষকতায় ও পুষ্টিবৃদ্ধিতে। পৃথিবীর সর্বত্র এবং আমাদের দেশের মৌলবাদী সংগঠনসমূহের তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলিমই হোক মতাদর্শ ও সাংগঠনিক কাঠামো লক্ষ করলেই ধরা পড়বে ও ওদের মতাদর্শ ফ্যাসিবাদী এবং

ফ্যাসিবাদী ফুয়েরার নীতির ভিত্তিতে রচিত হয় ওদের সাংগঠনিক কাঠামো। ভিন্ন 'সম্প্রদায়' এর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ অবলম্বন করে, চিন্তার জগতে মধ্যযুগীয়তাকে ফিরিয়ে আনার অপপ্রয়াসে নিয়োজিত এই সব সংগঠনে শৃঙ্খলার নামে গড়ে তোলা হয় ফ্যাসিবাদী সংগঠনের হুকুম তালিম করার শৃঙ্খলা। গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার বিন্দুমাত্র স্বাক্ষরও এই সব সংগঠনে অনুপস্থিত।

স্বাধীন ভারতবর্ষে বারবার সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার বহু ঢক্কানিনাদিত আদর্শের তোয়াক্কা না করে পুনরুত্থান ঘটেছে সব রকম সাম্প্রদায়িকতাবাদের।

সাম্প্রদায়িকতাবাদ-মৌলবাদের এই পুনরুত্থান দেশের সংবিধান স্বীকৃত সামাজিক ন্যায় ও রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর পরেও হিন্দু-মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের পুনরুত্থান প্রাক-স্বাধীনতা আমলের সাম্প্রদায়িকতাবাদের চেয়ে ভীষণতর জঙ্গি ফ্যাসিবাদী রূপ পরিগ্রহ করেছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ কেবল মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের কাছেই মারাত্মক বিপদ হিসেবে দেখা দেয় নি। যারাই আমাদের দেশকে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বজায় রাখতে চায় তাদের কাছেও সমান বিপজ্জনক। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সাম্প্রদায়িকতাবাদ যে এক বিরাট দুস্তর বাধা তা বলার অপেক্ষা রাখে না, অপরদিকে, সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সংখ্যালঘুদের ভয়ভীতিকে অবলম্বন করে তাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে, ধর্মের মদিরা পান করিয়ে মিলিত সংগ্রামের পথ থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ যমজ ভাই। আকৃতিতে ভিন্ন প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতিতে তারা এক ও অভিন্ন। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকতাবাদের হাত থেকে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বাঁচাতে তো পারবেই না, বরং তা ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে সংঘাতের মাত্রাকে প্রশস্ততর করবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদের তার পতাকা যাই হোক না কেন -অন্ধ শক্তির কাছে আত্মসমপর্ণ নয়-তাকে যে কোন মূল্যে মোকাবিলা করতেই হবে। কারণ আগামী দিনের মেহনতী মানুষের আখেরী লড়াইয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রাথমিক পূর্বশর্ত।

মন্দির-মসজিদ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান

মুক্তমনা ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তন্নিষ্ঠ গবেষণার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হলো : ১. বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা আর বর্তমান যে অযোধ্যা, তা এক কিনা তার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। ২. রাম মহাকাব্যের নায়ক, ঐতিহাসিক চরিত্র নন। কিংবদন্তী অনুসারে যদি রামচন্দ্রকে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলেও কোন স্থানে তার জন্ম, সে সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। ৩. অনির্দিষ্টক রামজন্মভূমির স্থানে মন্দির ছিল তার কোনও নি:সংশয়াতি প্রমাণ নেই। ৪. বাবরি

মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা যে বাবর, এ বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। ৫. বাবর মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করেছিলেন-এই অভিযোগের যুক্তি ও তথ্যনির্ভর কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। ৬. অযোধ্যার ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে যে, অযোধ্যা বিভিন্ন যুগে নানা ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের কাছে পুণ্যভূমি বরে বিবেচিত হয়ে এসেছে, বিশেষভাবে কোন একক সম্প্রদায়ের নয়। ৭. দেশ যখন পরাধীন ছিল সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা নিজেদের স্বার্থে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের সূচনা করে-সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টিই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।

রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ নিয়ে যে বির্তক শুরু হয়েছে এবং রাজনৈতিক ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যে আশির দশক থেকে যাকে মাত্রাতিরিক্তভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে তাকে আর বাড়তে দিলে দেশের ঐক্য ও সংহতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে। ভেদবুদ্ধির ফলে যে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা গত কয়েকদিনে ভারতের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তা সমগ্র জাতির পক্ষে চরম লজ্জা ও অবমাননার। এই লজ্জা অপনোদনের দায়িত্ব আমাদের সকলের। আজকের পরিস্থিতিতে যে দায়িত্ব আমরা আগেও তুলেছি তা আজ আরও বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে হবে।

১. সমস্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্মৃতিসৌধকে 'প্রাচীন স্মৃতিসৌধ-সংক্রান্ত আইন' দ্বারা সুরক্ষিত করতে হবে।
২. অব্যবহৃত মন্দির-মসজিদগুলিকে নতুন করে ধর্মাচরণের জন্য ব্যবহার করা চলবে না।
৩. সমস্ত অব্যবহৃত মন্দির-মসজিদ, যেগুলি নিয়ে বির্তক আছে, সেগুলিকে জাতীয় স্মারক হিসাবে ঘোষণা ও রক্ষা করতে হবে।

এবারের কলকাতায় কী দেখলাম

উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উন্মত্ততায় বাবরি মসজিদ কেবল ধূলিসাৎ হলো না, ভেঙে পড়লো পরধর্মমত সহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। দেশের অন্যান্য প্রান্তের মতো পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতাতেও তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কলকাতার বিভিন্ন উপদ্রুত এলাকা ঘুরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা হল : ১. গত কয়েকদিনে কলকাতায় যা ঘটেছে তাকে সঠিক অর্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা যায় না। ২. হিন্দু-মুসলমান নির্বেশেষে সাধারণ মানুষ দাঙ্গা চায় নি, তারা দাঙ্গা চায় না ৩. দুর্যোগের এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও জনসংখ্যা ও এলাকার তুলনায় মৃতের সংখ্যা নগণ্য ৪. জমির ফাটকাবাজ ব্যবসায়ী ও অন্যান্য সুযোগসন্ধানীদের প্রত্যক্ষ পরিপোষকতায়-তারা জন্মসূত্রে হিন্দু মুসলমান যাই হোক না কেন-লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ। ৫. কোন কোন স্থানে পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য: পুলিশ যদি যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করত তা হলে এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি এড়ানো যেত। এই অভিযোগ কতদূর সত্য, তা রাজ্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখবেন বলে আশা করা যায়। ক্ষমতাসীন

রাজনৈতিক নেতৃত্বও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে এ প্রশ্নটি অনুধাবন করতে চেষ্টিত হবেন, তা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। ৬. গুজব কি পরিমাণে মানুষকে প্রভাবিত করতে আতঙ্ক ছড়াতে সহায়তা করতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল এবারের ঘটনায়।

গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার আত্মপ্রকাশ ঘটে নি, সে কারণে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্যঞ্চলের সাধারণ মানুষ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

বামপন্থী কর্মীদের সতর্ক প্রহরা ও মিলিত শান্তি মিছিলের প্রভাবে গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত হয়নি। কিন্তু বহু সংগ্রামের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ মহানগরী কলকাতা ও শহরতলীর কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় সাম্প্রদায়িক শক্তির কালো হাত সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিল কীভাবে?

চাই আজ মিলিত সংগ্রাম

ইংরেজদের আমলে এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে অনেক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়েছে, ঘটেছে অনেক রক্তপাত, জ্বলেছে আগুন। আর নয় সাধারণ মানুষ অশান্তি চান না, চান না তারা দাঙ্গা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কায়েমী স্বার্থের পৌষমাস, গরিবের সর্বনাশ। সম্প্রদায় নির্বিশেষে শান্তিপ্রিয় সকল মানুষের কাছে আমাদের আবেদন, আসুন আগুন নিয়ে এই খেলা বন্ধ করার জন্য আমরা সমবেত প্রতিরোধ গড়ে তুলি। মেহনতী মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের শাণিত আঘাতে সমাজের বুক থেকে নির্মূল করতে হবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ-মৌলবাদের জড়। পাড়ায়-পাড়ায়-মহল্লায়-মহল্লায় হিন্দু-মুসলমানের যৌথ শান্তি কমিটি গড়ে তুলুন, পরাস্ত করুন দুস্কৃতিদের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করুন বিজেপিসহ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের। শ্রমিক সংগঠনসমূহের কাছে আবেদন: সাম্রাজ্যবাদ ও বিদেশী পুঁজির কাছে দেশকে বিকিয়ে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে এবং দেশী-বিদেশী ধনিকদের মুনাফা মৃগয়ার বিরুদ্ধে শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ঐক্যই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করতে পারে। শিল্পী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন, মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে তার চেতনার রূপান্তর ঘটানোর কাজে সচেষ্ট হোন। ভ্রান্ত চেতনার কুয়াশার আবরণ ভেদ করে গণতান্ত্রিক মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুন মানুষকে। সকলের সমবেত প্রয়াস নিয়োজিত হোক পশ্চিমবঙ্গের এই সাময়িক কলঙ্ক অপনোদনে। আমাদের সমবেত সংকল্প: সাম্প্রদায়িকতাবাদী, মৌলবাদীদের কোন ক্ষমা নেই। আমাদের প্রতিজ্ঞা: যে কোন মূল্যে ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা আমরা উড্ডীন রাখবই।

[প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ — গণশক্তি, পশ্চিমবঙ্গ]

[*অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* ।]

গ্যালিলিও ও আজকের চার্চ

সনৎকুমার সাহা

অবশেষে ভ্যাটিক্যানের টনক নড়ল। ক্যাথলিক চার্চ প্রায় তিনশ ষাট বছর আগে এক ভুল বিচারের প্রহসনে যে অন্যায় করেছিল এতদিন পর নতমস্তকে তা স্বীকার করে স্পষ্ট উচ্চারণ করল, আমরা দু:খিত। আমরা অনুতপ্ত। বিচারটা ছিল গ্যালিলিওর। অভিযোগ, তিনি ধর্মদ্রোহী। পবিত্র গ্রন্থ যেখানে বলে, পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে, তিনি সেখানে তার বিপরীত মত প্রচার করেছেন। যেহেতু পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণী সরাসরি ঈশ্বরের মুখ নি:সৃত কাজেই তা অভ্রান্ত। তাকে খন্ডন করতে চাওয়া মানে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা। ঈশ্বরের রাজ্যে তা অমার্জনীয় অপরাধ। ধর্ম যখন বিশ্বাস নির্ভর থাকে এবং বিশ্বাসের প্রত্যয় যখন অপ্রতস আপ্তবাক্য সর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। তখন তো মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং মানুষের মুক্তচিন্তা যদিও ওই বিশ্বাসের ভূমিকে এতটুকু আঁচড় কাটে, তবে শিল্পীভূত ধর্মের রুদ্ধ চেতন পাহারাদারদা হা হা করে ছুটে এসে তাকে অংকুরেই বিনষ্ট করার জন্যে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। গ্যালিলিওর বেলায় ব্যাপারটা এই রকমই ঘটেছিল।

অবশ্য ধর্মীয় নিগ্রহের শিকার সে যুগে যে কেবল গ্যালিলিও-ই হয়েছিলেন, তা নয়। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্ম ছিল প্রথা ও বিশ্বাসের হাতে বন্দী। সমাজে তার দাপটও ছিল অপ্রতিহত। গির্জার শাসনকে অমান্য করার অধিকার কারো ছিল না। বিধিনিষেধের পান থেকে চুন খসে পড়লেই পাণ্ডা পুরুতদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ ছিল যে কারো জন্য অবধারিত ভাগ্যলিপি।

বিচারের পর গ্যালিলিও আরো আট বছর বন্দী হয়ে বেঁচেছিলেন। শেষ পাঁচ বছর অন্ধ হয়ে। আজ তার মৃত্যুর সাড়ে তিনশ বছর পর ক্যাথলিক গির্জার সর্বোচ্চ পীঠ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই বিচারের ভুল স্বীকার করা হল।

ক্ষমতার নিয়মই এই যে যেখানেই তার অবস্থান, সেখানেই তাকে ঘিরে গড়ে ওঠে এক দুর্দমনীয় স্বার্থচক্র। ক্ষমতার ভিত যদি হয় অনড় তবে ওই স্বার্থচক্রের পরিপোষণাও হয় প্রবল। এবং তারই অনিবার্য তাগিদে প্রতিহত হয় সব রকম প্রতিবাদ ও সংশয়। নির্মূল করা হয় যে কোন বেয়ারা বিদ্রোহ। প্রথাবদ্ধ ধর্ম যদি একচ্ছত্র শাসনের অধিকার

৬ষ্ঠ বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

পায় তবে তার বেলাতেও কোন ব্যতিক্রম ঘটে না-নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নিজস্ব নিয়ম তার সমস্ত বিবেক শূন্যতা নিয়ে সেখানেও কার্যকর থাকে। মধ্যযুগে পোপ ও গির্জার প্রাতিষ্ঠানিক চক্র এইভাবে শতাব্দীর পর শতব্দীর নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখে। তাতে নিপীড়িত নিষ্পেষিত হয় কত অসহায় মানুষ। অন্ধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ব প্রকৃতির সত্য, জীবনের সত্য তুলে ধরতে গিয়ে নি:শেষিত হন কত অসাধারণ মানুষ। চতুদর্শ শতকে যাজকতন্ত্রের আক্রোশ থেকে বাঁচতে নির্বাসনে প্রাণ দেন আধুনিক ইউরোপের প্রথম মহৎ কবি দান্তে। অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহ ধরতে পারলে তাকে পুড়িয়ে মারা হবে, এই দণ্ড মাথায় নিয়ে তাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে জীবনের শেষ কুড়িটি বছর। পনেরো শতকে এক অসামান্যা অপাপবিদ্ধা জ্যোতির্ময়ী বালিকা, জোন-অব আর্ককে বিচারের প্রহসনে ধর্মাধিকারীরা সত্যি সত্যি পুড়িয়ে মারে। অভিযোগ তার বিরুদ্ধে তিনি ঈশ্বরের নামে জনগনকে বিপথে চালিত করেন; তিনি গির্জার কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন, পুরুষের মত ঘুরে বেড়ান, সৈন্যদের ক্ষেপিয়ে তোলেন; তিনি নষ্ট জীবনের উপাসিকা, অসতী, দূরাচারিণী। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, অভিযোগ সব মিথ্যা। এবং এ শতাব্দীতে মানুষ শ্রদ্ধায় ও ভালবাসার তার ওপর ঈশ্বর প্রেরিত সন্ত এর অমরতা আরোপ করেছে। কিন্তু তার সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের শাসন ও শোষণ তাঁর প্রথাবহির্ভূত জীবনাচরণ এতটুকু সহ্য করেনি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথে মূর্তিমতী বাধা মনে করে তার মৃত্যুদন্ড তারা অবিচলিত নিষ্ঠুরতায় কার্যকর করেছে। গ্যালিলিও-র বয়স যখন ছত্রিশ, তখন, সেই ষোড়শ খৃস্টাব্দে ধর্মীয় কুসংস্কারকে অস্বীকার করে সত্যকে জানবার জানাবার তাগিদে একইভাবে প্রাণ দেন ইতালির আর এক চিরস্মরণীয় জ্যোতিবিজ্ঞানী, ব্রুনো। লুকিয়ে কোপারনিকাসের বই পড়ে তার চোখ খুলে যায়। প্রকাশ্যে তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন পৃথিবী আপন অক্ষ রেখার উপর আবর্তিত হয় এবং নিজের কক্ষ পথে নিয়মিত সূর্যকে পরিক্রমণ করে। তিনি আরো বলতে থাকলেন, সূর্যকে কেন্দ্র করে কতগুলো গ্রহের সুনির্দিষ্ট গতি পথে অবিরাম ঘোরা নিয়ে যেমন সৌরজগৎ, তেমনি দূরের মহাকাশে বিশাল নক্ষত্রমণ্ডলীতে আছে আরো অনেক সৌরজগৎ। সব মিলে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তা অসীম। তাতে সবাই চলমান। সূর্যও অতএব তার কেন্দ্র নেই। প্রান্তও নেই। আছে কেবল আপেক্ষিক কেন্দ্রিকতা-যেমন এক একটি সৌরমণ্ডলে তার সূর্য। এই মহাবিশ্বে গ্রহ নক্ষত্র সবই পরিবর্তনশীল। প্রত্যেকেই নশ্বর। যেমন শুরু আছে তেমন শেষও আছে, আর এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কোন স্বর্গ নেই। নরকও নেই।

বৈজ্ঞনিক পর্যবেক্ষণ ব্রুনোর সব কথাকেই আজ সত্যানুমানের স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু সেদিন পুরোহিততন্ত্রের কাছে এ সবই ছিল শাস্ত্রবিরোধী ঔদ্ধত্য। তাছাড়া পাপ-ভয়-স্বর্গ-নরকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণা এভাবে নস্যাত হলে জনগণের ওপর অনুপস্থিত ঈশ্বরের নামে তাদের কায়েমী স্বার্থের শাসন টিকিয়ে রাখাও আর সহজ হয় না। কাজেই ব্রুনোকে স্তব্ধ করে দেয়া তাদের অতি জরুরি দায়িত্ব হয়ে দাড়ায়। তাড়া খেয়ে ব্রুনো

পালিয়ে বেড়ান এক দেশ থেকে এক অন্য দেশে। আর যেখানেই যান, সেখানেই বলে বেড়ান তার ধ্যানধারণার কথা। ফলে তার মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে থাকে গোটা ইউরোপে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন তিনি এক শিষ্যের বিশ্বাস-ঘাতকতায়। ধর্মাধ্যক্ষরা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেন যাতে তিনি প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কারণ তিনি নিজেই যদি বলেন, তার ধারণা ভ্রান্ত, তবে সাধারণ মানুষের ওপর তার প্রভাব আপনা থেকেই ক্ষয় পাবে। গির্জার শাসন অমান্য করার প্রবণতাও তাহলে সহজে রোধ করা যাবে। কিন্তু শত নিপীড়নেও ব্রুনোকে টলানো গেল না এতটুকুও। সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে তিনি নি:শঙ্কচিত্তে বিচারকদের মুখোমুখি হলেন। পুরোহিততন্ত্র নিজেদের প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন হবার ভয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করল। প্রকৃতপক্ষে ভয় পেয়েছিল তারাই বেশি। ব্রুনোর মত গ্রাহ্য হলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সবই তখন বিপন্ন হয়ে পড়ত। আজকের পৃথিবীতে ব্রুনোই সত্যদ্রষ্টা বলে পুজিত, কিন্তু সেদিন তাকে চরম দণ্ড দিয়ে যাজকেরা জনগণকে এই বলে সর্তক করে দিতে চেয়েছিল যে, ওই ধর্মদ্রোহীর অনুসরণ করলে ঈশ্বর তাদেরও ক্ষমা করবেন না। অনুরূপ শাস্তি পেতে হবে তাদেরও। ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারার বিধান দেয়া হয়, যাতে 'পাপী' ব্যক্তির একবিন্দু রক্তও মাটিতে পড়ে পৃথিবীকে অপবিত্র করতে না পারে। কিন্তু তার এক বিন্দু রক্তও মাটিতে না পড়লেও তার সত্যনিষ্ঠার আর্দশকে মুছে ফেলা যায় নি। তারপর থেকে যুগে যুগে পৃথিবীর সব সত্যসন্ধ মানুষকে তা প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে ফন্দিবাজ মানুষের মনগড়া ধর্মই ক্রমশ তার মর্যাদা হারায়। ব্রুনোর মর্মান্তিক পরিণামের কারণে মহাকাল তাকেই যুগ যুগ ধরে আসামীর কাঠগাড়ায় দাড় করিয়ে রেখেছে।

একইভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে গ্যালিলিও বিচার-প্রহসনের জন্যেও। আধুনিক ফলিত বিজ্ঞানের পথিকৃৎ গ্যালিলিও কোপারনিকাস আর ব্রুনোর অনুসরণে আবার নতুন করে বলতে শুরু করেন, সূর্যই সৌরজগতের প্রধান। তাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘোরে। উন্নত দূরবীন আবিষ্কার করে তিনি তার সাহায্য এই মতের চাক্ষুষ প্রমাণ তুলে ধরতে লাগলেন। বই লিখলেন-নাম 'বিশ্বের প্রধান দুই নিয়ম বিষয়ক কথোপকথন।' তার মতের পক্ষে যুক্তিগুলো তাতে তিনি নিপুণভাবে সাজালেন। ফলে যাজকচক্রের আক্রোশ তার ওপরও এসে পড়ল।

এক সময়ে তিনি লিখেছিলেন, 'কোপারনিকাসের মতবাদ বহুদিন থেকেই' আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়। এর পক্ষে অনেক যুক্তি প্রমাণ খাড়া করেছি। কিন্তু জগতে নির্বোধের সংখ্যা এত বেশি যে, ভয় হয়, লিখে প্রকাশ করলে তা সবার ব্যঙ্গ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে, যেমন হয়েছেন আচার্য কোপারনিকাস স্বয়ং। তবু পরিণত জীবনে, আটষট্টি বছর বয়সে তিনি তার বই প্রকাশ করলন। সত্যের প্রতি অঙ্গীকার আর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার পর রফা করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ব্রুনোর মত একরোখা না হয়েও নিজের মতকে চেপে রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়

না। বিশেষ করে যখন তিনি জেনেছেন তার মতের পেছনেই রয়েছে বস্তুজগতের সব সাক্ষ্য প্রমাণ। ওই সাক্ষ্য প্রমাণকে অস্বীকার করা তার কাছে ছিল অনুচিত মূঢ়তা। এক বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কাছে খুব জোরের সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন- আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় বা বৈজ্ঞনিক পরীক্ষায় তাকে অস্বীকার করা একেবারেই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। মানুষের ধীশক্তিকে বেড়া বাঁধতে পারে কে? কোন মানুষকে পরিপূর্ণ সততায় এমন কথা বলতে পারে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে প্রেরিত জ্ঞানই যথেষ্ট-এ বিষয়ে নতুন করে আর কিছুই শেখার নেই? গ্যালিলিওর বই প্রকাশিত হবার পর আবার যেন মৌচাকে ঢিল পড়ল। গোড়া ধর্মরক্ষক ও তাদের সেবাদাসেরা তুমুল হৈ চৈ শুরু করে দিল। শেষে সত্তর বছর বয়সে গ্যালিলিও ধর্মান্ধদের বিচারের সামনে দাঁড়াতে রোমে আসতে বাধ্য হলেন। হয়ত বার্ধ্যক্য ও প্রাণ ভয়ে তার মনের জোর তখন কিছুটা কমে এসেছিল। তাই জেরার সময় উল্টা-পাল্টা এমন সব কথা বললেন যাতে তার মনোভাব ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না। তবু ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে তার সাজা হলো আজীবন কারাবাস। তার বইটিও বাজেয়াপ্ত করা হলো। শোনা যায়, শাস্তির আদেশ শোনার সময় গ্যালিলিও মাথা নিচু করে মাটিতে আস্তে আস্তে পা ঠুকতে ঠুকতে বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'তবুও পৃথিবী ঘুরবে'।

বিচারের পর গ্যালিলিও আরো আট বছর বন্দী হয়ে বেঁচেছিলেন। শেষ পাঁচ বছর অন্ধ হয়ে। আজ তার মৃত্যুর সাড়ে তিনশ বছর পর ক্যাথলিক গির্জার সর্বোচ্চ পীঠ থেকে আনুষ্ঠানিকভবে ওই বিচারের ভুল স্বীকার করা হল। শুধু তাই নয়, ভ্যাটিকান প্রাসাদের মাথায় শক্তিশালী দূরবীন বসাবারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে দূরবীন ছিল গ্যালিলিওর উদ্ভাবন এবং যাকে কাচের ভেতর দিয়ে ধাপ্পাবাজি বলে তার সময়ের ধর্ম বিশেষজ্ঞরা চোখ বন্ধ করে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তবে ভ্যাটিকানের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি এতদিনে মিললেও মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে স্বীকৃতি তার মিলে গেছে বহু আগেই। শত অত্যাচার অবিচার মাথায় নিয়ে চিন্তার মুক্তির পথ সহজ করতে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি তাদেরই একজন। তাদের অবদান মানব সমাজকে তার পুরনো বৃত্তে আর স্থির থাকতে দেয় না। চিন্তায় ও কর্মে নব নব কীর্তির উন্মেষ ঘটাতে তা অব্যাহত প্রেরণা যোগায়। ইউরোপীয় সমাজের সর্বস্তরে তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে। এমনকি ধর্ম চিন্তাতেও চিন্তার মুক্তি ও ঐতিহ্য উন্নতির আকাঙ্খার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্ম বদলাতে থাকে। ব্যক্তির উদ্যোগ ও বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রোটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলন ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাথলিক গির্জার এখতিয়ার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসে।

সমাজ রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া পরিণামে জন্ম দেয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের । স্পষ্টতই বোঝা যায় ধর্মীয় হুকুমদারি থেকে জীবনকে মুক্ত করা তার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত।
জীবনকে মুক্ত করা তার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত। পূর্ব নির্ধারিত বাক্য-শৃঙ্খল যদি জীবন

শাসন করে এবং তা ব্যক্তি ও সমষ্টি, দুটোই তবে মানুষের স্বাধীন বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিরর্থক হয়ে দাড়ায়। গণতন্ত্র সেই পরিমানে তার তাৎপর্য হারায়।

অতএব যখন আমরা বলি, গণতন্ত্র প্রতিটি ব্যক্তি মানুযের চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়, তখন তার পেছনে যে ধারণাটি অনুক্ত থাকে তা হলো, স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন কর্মের। হাজার দেড় হাজার বা দু'হাজার বছর আগের প্রথা ও বিশ্বাসের কাছে মাথা মুড়িয়ে যদি ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সেই অধিকারের প্রয়োগ ঘটাতে চায়, তবে তাতে বহুমতের সমর্থন মিলতে পারে হয়তবা, কিন্তু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিশ্চিতভাবে বিপর্যস্ত হয়। একইভাবে প্রতিটি মানুষের অধিকার যেখানে স্বীকৃতি পায়, সেখানে কোন গোষ্ঠীতান্ত্রিক জবরদস্তির কোন ভূমিকা থাকার কথা নয়। এই কারণে আজকের জার্মানিতে যখন নয়া নাৎসিবাদী রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তখন তাতে দল গঠন ও মত প্রকাশের অধিকারের ওপর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ খর্ব করা হয়েছে, এ কথা বলা আদৌ যথার্থ হবে না, বরং গণতান্ত্রিক মূল্যেবোধের প্রতি আনুগত্যই এতে প্রতিফলিত হয়। নাৎসিবাদী সংগঠন সব মানুষের সমান মানবিক অধিকার স্বীকার করেনা। তাই গণতান্ত্রিক প্রত্যয়ের সঙ্গে কোন ভাবেই তাকে মেলান যায় না। ভারতে বি জে পি বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকলাপকেও। কারন, বিশেষ সম্প্রদায়ের অধিকার তাদের কাছে অধিকতর মূল্যবান এবং যুক্তিসিদ্ধ চিন্তার চেয়ে অলৌকিকে বিশ্বাসের ওপরই তাদের অধিকতর নির্ভরতা। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন যদি তাদের পেছনে থাকে, তাহলেও তাদের কাণ্ড-কারখানা গণতান্ত্রিক হয় না। বস্তুগত চিন্তা দিয়ে পার্থিব সমস্যার মুখোমুখি হবে প্রতিটি নাগরিক, এইটিই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত। স্বপ্নাদিষ্ট বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বিশ্বাস কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থার সঙ্গে কোন ক্রমেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

যেকোন মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা যদি থাকে, তবে কেউ কেউ বলতে পারেন, মুক্তচিন্তার বিরোধিতার অধিকারও গণতন্ত্রে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। আসলে গণতান্ত্রিক প্রত্যয়ের সঙ্গে গণতান্ত্রিক আচরণের এখানে একটা স্ববিরোধ দেখা দেয়। প্রত্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে মত প্রকাশের অবাধ অধিকারের ওপর একটা পর্যায়ে সীমা বেধে দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ও মানবাধিকার আন্দোলনের আপসহীন যোদ্ধা নোআম চোমস্কি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আপত্তিকর মত প্রকাশের জন্য কাউকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী যদি প্রকাশ্যে একই মতাবলম্বী আর সবাইকে উত্তেজিত করতে থাকে, তাতে তাকে প্রতিহত করতে চাইলে তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে খণ্ডন করে না। তাকে প্রতিরোধের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলেই গণতন্ত্রের শত্রুরা ফাঁক-ফোকর গলে ঢুকে পড়ে গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই মূল্যবোধকে খন্ডন করে না। তাকে প্রতিরোধের সুষ্ঠ ব্যবস্থা থাকলেই গণতন্ত্র বরং সুরক্ষিত হয়। তা নাহলে গণতন্ত্রের শত্রুরা ফাঁক-ফোকর গলে ঢুকে পড়ে গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যখন আমরা

বিজয় ছিনিয়ে নেই. তখন এসবই মনে হয়েছিল চিরকালের জন্য মীমাংসিত বিজয়। কারণ লড়াইটা শুধুই আমাদের ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ছিল না, ছিল স্বৈরাচারী সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ছিল তারই হাতিয়ার পশ্চাৎমুখী ধ্যানধারণা সব নির্মূল করে জাতীয় চেতনায় সাম্য ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে। কিন্তু আজ দেখি, যা আমরা ভেবেছিলাম স্বত:সিদ্ধ, তা ছিল আমাদের ইচ্ছা পূরণের অতিসরলীকৃত স্বপ্নকল্পনা। বস্তুগত অবস্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশত প্রায় কিছুই অর্জিত হয় না। প্রথা আর অন্ধ বিশ্বাসের শাসন আমাদের জীবনকে অষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। অভ্যাসের দাসত্ব আর দাসত্বের অভ্যাস সহজে মরে না। চিন্তার মুক্তি মানুষী অস্তিত্বে মর্যাদার সংযোগ ঘটায়, কিন্তু দায়িত্বশূন্যতার নিশ্চিন্ত সুখ তা কেড়ে নেয়। সেই সুখ ছাড়ার জন্য আমরা এখনও প্রস্তুত নই। রাজিও নই। মুক্ত চিন্তা ও বিজ্ঞান-মনস্কতাকে আমরা শুধু অশ্রদ্ধাই করি না, ভয়ও পাই। কোন দান্তে, জোন-অফ-আর্ক, ব্রুনো বা গ্যালিলিও-র এখানে ঠাঁই নেই। বিদ্বৎসমাজের বিরাট অংশের কাছে তাদের মত মানুষেরা, গ্যালিলিও যেমন বলছিলেন, উপহাস আর ব্যঙ্গ আক্রমণের বস্তু। অথচ সমাজকে টেনে তুলে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাদের আর্দশ ও চিন্তা-ভাবনাই। আমাদের বোধ হয় আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

[*অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*]



এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সরকার হন্যে হয়ে বিদেশী পুঁজি খুঁজছে, কিন্তু বিদেশী পুঁজি আসার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যাহৃত হচ্ছে। কারণ এই যে, বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি আসতে হলে একটি বড় ভোক্তা শ্রেণী প্রয়োজন। কিন্তু সেই ভোক্তা শ্রেণী কোথায়? যদি হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়, কৃষক যদি তার উৎপাদিত ফসলের দাম না পায়, কৃষি-জনসংখ্যার শতকরা ষাট ভাগ যদি ভূমিহীন হয় এবং যদি সামান্য কিছু লোকের হাতে দেশের বিরাট পুঞ্জিভূত সম্পদ হয় তা হলে ভোক্তা কোথা থেকে আসবে? কতিপয় সম্পদশালীর ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করার ক্ষমতা সীমিত। তাই এই বৈষম্যমূলক সমাজে খুব কম পুঁজির মালিকই পুঁজি-বিনিয়োগ করতে সাহসী হবেন।

চলতি আর্থিক বছরে চীনে ৭২ বিলিয়ন ডলার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে। চীনের মতো একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে যেখানে এখনও অধিকাংশ উৎপাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত, সেখানে কেনো এই বিপুল পরিমাণের বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ হয়? এর কারণ চীনের চার দশকের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পদকে জনগণের মধ্যে বণ্টন করে ছড়িয়ে দিয়ে একটা বিরাট ভোক্তাশ্রেণী সৃষ্টি করেছে। এই ভোক্তাশ্রেণী এবং সেখানে যে বিস্তৃত অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে তার আকর্ষণেই বিদেশী পুঁজি যাচ্ছে। বাংলাদেশ এত চেষ্টা করেও যে চলতি অর্থবছরে ১০০ মিলিয়ন ডলার বিদেশী পুঁজি আহরণ করতে পারে নি, তার কারণ নিহিত রয়েছে বাঙালি জনগণের নিঃস্বকরণের মধ্যে, লুম্পেন প্রলেতারীয়করণের মধ্যে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দেশের আর্থ-সামাজিক অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হলে জনগণের তথা সাধারণ লোকের শ্রীবৃদ্ধি আনা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির তথাকথিত চুঁইয়ে পড়া অর্থনীতির মাধ্যমে স্বয়ম্ভর অর্থনীতিতে পৌছানো আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতকে ইউরোপে যে ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলি সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, মনে রাখা প্রয়োজন, তার পুঁজি এসেছিল মুখ্যত ঔপনিবেশিক শোষণের মাধ্যমে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি পুঁজি পাবে কোথা থেকে? সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী দেশ যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঋণগ্রস্ত দেশ। ইউরোপ ও জাপানের অর্থনীতিতে চলছে প্রচণ্ড মন্দা। তাই এই মুহূর্তে আমাদের যা করণীয় তা হল জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতা ও শ্রমকে সংগঠিত ও তাদের উদ্যোগকে সমবায়ের পথে পরিচালিত করে তাদেরই বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা দান করা। বাংলাদেশের প্রত্যেকটির ব্যক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার তাৎপর্য বা অর্থবহতা।

[*অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।*]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

নিশীথকুমার পাল

আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল প্রভাব আজ আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, উন্নত দেশগুলি যে পরিমাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান ভোগ করছে, আমাদের মতো অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের মানুষ তার সুফলের আশ্বাস পাচ্ছে সে তুলনায় অনেক কম। বলা চলে, আজকের পৃথিবীতে যে দেশ যত বেশি পরিমাণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানকে কাজে লাগাতে পেরেছে সে দেশ তত বেশি সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৈরি করতে হলে বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিজ্ঞানচর্চা আসলে আমাদের সংস্কৃতিচর্চারই আর একটি দিক। কেন না জীবনচর্চার অপর নামই হচ্ছে সংস্কৃতিচর্চা। আর বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আজকের জীবন অকল্পণীয়। তাই বিজ্ঞানশিক্ষার উপর আমাদের জোর দিতে হবে। এজন্যে স্কুলস্তরে পাঠ্যসূচির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিজ্ঞানকে স্থান দিতে হবে। স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলিকে উন্নতমানে নিয়ে আসতে হবে। উপযুক্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আবিষ্কার ও উদ্ভাবনায় মনোযোগী করে তুলবার জন্যে ছাত্রছাত্রীদেরকে সবরকম সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী মন সৃষ্টিতে বিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এভাবেই সমাজের পটভূমি তৈরি হবে।

এ কথা সত্য যে, যথাযথ বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানের উপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মানের গবেষণাগারের অস্তিত্ব আমাদের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষা-ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার পেছনে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অভিশাপ অনেকাংশ কাজ করেছে। প্রায় দুশ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর দুযুগের পাকিস্তানি আমলে জাতীয় স্বার্থকে সামনে এনে সত্যিকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের দুর্বলতার বিষয় বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশন ও অন্যান্য দায়িত্বশীল সংস্থা উল্লেখ করেছেন। প্রধান

৭ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৪

প্রধান দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা, পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব এবং উপযুক্ত পাঠ্যবই, শিক্ষক-নির্দেশিকা ও শিক্ষাক্রম সহায়ক উপকরণের অভাব। শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুতর সমস্যা। এই শিক্ষাপদ্ধতি মূলত মুখস্থবিদ্যানির্ভর এবং প্রকৃতিগতভাবে বিজ্ঞানের পদ্ধতির বিরোধী।

তবে অতি সামান্য বা সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যথেষ্ট ভালো বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষক যদি উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন হন এবং হাতের কাছে পাওয়া উপকরণের সাহায্যে উদ্ভাবনে ইচ্ছুক হন, তা হলে আমাদের চারপাশে লভ্য স্বল্পমূল্যের উপকরণ দিয়েই বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব ও ধারণা সার্থকভাবে শিক্ষাদান করা যায়। জরুরি হল বিজ্ঞানের মূলনীতি ও অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্বদান, অসংলগ্ন তথ্য মুখস্থ করার পরিবর্তে ধারণার উপলব্ধি ও প্রয়োগের উপর প্রাধান্য আরোপ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দক্ষতা, বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করা এবং প্রকৃতির অনুসন্ধান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা গড়ে তোলা। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানশিক্ষায় এই উপাদানগুলির এখনো পর্যন্ত অভাব রয়েছে।

প্রযুক্তিশিক্ষার বেলাতেও এ কথা সত্য। আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল চাকুরির প্রবেশপথের টিকেট সংগ্রহ করা। সেজন্যে সাধারণত হাতেকলমে কাজ ও উৎপাদনমূলক দক্ষতা গড়ে তোলার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করা হয়। এর ফলে আমাদের অর্থনীতিতে একদিকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত যুবকের বেকারত্ব এবং অন্যদিকে কৃষি, শিল্প ও সেবামূলক ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির প্রকট অভাব— এই বিপরীতমুখী সংকট সৃষ্টি হয়েছে। দেশের প্রযুক্তিগত শিক্ষাও হয়েছে ভারসাম্যহীন। পরিকল্পনাবিদরা বলছেন যে, আমাদের বিরাট জনশক্তির উন্নয়ন ছাড়া এ দেশের উন্নতি সম্ভবপর নয়। সেজন্য জাতীয় পরিকল্পনায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উপর উচ্চ-অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই কর্মসূচিগুলি একই সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া চাই এমন সুবিন্যস্ত শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে যা যান্ত্রিক মুখস্থবিদ্যা বর্জন করবে এবং অনুসন্ধানের মনোভাব সৃষ্টি করবে, প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন এবং উৎপাদনের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতিমূলক ও কর্মকালীন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ তাই অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকর্মসূচির সংযোগ বিশেষ অগ্রাধিকার দাবি করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে, জ্ঞান ও চেতনা ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত করতে হবে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে। এজন্যে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হল সমগ্র মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর জন্যে বিজ্ঞানকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু করা। যেসব বিদ্যালয়ে হয় নি, সেগুলিতে জরুরি ভিত্তিতে এই সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা এখনো নতুন ধারার বিজ্ঞানশিক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নি, তাঁদের এই

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। ক্রমপরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি ক্রমাগত সংস্কার এবং আধুনিকায়নের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিককালে বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভব ঘটছে। এসব নতুন জ্ঞানের অনেক কিছুই আজ উন্নত দেশগুলিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে স্থান পেতে আরম্ভ করেছে। তবে নতুন বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করতে গিয়ে শিক্ষাক্রম যাতে শিক্ষার্থীদের সাধ্যের বাইরে অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত না হয়ে ওঠে সেজন্যে তা থেকে পুরোনো বিষয় বাদ দেয়া জরুরি। এ কাজ অবশ্য বেশ কঠিন। এর একটি সমাধান অনেকক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের তথ্যের পরিবর্তে ধারণা, মূলনীতি ও পদ্ধতিগত দক্ষতার উপর জোর দেয়া হচ্ছে এবং শিক্ষাদানের সময় এসব ধারণা মূলনীতি ও পদ্ধতিগত দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে হাতেকলমে কাজের উপর।

এখন প্রশ্ন হল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের কী ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা সামনে রেখে বাংলাদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার লক্ষ্যসমূহ হবে : ঘটনা ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে কৌতুহল ও আগ্রহ সঞ্চার, প্রকৃতি ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণের দক্ষতা গড়ে তোলা, যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণমূলক চিন্তার ক্ষমতা অর্জন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা সমাধান, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজের ও সমাজের অন্যদের জীবন মানের উন্নয়নে সহায়তা এবং এমন বৃত্তিমূলক কুশলতা অর্জন যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে কোনো উৎপাদনমূলক জীবিকা অবলম্বন করতে পারে।

দীর্ঘকালের অবহেলার ফলে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিশাল ও গভীর দৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব কাটাতে হলে দীর্ঘদিন ব্যাপী সুবিন্যস্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এজন্যে প্রয়োজন দেশের পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার জের রাতারাতি বদলে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক রূপান্তরের প্রভাব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অগ্রগতি এবং জাতীয় উন্নয়নের জরুরি প্রয়োজন---- এসবই আজ বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার দ্রুত উন্নয়নে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

[*অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*]

শতাব্দীর ক্রান্তিকালে বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আবদুল্লাহ্ আল মুতী

সমাপ্ত-প্রায় বিশ শতক নিঃসন্দেহে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক বিপুল রূপান্তরের শতাব্দী বলে গণ্য হবে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দেখতে দেখতে তিনগুণের উপর বেড়েছে; মোটামুটি সর্বজনীন গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ নাগরিক জীবনের সুযোগ লাভ করেছে; কৃষি উৎপাদন শুধু যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখেছে; তা নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের কৌশল আজ আয়ত্ত; উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থার কল্যাণে মানুষের গড়পড়তা আয়ু এই এক শতকের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে; নানা ভোগ্যপণ্যের উদ্ভাবনে ও উৎপাদনে, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি ব্যবহারে, পরিবহন, যোগাযোগ ও বিনোদনের পদ্ধতিতে যে বিপ্লব ঘটেছে তা আজ অতি স্পষ্ট। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে এমন বিপুল পরিবর্তন ইতিহাসে আর কখনও হয়নি।

এ সবই যে ঘটেছে এক দীর্ঘস্থায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিপ্লবের কল্যাণে সে বিষয়ে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন বলে মনে হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমকালীন সাফল্যের একটি নজির এই যে, অতি বড় বিজ্ঞানবিরোধী রক্ষণশীল ব্যক্তিও আজ আর সরাসরি বিজ্ঞানের বিরোধিতা করেন না এবং এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সভ্যতার নানা অবদান ব্যবহারেও পরাঙমুখ হন না। কিন্তু মুখে বিজ্ঞানের প্রতি সমর্থন জানানো বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলাফল ভোগ করা আর সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করা, আত্মস্থ করা, তার চর্চায় আত্মনিয়োগ করা এবং সে চর্চার ফলাফলকে সমগ্র জনসমাজে বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত করা এক কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে মনে হয়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূলত শুধু প্রথমোক্ত ব্যাপারটিই ঘটেছে এবং তারই ফলে আমাদের ভাগ্যে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' অভিধাটি জুটেছে এবং কপালে প্রায় স্থায়ীভাবে এঁটে বসার উপক্রম করছে।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত 'উন্নত' দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে চিরকাল এমন দুর্গত ছিল, তা নয়। ইতিহাসবেত্তারা বলেন, অষ্টাদশ শতকে ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত ইয়োরোপ ও ভারত উপমহাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার

৭ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৯৪

মানে এমন কিছু গুরুতর পার্থক্য ছিল না। বরং ইতিহাসের নানা পর্যায়ে এ দেশে গণিত, রসায়ন, ভেষজ, কারুশিল্প প্রভৃতির চর্চায় উচ্চমানের কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাজমহল প্রভৃতি প্রাচীন সৌধ শুধু যে এ দেশের মানুষের বিস্ময়কর শিল্পচেতনার পরিচয় দেয় তা নয়, সেকালের অত্যন্ত অগ্রসর প্রযুক্তিগত কুশলতারও পরিচয় বহন করে। প্রাচীন ও নব্যযুগের পর্যটক ও ইতিহাসবেত্তাদের বিবরণ থেকে বস্ত্রশিল্প, রেশমশিল্প, শর্করাশিল্প, লবণশিল্প ও নৌ-যান নির্মাণ শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার এবং দীর্ঘকাল ধরে সে শাসনের দমনমূলক নীতি নিঃসন্দেহে এ দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিপ্লবের অবদান কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক-সামাজিক অগ্রগতির পথে যেমন দ্রুত গতিতে এগিয়েছে, তুলনামূলকভাবে আমরা তেমনি পিছিয়ে পড়েছি। বিশ শতকের শুরুতেও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির গড় জীবন যাত্রার মানের সূচক এ দেশের মানুষের চেয়ে বেশি ছিল না; অথচ আজ এই পার্থক্য বাড়তে বাড়তে প্রায় একশ গুণে পৌঁছেছে। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের একটি প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানকে কাজে লাগিয়ে এ দেশের মানুষকে দুঃখ-দারিদ্র থেকে মুক্তি দেয়া এবং পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে আমাদের গড় জীবনমানের পার্থক্য ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনে আমরা মোটেই সফল হতে পারিনি, বরং আমাদের দারিদ্রের গভীরতা যে ক্রমেই অতলস্পর্শী হয়ে উঠছে এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলির সঙ্গে এ দেশের জনগণের জীবনমানের পার্থক্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে এ সত্য আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

সত্তরের দশকের শুরুতে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশ গুটিকয়েক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং মাত্র কয়েকশ গবেষকবিজ্ঞানী পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত, মূল গবেষণাগারের ক্ষুদ্রাকার আঞ্চলিক শাখা। এগুলি ছড়ানো ছিল সরকারের নানা মন্ত্রণালয় আর বিভাগের অধীনে। এ সব প্রতিষ্ঠানকে সুসংবদ্ধ করে জাতীয় গবেষণা কর্মসূচীর অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়ে দাঁড়ায় নতুন স্বাধীন দেশের একটি প্রাথমিক দায়িত্ব। এই লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সরকার একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোমধ্যে গত প্রায় দু-দশকে বেশ ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশে প্রায় পাঁচ ডজন বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একই সঙ্গে ক্রমান্বয়ে দেশে গবেষক-বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিকর্মীর সংখ্যা আজ প্রায় এক লক্ষ। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ অর্থাৎ, প্রায় পাঁচ হাজার নিয়োজিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে; বাকিরা নিয়োজিত নানা ধরনের শিক্ষকতা, প্রশাসনিক ও সেবামূলক পেশায়। ব্যান্সডক-এর একটি জরিপ থেকে জানা যায়, গবেষণায় নিয়োজিত

যে মাত্র ৫ হাজার— তাঁদের মধ্যে ১ হাজার ২ শ-র রয়েছে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী, ২ হাজার ৮ শ-র এম.এস.সি। অন্যদের সমমানের কোনো ডিগ্রী।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত সংশ্লিষ্ট তিনটি স্বায়ত্ত্বশাসিত গবেষণা পরিষদ ও ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে (আরও ৭/৮ টি বিশ্ববিদ্যালয় গত ক-বছরে চালু হয়েছে)। এই তিনটি গবেষণা পরিষদ হল (ক) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্পগবেষণা পরিষদ, (খ) বাংলাদেশ পরমাণু-শক্তি কমিশন ও (গ) বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা পরিষদ। এছাড়াও বাংলাদেশ চিকিৎসা-গবেষণা পরিষদ নামে আরও একটি পরিষদ রয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান সরাসরি সংযুক্ত নয়। গবেষণা পরিষদগুলির মূল দায়িত্ব গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও সমন্বয়, তবে প্রায়শ এগুলি সরাসরি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও সেবামূলক ব্যবস্থার দায়িত্বে নিয়োজিত।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মূলত উচ্চপর্যায়ের জনশক্তি তৈরি হয় এবং মৌলিক গবেষণা পরিচালিত হয়। আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ধীরগতিতে হলেও ক্রমাগত বাড়ছে। দেশের ৬টি সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ প্রায় ষাট হাজার এবং তাদের মধ্যে মোটামুটি চল্লিশ শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে।

দেশে অবশ্য উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া প্রায় ৬শ ডিগ্রী কলেজও রয়েছে; এদের অধিকাংশই বেসরকারি। ডিগ্রীস্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে প্রায় পৌনে ২শ কলেজে— কয়েকটিতে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত। প্রকৌশলক্ষেত্রে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষিক্ষেত্রে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রয়েছে ৪টি ডিগ্রী পর্যায়ের ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, একটি স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানসহ ৯টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, একটি কৃষি কলেজ। সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে প্রতি বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেয় প্রায় দুহাজার। অধীত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতি বছর যেসব বিষয়ে একশ'র বেশি ডিগ্রী দেয়া হয়, সে বিষয়গুলি হল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, সংখ্যাগণিত, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, বিদ্যুৎকৌশল ও ইলেকট্রনিক্স। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডিগ্রি দেয় বলেই যে ডিগ্রিধারীরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে পেশাগত কাজে নিয়োজিত হতে পারে তা অবশ্য নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে গবেষণা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মীসংখ্যা দীর্ঘকাল ধরে নির্দিষ্ট অঙ্কে সীমিত হয়ে থাকার ফলে এ সব ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগের সুযোগ অতি সামান্য। তার ফলে অনেক ডিগ্রিধারীকেই আজ নিজ বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে নানা পেশায় নিয়োজিত হতে হচ্ছে অথবা বেকারত্ব বরণ করে নিতে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে গবেষণা পরিচালনা করা হয় তা মূলত মৌলিক গবেষণা। এ সব গবেষণার অগ্রাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই নির্ধারণ করে; বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কিছুটা সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে। মঞ্জুরী

কমিশন প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডজনখানেক গবেষণা প্রকল্পের জন্য অনুদান দেয় মাত্র লাখ দশেক টাকা। অর্থাৎ, গবেষণার জন্য সাকুল্য বরাদ্দ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্যে সরকারি বরাদ্দের মোটামুটি হাজার ভাগের এক ভাগ। এ ধরনের বরাদ্দের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চমানের গবেষণা পরিচালনা করবে বা গবেষণাকর্মী সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে— এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের গবেষণা সংস্থাগুলি স্বভাবতই দেশের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক গবেষণায় নিয়োজিত। এক্ষেত্রে সত্তরের দশকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত জয়দেবপুরের বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট মাত্র দু-দশকের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা বেশ ক'টি উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছেন এবং এগুলি এ দেশের কৃষকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে এমনি একটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট। নানা ধরনের খাদ্যশস্য, সবজি, ফল প্রভৃতি সম্পর্কে এখানে মূল্যবান গবেষণাকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ঈশ্বরদিতে ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও-এ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রামে বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, শ্রীমঙ্গলে চা গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটও নানা ধরনের প্রয়োগমুখি গবেষণা চলছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ দেশজ নানা উপাদান ব্যবহার করে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী প্রায় দেড়শ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে; তার মধ্যে প্রায় একশটি প্রক্রিয়া শিল্প উদ্যোক্তাদের কাছে ইজারা দেয়া হয়েছে। ঢাকার বাইরে রাজশাহি ও চট্টগ্রামেও এই পরিষদের গবেষণাগার রয়েছে। পরিষদের জ্বালানি গবেষণা ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে বায়োগ্যাস জ্বালানি, উন্নত চুলা, সৌরচুল্লি প্রভৃতি সারা দেশে জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য জনপ্রিয় করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ ধরনের আরেকটি বহুমুখি গবেষণা পরিষদ বাংলাদেশ পরমাণু-শক্তি কমিশন। গত এক যুগে সাভারে এই কমিশনের তত্ত্বাবধানে একটি বড় আকারের পরমাণুশক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এখানে নানা বিষয়ে ইন্সটিটিউটের সঙ্গে একটি তিন মেগাওয়াট শক্তির গবেষণামূলক পারমাণবিক রিয়্যাক্টরও স্থাপন করা হয়েছে। এ সব ইন্সটিটিউটে স্বাস্থ্য, কৃষি, বিকিরণের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ, জলবিজ্ঞান, খনিজ অনুসন্ধান, ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতি বিভিন্নমুখি গবেষণা চলছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে পাবনা জেলার রূপপুরে তিনশ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎশক্তি-কেন্দ্র নির্মাণেরও উদ্যোগ আয়োজন দুদশকের বেশি সময় ধরে। বহুকাল ধরে এই শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের কথা শোনা গেলেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধা হয়ে আছে।

একটি অপেক্ষাকৃত নতুন বহুমুখি বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান হল মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা— সংক্ষেপে ইংরেজি আদ্যাক্ষর নিয়ে যাকে বলা হয় 'স্পার্সো'। মাত্র ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ থেকে গৃহীত চিত্রের মাধ্যমে কৃষি, বন, মৎস্য, আবহাওয়া, সমুদ্রসম্পদ, জলসম্পদ, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে বিজ্ঞানচর্চা চলছে তা স্বভাবতই একটি স্বল্পোন্নত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। তার মধ্যে একটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সে হল এ দেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের অনুপস্থিতি। ইংরেজ শাসনের ঔপনিবেশিক যুগেও উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে এ দেশের অগ্রণী সংস্কৃতি-নায়কগণ দেশের অগ্রগতির জন্যে বিজ্ঞানচর্চার অপরিহার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। তারই ফলে বিশ শতকের গোড়ায় বাঙালিদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞানচর্চায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বহুল পরিচিত। দুঃখের বিষয় ব্যাপক দারিদ্র, ধর্মীয় গোঁড়ামি, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রভৃতি কারণে মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ দু-চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া সেকালে মুসলমান সমাজে তেমন কেউ বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেননি। তার ফলে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হিন্দুসম্প্রদায়ের বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশ দেশত্যাগ করায় বাংলাদেশ অঞ্চলে সে সময়ে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তারপর থেকে অবশ্য পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তান যুগে এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার প্রসার খুব ধীর গতিতে হলেও ক্রমান্বয়ে এগিয়েছে।

এই ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে আজও বাংলাদেশে বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা নিম্নমানের এবং এই পরিস্থিতি এ দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বড় মাপের বাধা হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আর যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ করা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষা ও গবেষণার জন্যে স্বল্প আর্থিক বরাদ্দ, বিজ্ঞান গবেষণাগুলির ব্যবস্থাপনার দৈন্য, বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলকে শিল্পপণ্যে রূপান্তরের উপযোগী কাঠামোর অনুপস্থিতি এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগে যথোপযুক্ত প্রেষণার অভাব। এই প্রেষণা ও উপযুক্ত পরিবেশের অনুপস্থিতির কারণেই দেশের উচ্চমানের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অনেকে আজ বিদেশে কাজের সুযোগ পেলে আর দেশে ফিরতে তেমন আগ্রহ বোধ করেন না।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার পরিস্থিতি নিয়ে গত কয়েক দশকে বেশ কটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এ সব পরীক্ষা থেকে

সুপারিশ করা হয়েছে যে, দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য অনুন্নত দেশগুলিতেও মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তত এক শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা কাজে ব্যয় করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে গত দু-দশক ধরে এ খাতে বছরে ব্যয়ের পরিমাণ মোটামুটি ০.২ থেকে ০.৩ শতাংশ অর্থাৎ, জাতিসংঘ নির্ধারিত নিম্নতম হারের এক-তৃতীয়াংশেরর কম। তার ফলে অধিকাংশ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আজ মোট বাজেট বরাদ্দের ৯০-৯৫ শতাংশ বেতন-ভাতা খাতে ব্যয় করতে হয়; প্রকৃত গবেষণা ও উন্নয়ন কাজের জন্য অতি সামান্য অর্থই ব্যয় করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দের দৈন্য বিজ্ঞানচর্চায় আরও নানা আনুষঙ্গিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। ১৯৮৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সভায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলে বাংলাশের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন যে, এ খাতের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে উন্নীত করে ১.১ শতাংশ করা হবে। কিন্তু এই ঘোষণা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ কী ধরনের নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তারপর আর কিছু জানা যায়নি।

এ দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়েছে ষাটের দশকের শুরুতে, কিন্তু এখনও মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় মাত্র ৪০ শতাংশের মতো শিক্ষার্থী বিজ্ঞান নিয়ে অংশগ্রহণ করে; বাকিরা বিজ্ঞানের বদলে অন্য কোন বিষয় নেয়। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরেও অবস্থা একই ধরনের। এই দু-স্তরেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়; এতেই শিক্ষার মান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। স্কুল পর্যায়ে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয় তাতে তথ্য গলাধঃকরণের উপর যতটা জোর সে-তুলনায় বিজ্ঞানের যা মূল চারিত্র সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়মের উপলব্ধি ও তার প্রয়োগকুশলতা অর্জনের দিকে মনোযোগ অনেক কম। বিদ্যালয় পর্যায়ে তবু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কিছুটা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, কলেজ পর্যায়ের পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিক্ষাদান নামমাত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে; এই পর্যায়ে পাসের হার স্কুল পর্যায়ের চেয়েও কম। বলা বাহুল্য, কলেজ স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার নিম্নমান স্বভাবতই স্কুলস্তরের শিক্ষক সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানকে সব শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা অবশ্য এখনও সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সামনে নিয়ে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে দেশের চার হাজার অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধে বাড়াবার জন্য মাধ্যমিক বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রকল্প নামে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তাপুষ্ট একটি প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পে বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, আসবাব ও বৈজ্ঞানিক উপকরণাদি সরবরাহ ছাড়াও প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষককে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এই দীর্ঘকালীন বিজ্ঞানহীন ঐতিহ্যের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন শুধু এক পঞ্চবার্ষিক মেয়াদের প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয় নয়। সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার মানের উন্নয়নের

জন্য শিক্ষার সকল স্তরে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন, উপকরণ ও সহায়ক পুস্তকাদির ব্যবহার নিশ্চিত করা, শিক্ষকদের বিজ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের সুযোগ, উন্নতমানের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অব্যাহত উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে সকল গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় বিধানের জন্য ১৯৭৫ সালে প্রথম একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এর কাঠামো পরিবর্তিত হলেও প্রায় বরাবরই দেশের রাষ্ট্রপতি এর সভাপতি থেকেছেন এবং সদস্য হিসেবে রয়েছেন নানা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিব এবং প্রধান বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানিগণ। এই পরিষদের পক্ষ থেকে একটি জাতীয় ও প্রযুক্তি নীতি প্রণয়ন করা হয় এবং ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়। এই নীতির ঘোষিত মূল লক্ষ্য হল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থানের উন্নয়ন।

এই মূল লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় অর্থনীতির নানা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের জন্য নানামুখি পদক্ষেপ প্রস্তাব দাঁড় করানো হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনীতিতে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে যথেষ্ট আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা; আরেকটি হল এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত জনসম্পদ গড়ে তোলা এবং তাদের গবেষণা কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি ও পরিবেশ সৃষ্টি। এই নীতিতে মোট দেশজ উৎপাদনের অন্তত এক শতাংশ (অথবা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পাঁচ শতাংশ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমন সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দানের প্রস্তাব করা হয় তেমনি বিজ্ঞানকে সমগ্র জন-সমাজের সংস্কৃতি ও জীবন ধারার অঙ্গীভূত করে তোলার জন্য সারা দেশব্যাপী বিজ্ঞান চেতনা সঞ্চার কর্মসূচি এবং বিশেষভাবে তরুণসমাজের মধ্যে উদ্ভাবনমূলক কর্মকান্ড বিস্তারের কথাও বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নীতি ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে অবকাঠামো নির্মাণ ও জাতীয় সম্পদ বরাদ্দ করে এবং আরও নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু শেষবিচারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চা বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদদেরকেই করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পেশাগত বা বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগাযোগের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্মের বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনাচক্র, সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁরা বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অবশ্য-পালনীয়

দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন। এ দেশের বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে বিদেশের বিজ্ঞানীদের যোগাযোগ ও মতবিনিময়ও এ সবের মাধ্যমে ঘটতে পারে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি, বাংলাদেশ পদার্থবিদ্যা সমিতি, বাংলাদেশ রসায়ন সমিতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি অন্তত অর্ধশত বিশেষজ্ঞ সমিতি আজ এ দেশে সক্রিয় রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পত্রপত্রিকার সংখ্যা মোটামুটি একশ; অবশ্য তার মধ্যে অধিকাংশই তেমন নিয়মিত নয়। আর সারা পৃথিবীতে যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রায় এক লক্ষ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় সে হিসেবে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

সাম্প্রতিক কালে প্রায় সব দেশেই বিজ্ঞানীরা নিজেদের জন্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। তার একটা কারণ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ক্রমাগতই বেশি করে ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে এবং এই ব্যয় মেটাবার জন্যে বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। ব্যাপক জনসমাজ ও জাতীয় নীতিনির্ধারকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সঞ্চারিত না হলে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বরাদ্দ প্রায়শ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। আরেক কারণ হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অগ্রগতি আজ সমগ্র মানব সমাজকে এখন বিপুলভাবে প্রভাবিত করছে যে, এ সব গবেষণার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সমগ্র জনসমাজের সমর্থন ছাড়া শুধু বিজ্ঞানীদের পক্ষে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। পারমাণবিক গবেষণার ফলে তেজস্ক্রিয়তার বিপদ, শিল্প সভ্যতার বিস্তারের ফলে পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা, চিকিৎসা ও ওষুধ সম্পর্কীয় গবেষণায় নৈতিক জটিলতা প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সাল থেকে প্রতি বছর যে জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান সপ্তাহ ও বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দেশের প্রায় চারশ বিজ্ঞান ক্লাবের তরুণ উদ্ভাবক ও বিজ্ঞানোৎসাহীরা এতে সাগ্রহে অংশ নিয়ে থাকে। এই আয়োজনে বিজ্ঞানীসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। দেশে যে অল্প সংখ্যক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা রয়েছে তাতেও তাঁদের অংশগ্রহণ রয়েছে। কিন্তু তবুও সামগ্রিকভাবে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক যে কটি বই প্রতি বছর প্রকাশিত হয় তার সংখ্যা একেবারে হাতের আঙুলে গোণা যায়। জাতীয় গণমাধ্যমে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদসমাজের অংশগ্রহণও এখনও নিতান্ত নামমাত্র। অবশ্য এ জন্য কতটা দায়ী বিজ্ঞানীরা আর কতটা নীতিনির্ধারক মহল তা বলা শক্ত। অন্তত নানা পর্যায়ের জন্য বাংলা ভাষায় উচ্চমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত পাঠ্যবই প্রকাশ এবং রেডিও-টেলিভিশন প্রভৃতি গণমাধ্যমে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে যথাযথ গুরুত্ব দেবার ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের যে একটি প্রধান ভূমিকা পালনের অবকাশ রয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সারা পৃথিবীর ছোট-বড় প্রায় দু-শ রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশ আজ একেবারে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে। এ দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা আজ এমন গভীর যে, সে সবের দ্রুত সমাধান প্রত্যাশা করাও দুরূহ। তবে এ বিষয়ে কারও কোনো সংশয় থাকার কথা নয় যে কেবল বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগই আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে নিতান্ত প্রাথমিক কিছু পদক্ষেপ এ যাবৎ গৃহীত হয়েছে। দেশের কৃষি উৎপাদন আরও ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে; জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে হবে; জ্বালানি সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন নতুন শক্তির উৎস কাজে লাগাতে হবে; গবেষণার মাধ্যমে দেশজ সম্পদ ব্যবহারের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে শিল্পপণ্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। আধুনিক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি, মাইক্রো-ইলেকট্রনিকস্, জৈবপ্রযুক্তি, জিন প্রকৌশল প্রভৃতি উদ্ভাবন যোগাযোগ, উৎপাদন ও জীবনযাত্রার সামগ্রিক মানে বিপুল অবদানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এ সব সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার না করলে সভ্যতার নিরন্তর অগ্রযাত্রায় আমরা কেবলই পিছিয়ে পড়তে থাকব। এজন্য যেমন দেশব্যাপী উপযুক্ত জনসম্পদ সৃষ্টির ব্যাপক আয়োজন প্রয়োজন তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ বিনিয়োগও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করে জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ না করে শুধু প্রয়োজনীয় ভোগের সামগ্রী উৎপাদনে কৌশল হিসেবে দেখার একটি অসুস্থ প্রবণতা এ দেশের নীতিনির্ধারক মহলের একাংশের রয়েছে। দেশের ব্যাপক জনসমাজকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে এবং মধ্যযুগসুলভ অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি হিসেবে নিয়ে আগামী একুশ শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করা আদৌ সম্ভব নয়। বিজ্ঞানকে সমগ্র জনসমাজের চেতনায় স্থাপন করার জন্য এ দেশের শিক্ষা ও গবেষণা কাঠামোর ব্যাপক ও মৌলিক রূপান্তর প্রয়োজন হবে। আর কেবল তার মাধ্যমেই এ যাবৎ দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে প্রাথমিক কাঠামো নির্মিত হয়েছে তার ব্যাপক বিকাশ ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমগ্র জনসমাজের আর্থসামাজিক রূপান্তরের সমস্যার সমাধান ঘটতে পারে।

[ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ-এর ৩৮তম সম্মেলনে স্মারক বক্তৃতা]

[লেখক : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞান লেখক।]

গোপালচন্দ্র ও একখানি পত্র

এম.এ. আজিজ মিয়া

শতবর্ষ পূর্বে ১৮৯৫ সালের ১ আগস্ট প্রখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদের দেশে— শরীয়তপুর জেলার লোনসিং গ্রামে। পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে শত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি লেখাপড়া করেছেন এবং প্রতিটি ক্লাশের পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯১৩ সালে লোনসিং হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন এবং তৎকালীন ফরিদপুর জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পান। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেধা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক কারণে কলেজে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। ফিরে এসে পণ্ডিতসার হাইস্কুল এবং পরে লোনসিং হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। পূজা-অর্চনা ও সেবামূলক কাজ করেও তিনি প্রকৃতির গবেষণাগারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বিচিত্র রূপ ও তাদের প্রকৃতি নিয়ে ভেবেছেন। স্থানীয় ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল, খানা-খন্দ ও খাল-বিল ঘুরে-ঘুরে দেখেছেন এবং পর্যবেক্ষণজাত ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। গ্রামের পাঁচীরমার ভিটায় দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে তিনি যে ফলাফল লাভ করেন তার বিবরণ দিয়ে 'গাছ-পালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা' শীর্ষক রচনাটি ১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হলে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁকে বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা-সহকারী হিসেবে নিয়োগ করেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানীর জন্যে আচার্য বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কীটপতঙ্গ ও গাছপালার প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে দেন। কীটপতঙ্গ নিয়ে গোপালচন্দ্র বহুদিন গবেষণা করেছেন এবং বহু মূল্যবান গবেষণাপত্র তৈরি করেছেন যা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের 'ট্রানজানকসন' ও বোম্বের 'ন্যাচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা বিজ্ঞানীমহলে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করে। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক লেখার জন্যে তিনি দেশজোড়া সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এজন্যে রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসসি ডিগ্রি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা অনেকেই করেছেন। কিন্তু স্বাভাবিক বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের ন্যায় অহোরাত্র বিজ্ঞান নিয়ে ভেবেছেন তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়, তাছাড়া চিঠিপত্রেও গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান-ভাবনার ছাপ দেখা যায়। গোপালচন্দ্রের মনমানস ও সাধনা

৭ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৪

সম্পর্কে কিছুটা হলেও পরিচয় পাবেন বন্ধু পরিমল গোস্বামীকে লেখা একখানা পত্রে, হুবহু নিম্নে তা তুলে ধরা হল—

বসু বিজ্ঞান মন্দির

১৪/১১/৬১

প্রীতিভাজনেষু,

পরিমল বাবু, পিঁপড়ে নিয়ে অনেকদিন কাজ করছিলাম। একদিন বোস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডিএন বসু আমাকে বললেন— আমেরিকায় একটি নতুন জিনিস দেখা যাচ্ছে। পেনিসিলিন সেপ্টোমাইসিস কারখানায় পরিত্যক্ত ফেলে দেওয়া অংশ মুরগি ও শুকরেরা খেয়ে ওজনে ভারী হয়ে উঠছে। এই পরীক্ষা পিঁপড়ের উপর চালিয়ে দেখুন না কেন, ও রকম কিছু হয় কিনা। তদনুসারে অনেক দিনের চেষ্টায় পিঁপড়েদের পেনিসিলিন খাইয়ে দেখা গেল তাঁদের ডিম থেকে যে সব কর্মী পিঁপড়ে জন্মাচ্ছে তাদের আকৃতি সাধারণ কর্মীদের চেয়ে ছোট হচ্ছে। শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ছোট। অন্য পিঁপড়ে জন্মাচ্ছে তাদের ঠিক বিপরীত। ঐ একই সময়ে পরিবেশ অনুযায়ী দৈহিক রঙের বদল হয় কিনা দেখবার জন্য বিভিন্ন কাঁচের ট্যাঙ্কে অনেকগুলি ব্যাঙাচি (রানা টাইগ্রিনা) রেখেছিলাম। একটি জলাধারে পেনিসিলিন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পিঁপড়ের উপর পরীক্ষায় মনমতো ফল না পাওয়াতেই ব্যাঙাচির উপর পরীক্ষার বাসনা হয়। দিন দশেক পর দেখা গেল যে ট্যাঙ্কে পেনিসিলিন দেওয়া ছিল তার ভিতরকার ব্যাঙাচিরা একই রকম আছে, হ্রাসবৃদ্ধি কিছুই ঘটে নি। অথচ অন্যান্য ট্যাঙ্কের ব্যাঙাচিরা অধিকাংশই ব্যাঙাচিত্ব ঘুচিয়ে ব্যাঙ হয়ে গেছে এবং জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। তাদের অবশ্য বাইরে বেরিয়ে যাবার উপায় ছিল না। স্বভাবতঃই কৌতূহল বেড়ে গেল। ব্যাপার কী? অপেক্ষা করে বসে রইলাম। আরও ১৫দিন কেটে গেল পেনিসিলিনের ব্যাঙাচির সেই একই অবস্থা, কোনো পরিবর্তন নেই। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝবার জন্য আবার কয়েক ব্যাচ ব্যাঙাচি দিয়ে পরীক্ষা শুরু করি। এবারেও ঐ একই ফল হল। অবশ্য পেনিসিলিনের ব্যাঙাচির কয়েকটা ব্যাঙ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। কন্ট্রোলের (পেনিসিলিনবিহীন ট্যাঙ্কের) ব্যাঙাচি কিন্তু ১০ থেকে ২০ দিনের মধ্যেই ব্যাঙ হয়ে গেল। এর মধ্যে উভয় ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যাঙাচি মারাও পড়েছিল। পেনিসিলিনের পরিমাণ ঠিক করতে অনেক পরীক্ষা করতে হয়েছিল। অনেক বিদেশী বিজ্ঞানীই পরীক্ষাটি দেখতে এসেছেন। একজন বললেন— ভিটামিন বি-১২ দিয়ে দেখুন তো কি হয়। তদানুযায়ী ৮ মাস ব্যাঙাচি অবস্থাতেই আছে এরকম কতগুলি ব্যাঙাচির উপর ভিটামিন বি-১২ প্রয়োগ করা হলো এবং তার ফলে (১২/১৩ দিন পরে) দেখা গেল ২/৩টি বাদে সবাই ব্যাঙ হয়ে গেছে। তারপর থেকে ৮ মাস ব্যাঙাচি জীবন যাপন করেছে এমন কতগুলির উপর থাইরক্সিন প্রয়োগ করা হল। দেখা গেল অধিকাংশ ব্যাঙাচিই ৪/৫ দিনের মধ্যে ব্যাঙ হয়ে লাফাচ্ছে। এসব পরীক্ষা চলবার সময় ডক্টর

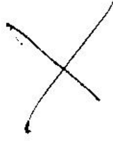
চেন (পেনিসিলিন ম্যান) একবার ওখানে এসেছিলেন। তিনি সবকিছু দেখে বললেন, এই ব্যাপারটা তাঁর দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। কারণ পেনিসিলিন, স্টেপটোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়াটিকের ক্রিয়া হয় খুব সূক্ষ্ম জীবাণুর উপর। স্থুল প্রাণীর উপর এর ক্রিয়া কীভাবে হয় বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা আপনারা এর ইনটেস্টিনাল ফ্লোরা নিয়ে পরীক্ষা করুন। হয়তো কোন ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন বাদে এর নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা আরম্ভ হল। সাদা জলের ব্যাঙাচি ও পেনিসিলিন জলের ব্যাঙাচি উভয়েরই অন্ত্রকোট বের করা হল। ভিতরকার ফ্লোরা (অর্থাৎ মধ্যকার প্রাপ্ত বস্তু) কালচার করে পাওয়া গেল সাদা জলের ব্যাঙাচির অন্ত্রে অন্তত দু-রকমের কক্কাস জাতীয় জীবাণু আছে। এরা ভিটামিন বি-১২ উৎপাদন করে। পেনিসিলিনের জলের ব্যাঙাচির অন্ত্রের মধ্যে সে রকমের কোন জীবাণু পাওয়া গেল না। স্বভাবতই এ থেকে মনে হয় ভিটামিন বি-১২, থাইরক্সিন উৎপাদনের পরোক্ষ কারণ। এই নিয়ে আবার পরীক্ষা করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য। প্রসঙ্গত বলা দরকার পেনিসিলিনের মত সেপ্টোমাইসিন দিয়ে পরীক্ষা করে একই ফল পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার দেখা গেছে এই যে, সম্পূর্ণ অনাহারেও ব্যাঙাচিদের রূপান্তর গ্রহণের (অর্থাৎ ব্যাঙ হওয়ার) কাল বিলম্বিত হয়। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করা গেছে—পেনিসিলিনের মাত্রার তারতম্যে নানা রকম দৈহিক বিকৃতি ঘটে। মাঝে মাঝে থাইরক্সিন প্রয়োগে তিন খানা মাত্র পা বেরিয়েছে চতুর্থ পা আদৌ বেরোয়নি। থাইরক্সিনের ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এ জিনিসটার ক্ষরণ বা সিক্রেশান না হলে অথবা অভাব ঘটলে মোটেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থ বৃদ্ধি ঘটে না, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক হয় না, ডিফরেনসিয়েশান ঘটে না। এটা বহু পূর্ব থেকেই জানা আছে। থাইরক্সিন একটি হরমোন এবং বি-১২ হচ্ছে ভিটামিন। এ দুটি রাসায়নিকভাবে পৃথক, অথচ ব্যাঙাচির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপায়ণে এদের একই ক্রিয়া, শুধু সময়ের কিছু ব্যবধান মাত্র। এর অর্থ কি? ইনটেস্টিনাল ফ্লোরার আরও পরীক্ষা থেকে এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছানো যেতে পারে। এখানে আর একটা কথা বলা দরকার। থাইরক্সিনের সাহায্যে অকালে অর্থাৎ স্বাভাবিক ডিফারেনসিয়েশান বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক চেহারা পাওয়ার আগে থাইরক্সিন প্রয়োগে রূপান্তর ঘটানো যায়। কিন্তু ব্যাঙাচির পা বেরোলেও ২/৩ দিনের বেশি বাঁচে না। কিন্তু ব্যাঙাচিদের অপরিণত অবস্থায় অর্থাৎ ডিম থেকে বের হবার ৫/৭ দিন পরে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাদের চার পা বেরিয়েছে সত্য, কিন্তু লেজ লোপ পায় নি বরং চার পা ও লেজ দিয়েই তারা জলের নিচে জল টিক-টিকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার তাদের আর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্তন ঘটলেও অন্ত্রের কোন পরিবর্তন ঘটে না। ব্যাঙাচি অবস্থায় অন্ত্র যেমন ছিল তেমনি থাকে। এমন অবস্থায় কেজিন ও ভিটামিন বি-১২ খাইয়ে একমাস পর্যন্ত লেজওয়ালা ব্যাঙ (অর্থাৎ লেজ আছে অথচ পুরো ব্যাঙ) হিসাবেই জীবিত রাখা সম্ভব হয়েছে।

এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন আছে, সেটি এই যে, অভিব্যক্তির ফলে যেসব পরিবর্তন স্থায়ীভাবে আত্মপ্রকাশ করে, এক প্রাণী ধীরে ধীরে অন্য প্রাণীর আকৃতি নেয়, এক্ষেত্রে সেরূপ কিছু হয় কিনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঠিক অনুরূপ একটি জীবের কথা বলা যায়।

মেক্সিকোতে আকসোলটল নামে এরকম জলচর প্রাণী দেখা যায় (একটি হ্রদের জলে)। বহুদিন যাবৎ জীববিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এটি বিশেষ ধরনের প্রাণী। কিন্তু একবার সামান্য থাইরক্সিন প্রয়োগে দিন কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল সেটি স্যালামান্ডারে পরিবর্তিত হয়েছে। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে— এরা 'লারভা' বা শূক অবস্থাতেই বংশ বৃদ্ধি করে আসছে। ইতি—

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

[*সহকারী অধ্যাপক, শরীয়তপুর সরকারি কলেজ, শরীয়তপুর।*]



কলেজ লাইব্রেরি সংগঠন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

এম হারুন-অর-রশীদ

গ্রন্থ, পাঠক ও গ্রন্থাগার শব্দ তিনটি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির পূর্ণতা সম্ভবপর নয়। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী। মানব-সমাজ কর্তৃক উদ্ভূত চিন্তা ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ তথ্য গ্রন্থের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়। আর এই তথ্যকে ব্যবহার উপযোগী করে পাঠকশ্রেণীর নিকট সর্বজনীন ও সমাজিকীকরণ করা হয় গ্রন্থাগার সেবার মাধ্যমে। তাই পিয়ার্স বাটলার যথার্থই বলেছেন, "গ্রন্থ হলো মানবজাতির স্মৃতি সংরক্ষণের বস্তুগত প্রক্রিয়া এবং গ্রন্থাগার হলো জীবিত সচেতন ব্যক্তিদের চেতনা বিকাশে তাদের নিকট পরিবেশনের জন্য সামাজিক উপাদান বিশেষ।" গ্রন্থাগার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আজ দেশে দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগার, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গবেষণা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের এই উন্নয়নের ক্রমবিকাশ বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে এতদূর পৌঁছেছে। শিক্ষা পূর্ব (Pre-literate) প্রাকঐতিহাসিক যুগে সমাজের সচেতন ব্যক্তির চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ওই সমাজের ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হতো, যা পরবর্তী প্রজন্মের নিকট হস্তান্তর করা হত। কিন্তু মানব ধীশক্তি তো বিরামহীন ধারক নয়। ফলস্বরূপ সমাজের প্রয়োজনেই লিখন, মুদ্রণযন্ত্র ও কাগজের আবিষ্কার— চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সৃষ্টি করল। বার্টলারের মতে, "At every point artificial memory which was invented in the graphic system has rendered possible an enlargement of the commulative process far beyond what men otherwise are able to achieve." এভাবেই গ্রন্থাগারের ধারণা সৃষ্টি হলো এবং সময়ের বিবর্তনে গ্রন্থাগারের বিকাশও আরম্ভ হলো। বর্তমানে উন্নত কী অনুন্নত প্রতিটি দেশে গ্রন্থাগার জাতীয় জীবনে একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত; আজ আর গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা ও কার্যক্রম 'collection of books' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবনের ফলে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে গ্রন্থাগার কার্যক্রমে 'ডকুমেন্টেশন' ও 'ইনফরমেশন' ধারণার মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। তাই গ্রন্থাগার হলো, সকল শ্রবণীয় ও দর্শনীয় শিক্ষণ

৭ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৪

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা

খান সারওয়ার মুরশিদ

প্রীতিভাজন সভাপতি, বিদগ্ধ প্রবন্ধকারদ্বয়, সমবেত সুধীজন : আপনারা আমার প্রীতি সম্ভাষণ নিন। রবীন্দ্রনাথের ১৩৪তম জন্মবার্ষিকীতে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 'শিক্ষাবার্তা' কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ পত্রিকাটি নিপুণভাবে সম্পাদিত এবং নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, এবং একই সঙ্গে এর সামাজিক এবং শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে, এ বড় আনন্দের কথা। এ সুযোগে আমি সম্পাদিকা আফরোজা নাহার রাশেদাকে এবং তাঁর সহকর্মীদের অভিনন্দন জানাই।

'শিক্ষাবার্তা'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ আলোচনার বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবেই 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা'. এ বিষয়ে আমার অকিঞ্চিতকর বক্তব্য পেশ করার আগে আমি রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সৃজনশীলতা, বহু বর্ণ ব্যক্তিত্ব, এবং দূর প্রসারী দৃষ্টিকে অভিবাদন করি, আমাদের কালের জন্যে, বাংলাদেশের জন্যে, তাঁর অনবসিত প্রাসঙ্গিকতার ঋণ স্মরণ করি। আজ-ও তিনি আমাদের ইতিহাসে মূল্যমানের এক প্রত্যাবর্তন বিন্দু, জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টা ও প্রচেষ্টাহীনতার এক বিচারদণ্ড, আজ-ও তাঁর চিন্তা আমাদের মানস যাচাইয়ের কষ্টিপাথর।

রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শিক্ষা বিষয়ে ভেবেছেন ও লিখেছেন, নিজে শিক্ষকতা করেছেন এবং শিক্ষার যে আদর্শ তিনি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তা রূপায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বিশ্বভারতী তাঁর অনেক কামনার এবং আশার প্রতীক। প্রতিষ্ঠানটি আজ তাঁর আকাঙ্ক্ষার আলোকে কতখানি সফল সে প্রশ্ন এখানে নয়। শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা, অধ্যাপনা, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ইত্যাদির বাইরে এবং সেসবকে ছাড়িয়ে আছেন শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। শিল্পের ভাষায় তাঁর অনিবার্য সমাজ সমালোচনা তাঁকে আবেগ ও মেধার স্তরে এক আশ্চর্য সাহসী এবং পরিশীলিত শিক্ষক হিসেবে দাঁড় করায়। কত কঠোর সমালোচনাই না তিনি করেছেন, বিশেষ করে হিন্দু সমাজকে। মনে পড়ে, তাঁর 'কথা' কাব্যে ব্রাহ্মণ-গুরু গৌতম অনার্য অব্রাহ্মণ 'ভর্তৃহীনা' জবালাপুত্র সত্যকামকে বলেছিলেন: 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত/দ্বিজোত্তম, তুমি

৮ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৯৫

সত্যকুলজাত'। মনে পড়ে, 'বিসর্জন' নাটকে রাজা গোবিন্দমানিক্যের পুরোহিত রঘুপতির গোমতির জলে 'জড় পাষাণের স্তূপ', তা বহু অমনুষত্যের কারণ, কালী প্রতিমাকে নিক্ষেপ। মনে পড়ে, তার আইরিশ পরিচয় জানার পর পরেশ বাবুকে সম্বোধন করে গোরার সেই কথাগুলো: "আজ প্রাতঃকালে অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপর ভূমিষ্ঠ হয়েছি... আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই— যাঁর মন্দির দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে, কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না, যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।" বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ আপন সমাজ, সমকালীন বিশ্ব, এবং সভ্যতার এক অন্তর্ভেদী সমালোচক-শিক্ষকের মহৎ ভূমিকা জীবনের শেষ অবধি পালন করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার পেছনের মানুষটি কেবল 'ষড়ঋতুর' মানুষ নয়, অপ্রত্যাশিত ঋতুর মানুষ, অন্য কথায়, তাঁর আয়তনটা ছিল 'রেনেসাঁসি' এবং বৈশ্বিক। প্রথমত, যে নিসর্গ সমাজ এবং সংস্কৃতিকে তিনি অজস্রধারে নিজের সৃষ্টিতে প্রকাশ করেছেন তিনি তাদের সবচেয়ে পূর্ণোদিত প্রতিনিধি। দ্বিতীয়ত, জীবন এবং শিল্পের নানা ক্ষেত্রে তাঁর পারঙ্গমতা ও কীর্তি, সেই সঙ্গে জীবনোপলব্ধি ও তত্ত্বে মানুষের পূর্ণ বিকাশ এবং চিত্তবৃত্তি ও কর্মে মিলনের দাবি, সর্বোপরি জীবনচর্চায় যুক্তি প্রাণময়তা আনন্দ এবং বৈচিত্রের উপর তাঁর গুরুত্ব আরোপ, তাঁকে করেছে রেনেসাঁস-মানবতাবাদী ধারার এক আশ্চর্য পুরুষ। একথা বললে কি ভুল হবে যে এই বহুগামী এবং বহুমুখী রেনেসাঁস-ব্যক্তিত্ব তাঁর আদর্শের আদলে, তাঁর জীবনদৃষ্টির উন্মুক্ত আলোয়, ব্যক্তি এবং সমাজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন?

ঐতিহ্যিক শিক্ষার সঙ্কীর্ণতা ও ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা বিচার করে এবং শিক্ষার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী নিষ্করুণভাবে বিশ্লেষণ করে, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যে মূল লক্ষ্যগুলোতে উপনীত হয়েছিলেন তা থেকে এ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক বলে মনে হয়। তাঁর বিবেচনায় শিক্ষার লক্ষ্য হবে : মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ উন্মোচন, ব্যক্তির সকল শুভ সম্ভাবনার স্ফুরণ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বৈষম্য বিমোচন, আত্মিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে সমন্বয়, জ্ঞান বোধ কল্পনা ও সৌন্দর্য-চেতনার কর্ষণ ও বিকাশ, কর্মে জ্ঞানের নিয়োগের দ্বারা জীবনে সম্পন্নতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, সৃজনশীলতার সাহায্যে মনুষ্যত্বের পরিচর্যা এবং প্রসার। স্পষ্টতঃই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার কেন্দ্রে ছিল এক জীবন-লগ্ন সমাজ-লগ্ন এবং বিশ্ব-লগ্ন, যুক্তি-কল্পনা ও প্রায়োগিক শক্তিতে দক্ষ, পূর্ণ-বিকশিত এবং বিবর্তিত মানুষ। নিঃসন্দেহে এ মডেলটি রেনেসাঁসি। আর শিক্ষার প্রক্রিয়া সম্পর্কে কবি অভিজ্ঞতা নিংড়ে বলেছেন একটি মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী কথা : দানে এবং গ্রহণে থাকবে 'আনন্দ'।

উল্লিখিত শিক্ষা-দৃষ্টিতে সমাজ যে অনুপস্থিত নয় তা পরিষ্কার। আসলে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার উপর এত জোর দিয়েছেন শুধু ব্যক্তির জন্যে

নয়, সমাজের জন্যেও। তিনি ভাব ভাষা জীবন ও সমাজকে এক সূত্রে গ্রথিত দেখতে চেয়েছেন, কেননা এ চার সুসমঞ্জস না হওয়ার ফল ব্যক্তিজগতের বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক বিচ্ছেদ, ব্যাপক নিষ্ফলতা। আমাদের দারিদ্র্য দুঃখের, আমাদের শিক্ষার অকিঞ্চিতকরত্ব লজ্জার, এ কথা বলে রবীন্দ্রনাথ ক্রোধের সঙ্গে বলেছেন 'শিক্ষার অভিসেচন ক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজেয়ে দেবে আর নিচের স্তর-পরম্পরায় নীরস কাঠিন্যে মরুময়তা' বিরাজ করবে, এ এক 'চিত্তঘাতী মূর্খতা' যা মানা যায় না। তিনি চেয়েছেন শিক্ষার এক 'ভাগীরথী ধারা' যা দেশের সব অজ্ঞ মানুষের মনকে সিক্ত করবে, প্লাবিত করবে। কিন্তু যে বাস্তবের তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন তা অতিশয় নির্দয়। জাতীয়তাবাদকে তিনি নাকচ করেছেন, কিন্তু জাতীয় শিক্ষা তাঁর কাম্য এবং অন্বিষ্ট ছিল। ঔপনিবেশিক শিক্ষার তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন এ জন্যে যে তা ছিল নিরানন্দ, যান্ত্রিক, স্থূলভাবে বৈষয়িক, জাতীয় চেতনা এবং ঐতিহ্য বিরোধী। সবচেয়ে বড় কথা, ওই শিক্ষা ছিল বিজাতীয় ভাষায় পরিচালিত এবং বৈষম্যমূলক।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির দারিদ্র্য দ্বারা গভীরভাবে পীড়িত বোধ করতেন, এ আমরা লক্ষ করেছি। দারিদ্র, অসহায়তাবোধ, সঙ্কীর্ণতা, হীনমন্যতা আর কত রকমের দৈহিক ও মানসিক অপুষ্টি ও অজ্ঞতার জন্ম দেয় তা তিনি জানতেন। দৈবনির্ভরতা এবং এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিকতা পরিহার করে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে বুদ্ধির নিয়মের সাযুজ্যকে মেনে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে, মানুষ এ দারিদ্র্য দূর করতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। প্রযুক্তির দ্বারা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব অর্জন করে যে পাশ্চাত্য বিশ্বের প্রভু হয়ে বসেছে তার বিজ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। কেবল একটি শর্ত ছিল তাঁর : বাইরের বস্তুর উপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দিয়ে, কৃত্রিম অভাববোধ জাগিয়ে মনুষ্যত্বের চরিতার্থতায় শূন্যতা সৃষ্টি করা চলবে না।

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলতে গেলে তাঁর পরিবেশ চেতনার প্রসঙ্গটি এসে যায়। যদিও প্রাচীন ভারতের শিক্ষার একটি আদর্শায়িত পরিবেশের চিত্র মনে রেখে তিনি এ সম্পর্কে কথা বলেছেন, তিনি মানুষ এবং প্রকৃতির যোগ এবং তাদের স্বচ্ছন্দ আদান-প্রদানের তাগিদের বিষয়টিকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আলোকিত করেছেন। মানুষ বৃক্ষ পাহাড় নদী পশুপাখী একই প্রাণের প্রকাশ, একই জীবন এদের মধ্যে মর্মরিত, এরকম চেতনা রবীন্দ্রনাথের ছিল। চিন্তাটি প্রাচীন, শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের চেষ্টাটি একালে হৃদয়গ্রাহী। যাক, যে অনুভূতির কথা বলছিলাম তা থেকে জাগে পরিবেশের প্রতি ভালবাসা, এক রকমের শ্রদ্ধাবোধ, তার নির্মম ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে পরিবেশের প্রতি সম্পূর্ণ অনুভূতিহীনভাবে, যে কারণে আমাদের ছোট গ্রহটি আজ বিপন্ন। প্রকৃতি এবং মানুষের ঐক্যের ওপর রবীন্দ্রনাথ এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে একথা বলা অসঙ্গত হবে না— যে তিনিই আধুনিক কালে আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় পরিবেশবাদী এবং সাম্প্রতিক কালের পরিবেশবাদীদের অন্যতম গুরু।

ভারতবর্ষ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ ধারণার সঙ্গে তাঁর বিশ্বভারতী যুক্ত। তাঁর উপলব্ধিতে ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকে গ্রহণ দান এবং মিলনে বিশ্বাসী। বিশ্বভারতীর মর্মকথার মধ্যে ছিল জাতীয় কিন্তু বিশ্বমুখীন শিক্ষা, এর মাধ্যমে দেশ এবং দেশে, সভ্যতা এবং সভ্যতায়, যোগ এবং আদান-প্রদান, জ্ঞান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মিলন। তিনি যেমন চেয়েছেন ব্যক্তি সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না, তেমনি চেয়েছেন জাতি বিশ্বসমাজের মনীষা এবং হৃদয়ের মূল রস থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে না। তিনি কোনও এক জায়গায় লিখেছেন, একমাত্র বর্বর সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাকে উৎকট স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অসহিষ্ণুতা এবং গ্রহণে আপত্তি। একটা জ্ঞান এবং বোধ সমৃদ্ধ বৈশ্বিকতার চেতনা তিনি সৃষ্টি করতে এবং ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ ছিল বিশ্বভারতীর শিক্ষার আন্তর্জাতিকতার দিক। এ প্রসঙ্গে এ-ও উল্লেখ্য যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কী করে মানুষের জীবন এবং চিত্তের কাছে পৌছবে, এ বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ভাবনার এ জিজ্ঞাসার উপর কিছু আলো এসে পড়ে যখন তিনি বলেন, পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরের 'চিত্ত মন্থনের যোগ বিচ্ছিন্ন নয়', কিন্তু 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা থেকে বিচ্ছিন্ন'। রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনের পাশাপাশি শ্রীনিকেতন সৃষ্টি করেছিলেন একটি লোকগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা এবং সমস্যার সঙ্গে বিশ্বভারতীর একটি প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপনের জন্যে। তাঁর এ প্রচেষ্টা এ্যামেরিকার Landgrant University-এর ধারণার সঙ্গে কিছুটা মেলে। যা হোক, আমাদের জন্যে স্মরণ করা জরুরী যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা যুগের 'ধ্রুব আদর্শগুলো' এবং সমাজের প্রবাহমান চিত্তের 'লীলা চাঞ্চল্য' ধারণ করার দায়িত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, এ প্রতিষ্ঠানটিকে উদ্ভাবনশীলতা এবং জ্ঞানের প্রসার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গত, তিনি John Dewey-এর 'instrumental knowledge'-কে মূল্য দিতেন বলে মনে হয়, কিন্তু বৈষয়িক বিবেচনায় সীমাবদ্ধ শিক্ষা কদাপি চান নি— মনুষ্য সত্তার সকল চাহিদা মেটাবার শিক্ষাই চেয়েছেন। তিনি সীমানাহীন জ্ঞান, কল্যাণকর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহার, বোধ ও যুক্তির বিকিরণ সমানভাবে কামনা করতেন

শিক্ষার বিকিরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র এবং সমাজের আপেক্ষিক ভূমিকা এবং মূল্য সম্পর্কে কী ভাবতেন সে কথাটা এসে পড়ে। একটু ভূমিকা দিয়ে সে কথাটার অবতারণা করছি। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার সংস্কার' এবং 'পল্লী সঞ্জীবন'কে তাঁর জীবনের প্রধান কাজ বলে বিবেচনা করতেন। টলস্টয় জীবনের শেষের দিকে শিক্ষার সংস্কার বিষয়ে বলেছিলেন, 'যা সঠিক তা করা উচিত নিঃশব্দে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে, সরকারের সম্মতি না নিয়ে তো বটেই, একেবারে সরকারের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে'। রবীন্দ্রনাথ সানন্দ অনুমোদনের সাথে তাঁর 'শিক্ষার সংস্কার' প্রবন্ধে কথাগুলো উদ্ধৃত করেন। ব্যাপারটি কৌতূহলজনক কিন্তু অর্থপূর্ণ। রাষ্ট্রকে, গভর্নমেন্টকে, এড়িয়ে সংস্কার

চাওয়ার পেছনে রবীন্দ্রনাথের মনে কি কাজ করেছিল, এই সূত্রে তা একটু স্মরণ করা যেতে পারে। উপনিবেশ-পূর্ব ভারতীয় রাষ্ট্র এবং সমাজের স্মৃতি, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র, তাঁর রাষ্ট্র এবং সমাজের ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি রাষ্ট্র এবং সমাজকে সমার্থক বিবেচনা করেন নি; রাষ্ট্রে, বিশেষ করে, ইয়োরোপীয় 'জাতি রাষ্ট্রে' তাঁর আস্থা ছিল না, এবং রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজে বেশী আস্থাশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'law and order' রক্ষার সঙ্কীর্ণ ভূমিকায় নিয়োজিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যহীন নির্মম কুৎসিত চেহারা দেখেছেন, পরাধীন দেশে সরকারের মুখাপেক্ষিতার লজ্জা অন্তরে অনুভব করেছেন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারানোর অর্থ যে দেশকেই হারিয়ে ফেলা তা মর্মে মর্মে বুঝেছেন। তাঁর ধারণায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাষ্ট্র কখনো সমাজকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ বা গ্রাস করে নি; মানুষ উপর স্তরের ঘটনাবলী, যথা রাজা-রাজ শক্তির উত্থান-পতনকে উপেক্ষা করে 'গ্রামে গ্রামে সামাজিক স্বরাজ' রক্ষা করেছে। তাঁর এ ধারণার ঐতিহাসিক যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও থাকতে পারে, তবুও লক্ষ না করে উপায় নেই যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত একটি হৃদয়হীন, সুতরাং নিপীড়নমূলক যন্ত্র, যার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা বাঞ্ছনীয় নয়। অন্ততঃ তাঁর কথার ঝোঁক থেকে তাই মনে হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান অবধি বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে কতখানি অন্য চোখে দেখতেন তা অনুমান সাপেক্ষ, কেননা রাষ্ট্র শুভসাধনেও সক্ষম এ কথা-ও তিনি মানতেন, তবে এর যান্ত্রিকতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্ভবত বদলাতো না। প্রসঙ্গত, আজ পূর্ব পশ্চিমে যাঁরা রাষ্ট্রের কাছে সমাজের সবটুকু যায়গা ছেড়ে দিতে নারাজ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে তাঁদের চিন্তার কিছু সমর্থন পেতে পারেন।

জীবন সমাজ এবং বিশ্বদৃষ্টি থেকে শিক্ষাভাবনা এবং রাষ্ট্রভাবনার উৎপত্তি, এ দুয়ের সংযোগ বিন্দু এইখানে যে শিক্ষাভাবনা থেকে এক ধরনের মানুষ এবং রাষ্ট্রের আদল উঠে আসে, আর শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তি যে মূল্যবোধ তা এক বিশেষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবি করে, একমাত্র যেখানে তা চরিতার্থতা পেতে পারে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় এবং রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র এবং সমাজের বিশিষ্ট ভাব সৃষ্টিতে অবদান রাখে। অবশ্য, আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যাইনি যে সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠীর আদর্শ ও ধারণাই সমাজে প্রাধান্য পায়।

রবীন্দ্রনাথ যে ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে আজ তিনটি 'জাতি রাষ্ট্র', তার একটি বাংলাদেশ, তাঁর গান গেয়েই আমরা এ দেশটি এনেছিলাম। ব্রিটেনের ভারত ত্যাগের ছ-বছর আগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়, এসব রাষ্ট্রের জন্ম বা বিবর্তন কোন কিছুই তিনি দেখে যান নি। তিনি যদি আজ এখানে ফিরে আসতেন দেখতে পেতেন তাঁর শিক্ষার আদর্শে যে মানুষ, রাষ্ট্র ও সমাজের আদল ক্রমে পরিস্ফুট হয়েছিল তা কতখানি উপেক্ষিত, তাঁর বৈশ্বিকতা, মানবিকতা ও যুক্তির ধারণা সমূহ এখানকার রাষ্ট্র

ও কোন কোন জনগোষ্ঠীর বৈরী চিন্তা ও আচরণে কতখানি উপহসিত। ইয়োরোপীয় জাতি-রাষ্ট্রের 'অক্ষম' নকল এ রাষ্ট্রগুলো জাতি সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অপটু ও ব্যর্থ হয়েও জাতীয়তা নিয়ে প্রচুর দাপাদাপি করে, খণ্ডিত জাতীয়তাকে প্রশ্রয় পোষকতা দেয়, এবং এক সার্বক্ষণিক মানসিক যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখে, যেখানে সভ্য সহনশীলতার চর্চা, মন বা হৃদয়ের সংযোগ সম্ভব হয় না।

এক রক্তস্নাত অথচ স্নিগ্ধ, অনাগ্রাসী ও নান্দনিক জাতীয়তা নিয়ে যে বাংলাদেশের শুরু তার পরিবর্তন আরও শোকাবহ। এখানে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কৃত্রিম উপায়ে খণ্ডিত এবং চণ্ডতাপ্রবণ পশ্চাৎমুখী এক জাতীয়তার স্থান করে দেয়া হয়েছে। আর শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সত্য হল নানা ধরনের মর্মঘাতী বিচ্ছিন্নতা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, দলীয় রাজনীতির অসাধু অনুপ্রবেশে শিক্ষকের পেশাগত আদর্শচ্যুতি। কোথায় দানে গ্রহণে আনন্দ, ছাত্র শিক্ষকে নিবিড় পরিচয়, শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সকল অংশের চিত্তের যোগ, শিক্ষার্থীর ভাষার সঙ্গে শিক্ষার ভাবের মিল, প্রতীচ্যের প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষুধার সঙ্গে কিছু দানের ক্ষমতা, উচ্চশিক্ষায় উঁচু স্তরের উদ্ভাবনশীলতা, সীমান্তহীন জ্ঞান, বৈচিত্র এবং চিত্ত প্রসারের সাধনা? এদেশে 'বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক' করার জন্যে ক-জন বিজ্ঞান চর্চা করছেন? আর যেমন ভারতে 'মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপনের', যা কিনা রবীন্দ্রনাথের মতে 'ভারতবর্ষের চিরকালের সর্বপ্রধান চেষ্টা', মনোভঙ্গীতে অনেক মানুষ আজ বিশ্বাসী নয় এ কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে? ধর্মীয় হিন্দুত্ব এবং ভারতীয়ত্বের একীকরণ এবং হিটলার প্রশস্তি আর যাই হোক, যুক্তিবাদী, মনুষ্যত্ববাদী, মিলনবাদী, বিশ্ববাদী রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার নয়। আমাদের চারিদিকে যখন মৌলবাদের অন্ধকার গাঢ় এবং হিংস্র হয়ে উঠছে তখন 'রেনেসাঁস' ও 'আলোকায়ণের' যুক্তিবাদের যে টুকু আমরা ধরে রেখেছি তার অসতর্ক উত্তর-আধুনিকতাবাদী অবমূল্যায়ন হবে পাশ্চাত্য জ্ঞানের 'নয়া উপনিবেশবাদী ও চিন্তাহীন প্রয়োগ' এবং আমাদের জন্য মারত্মক। হাঁ, অন্ধকার গভীর এবং ব্যাপক। 'সভ্যতার সঙ্কটে' রবীন্দ্রনাথের শেষ শিক্ষা : 'মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ'। অন্ধকারে মনুষ্যত্বের 'সমন্বয়'কেই 'মহামানব' জেনে আমাদের আলোর দিকে এগোতে হবে। ধন্যবাদ।

[শিক্ষাবার্তার উদ্যোগে আয়োজিত 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান শিক্ষাভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির ভাষণে প্রবন্ধটি পঠিত হয়।]

[প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ব প্রকৃতি

লায়লা রশিদ

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আমাদের সভ্যতা তার জন্ম লগ্নেই অরণ্য প্রকৃতির পরিবেশে লালিত হয়েছিল। আর সে কারণেই আমাদের মধ্যে জীবনের নানা ব্যাপারে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। এখানে প্রকৃতি ও মানুষের যোগাযোগ তাই কোন ব্যক্তি প্রচেষ্টার ফল নয়। এ দেশের মানুষের স্বাভাবিক মানসপ্রবণতা থেকেই যুগে যুগে সাহিত্যে ও জীবনাচরণে প্রকৃতি ও মানুষ যেন একাকার হয়ে গেছে আজ আমরা প্রকৃতি জগৎকে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যক্ষ করছি বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এমন একটা সময় ছিল, যখন প্রাণ লীলার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি স্বত্রন্ত্র না হয়ে অভিব্যক্তির একই স্তরে একত্রে লীন হয়ে ছিল। অতঃপর বিবর্তনের ধারায় অভিব্যক্তির নানা স্তর পার হয়ে মানুষ পেয়েছে তার বর্তমান রূপ। আর প্রকৃতি জগৎ রয়ে গেছে সেই প্রথমের কাছাকাছি। প্রকৃতি জগত সুন্দর। আর মানুষের মধ্যে সেই সুন্দর রূপান্তর লাভ করেছে ভালবাসায়। প্রকৃতি জগতের একজন ফুল মানব জগতের একজন নারীকে তাই বলেছে-

"তোমার আমার দেহে আদি ছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।
কী যে বলে সেই সুর, কোন দিকে তাহার প্রত্যাশা
জানি নাই ভাষা।
আজ সখী বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি
তোমাতে সে হল ভালবাসা।"

৮ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৯৫

সেই ভালবাসার জোরেই রবীন্দ্রনাথের 'মহামায়া' গল্পে রাজীব ও মহামায়া দুটি প্রেমিক প্রেমিকা যখন সমাজের বিধিবিধান অগ্রাহ্য করে, সমাজকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়েছে, তখনই অতি সার্থকভাবে এসেছে প্রকৃতির ঝড়। চিতার আগুন থেকে মহামায়াকে রক্ষা করেছে ঝড়। নায়ক নায়িকার সমাজ গণ্ডী অতিক্রম করে বেরিয়ে পড়ার পথেও সহযোগিতা করেছে ঝড়। রাজীব যেমন প্রলয়ের মধ্যেই প্রেমিকাকে লাভ করেছে, তেমনি 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক জীবনের মাত্র একবারের জন্য প্রেমিকাকে যখন পাশে পেয়েছে তখন মুষলধারে বৃষ্টি এবং ঝড় আরম্ভ হল। "যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগও বাড়িতে লাগিল। প্রথমে পূর্বদিক হইতে বাতাস হইতেছিল, ক্রমে উত্তর এবং উত্তর পূর্ব দিক দিয়া বহিতে লাগিল।" সেই ঝড় সামান্য এক ভাঙ্গা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের তুচ্ছ জীবন থেকে নায়ককে মুক্তিদান করে এক অনির্বচনীয় সৌভাগ্যের তটে পৌছে দিয়েছে। পৃথিবীর পরিচিত আলোতে যে প্রেমিকাকে পাশে পাওয়া অসম্ভব ছিল তাকে পাওয়া গেছে প্রলয় ঝড়ের অন্ধকারে। সেই সুদূরতমাকে ক্ষণিকের জন্য এভাবে নিকটবর্তী করে আনার সবটুকু আয়োজন করেছে প্রকৃতি। "সেদিন খণ্ড খণ্ড কালোমেঘ যেন একটা কি মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।" এই আয়োজন দু-জন ব্যর্থ নরনারীকে সমাজের বিধিবিধানের বাইরে পাশাপাশি এনে দেবার আয়োজন।

প্রকৃতির কোলে প্রকৃতিবালা মৃন্ময়ীর পরিপূর্ণরূপে রমণী মৃন্ময়ীতে রূপান্তর কিভাবে সমাপ্ত হয়েছে তারই কাহিনী আমরা পাচ্ছি "সমাপ্তি" গল্পে। গল্পের প্রথমাংশে মৃন্ময়ী প্রকৃতির সহোদরা প্রকৃতিবালা। তার চোখে মুখে একটি দূরন্ত অবাধ্য নারী প্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্য মৃগের মতো সর্বদা দেখা যায়। অপূর্বকে কেন্দ্র করে মৃন্ময়ী প্রকৃতি রঙ্গ কৌতুকে মেতে উঠেছে। নৌকা থেকে নামবার সময় অপূর্ব যখন কাদায় পড়ে গেল তখন মৃন্ময়ীর মধ্য থেকে প্রকৃতিই যেন সমস্ত ব্যাপারটিকে উপভোগ করেছে। "যেমন পড়া অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্য লহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশ্বত্থগাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।" এই কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী মৃন্ময়ী যখন অপূর্বের হাতে বন্দিনী হয়ে নানা কৌশলে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে তখন "কোকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল।" এখানে মানবী ও প্রকৃতিকে মৃন্ময়ীর মধ্যে আশ্চর্যরূপে মিশে যেতে দেখা যাচ্ছে। 'প্রকৃতি ও নারী' একই। একের মধ্যে সুন্দরের বিকাশ। অন্যের মধ্যে ভালোবাসা। তাই "সমাপ্তি" গল্পের সমাপ্তিও হয়েছে মৃন্ময়ীর মধ্যে ভালোবাসার উন্মেষের মধ্য দিয়ে। পরিপূর্ণ নারীরূপে যেদিন স্বামীর সঙ্গে তার মিলন হল সেদিনও প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হয়ে বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হলো।

প্রকৃতির অঙ্গ হিসেবে জ্যোৎস্নারাত্রির সর্বজনস্বীকৃত একটা গুরুত্ব আছে। মানুষের মনের ওপর জ্যোৎস্নার প্রতিক্রিয়া অসীম। দিনের কর্মকোলাহলে মানুষের চিত্তবৃত্তির যে

অংশগুলো সুপ্ত থাকে জ্যোৎস্নার কোমল স্পর্শে তাতে জোয়ারের পরিপূর্ণ আবেগ সঞ্চারিত হয়। তখন তা হৃদয়ের কুল ছাপিয়ে জোয়ারের উদ্দামতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

"সুভা" গল্পের নায়িকা সুভার অব্যক্ত হৃদয়ের সুপ্ত বাসনা ও উদ্দাম হয়েছে মায়াবী জ্যোৎস্নালোকিত রাতে। সুভা মানবী হয়েও প্রকৃতিজগতের অন্তর্গত। সুভার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শী গভীর। সুভা প্রকৃতির সহোদরা। নিভৃত অবসরে এই সহোদরা প্রকৃতি সুভার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হয়। কোনো মানুষের সঙ্গে তার কথাবার্তা মেলামেশা চলে না। সেই অভাব তার পূর্ণ করে দেয় প্রকৃতি। প্রকৃতি যেন তার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয়। "যেন তাহার হইয়া কথা কয়।" তাই বোবা মেয়ে সুভা যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন তার সেই ভাষাহীন যৌবনের মূক উদ্দামতা স্তব্ধ ব্যাকুল পূর্ণিমা প্রকৃতির মধ্যে আপনার রূপ খুঁজে পেয়েছে। "গভীর পূর্ণিমা রাত্রে সে (সুভা) একদিন ধীরে শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, পূর্ণিমা প্রকৃতিও সুভার মত একাকিনী। সুপ্ত জগতের ওপর জাগিয়া বসিয়া--যৌবনের রহস্য পুলকে বিষাদে অসীম নির্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত; এমনকি তাহা অতিক্রম করিয়াও থম থম করিতেছে। একটি কথাও কহিতে পারিতেছে না।"

এ মায়াবী জ্যোৎস্নারাতেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয়ে 'নিশীথ' গল্পের নায়ক তার রুগ্ন স্ত্রীর কাছে বলে "তোমার ভালোবাসা আমি কোনকালে ভুলিব না।" ঠিক এমনি কথাই সে অনেকদিন পর আবার এক চাঁদের রাতে আরো বিপুল উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করেছে তার দ্বিতীয়া স্ত্রীর কাছে। সে বলেছে-"মনোরমা তোমাকে আমি ভালোবাসি, তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেছে। মনে পড়েছে এই কথাটি আরো একদিন আরেকজনকে বলেছে এবং "সেই মুহূর্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদের নিচ দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্যন্ত হাহা-হাহা করিয়া অতি দ্রুত একটি হাসি বহিয়া গেল।" এরপর ধীরে ধীরে নায়ক দক্ষিণাচরণ পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেল।

অধ্যাপক গল্পের নায়ক যেদিনই প্রতিবেশিনী যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে সেদিনই অনুভব করেছে প্রকৃতি যেন মূকভাবে তার কাছে অনুনয় করছে-আমি মৌন তুমি আমাকে ভাষা দাও।

"নষ্টনীড়ের" অমল ও চারু তাদের অবচেতন মনের নিভৃত গোপন পরিচয় নিজেদেরই অজ্ঞাতে প্রকাশ করে ফেলেছে তাদের আপন আপন রচনায়। সে রচনার বিষয় আষাঢ়ের চাঁদ এবং শ্রাবণের মেঘ। "অমল লিখিয়াছে ভাই চাঁদ তুমি মেঘের মধ্যে

চোরের মতো লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন। চারু লিখিয়াছে, "সখী কাদম্বিনী হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ।"

রবীন্দ্র সাহিত্যে এইভাবে মানুষের জীবনে স্বপক্ষে বা বিপক্ষে প্রকৃতি সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কখনো মানুষের জন্য বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছে, কখনো শক্রতা করেছে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষণ করেছে। আবার কখনো অবিচল উদাসীন মূর্তিতে উপস্থিত থেকেছে। একটা স্বতন্ত্র ব্যস্ততা নিয়ে নায়ক নায়িকার জীবন থেকে দূরে সে আপন কাজে ব্যস্ত থেকেছে। তাই "কঙ্কাল" গল্পের নায়িকা যখন বকুলতলায় বিছানা পেতে আত্মহত্যার আয়োজন করেছেন তখন "সুপ্তজগতের ক্লান্তি স্মরণ করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাতাস আমোদ করিয়াছে।"

"জয় পরাজয়" গল্পের কবি শেখর যখন পরাজয়ের মর্মবেদনা নিয়ে আপন ঘরে স্বরচিত গ্রন্থগুলো পুড়িয়ে নিজেই নিঃশেষ হবার কথা ভাবছেন, তখনও "ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।" কে কোথায় কবে কি ব্যথা পেল সে নিয়ে দক্ষিণের বাতাসের কোন মাথা ব্যথা নেই।

তাই 'মানভঞ্জন' গল্পের গিরিবালার জীবনেও প্রকৃতির ভূমিকা প্রথমে সক্রিয় হলেও পরে তার সম্পূর্ণ উদাসীন মূর্তি প্রত্যক্ষ করি। গিরিবালার স্বামী যখন তাকে অপমানিত করে তার শরীর থেকে গহনা ছিনিয়ে নেয় তখন "বাড়িতে কাহারো নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না। জ্যোৎস্না রাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্বত্র যেন তখন শান্তি বিরাজ করিতেছে।" তবে "পোষ্ট মাস্টার" গল্পের রতনের প্রতি মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারেনি প্রকৃতি। সামান্য অবজ্ঞাতো দূরের কথা, রতনের অব্যক্ত মনের সকল বেদনা নিজ বুকে ধারণ করে একাত্ম হয়েছে রতনের সঙ্গে। তাই পোস্টমাস্টার যখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে একেবারে চলে যাবার কথা প্রকাশ করল তখন "মিটমিট করিয়া 'প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণচাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।"

আপন ব্যক্তিমনের এক কোণটিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্জনতম নিঃসঙ্গ। এই নিঃসঙ্গতার নদীকুলে যা নিয়ে তিনি ছিলেন তার একটা হল নিজের অন্তরসত্তা, অপরটি হল প্রকৃতি। তাই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে প্রকৃতির অনুপ্রেরণা সর্বব্যাপী হয়ে ওঠাটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। তাঁর চিন্তায় ভাষা জুগিয়েছে প্রকৃতি। প্রকৃতির রঙরেখা দিয়ে তিনি সার্থক করে তুলেছেন আপন শিল্প সৃষ্টিকে। প্রকৃতি যেন ভাবমূর্তি নিয়ে তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

[*শিক্ষক, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল ও কলেজ।*]

উপসংহার

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। বৃহত্তর রংপুরের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষার জন্য সকল নাগরিককে সমান সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব মূলত সরকারের। বৃহত্তর রংপুরের মানুষ যদি বঞ্চিত হয়ে থাকে, অতীতে যদি কখনো বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে তাহলে তা থেকে মানুষকে মুক্ত করার দায়িত্বও সরকারের। তবে বৃহত্তর রংপুরের মানুষকে শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রের অধিকার সম্পর্কে যেমন সচেতন হতে হবে তেমনিভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনেও এগিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপারে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে বৃহত্তর রংপুরের মাটি থেকে উঠে আসা প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে।

সূত্র :

১. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও লালমনিরহাট কর্তৃক সরবরাহকৃত বিবরণী।

২. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও লালমনিরহাট কর্তৃক সরবরাহকৃত বিবরণী।

৩. উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।

৪. Statistical Year book, 1993, Bureau of Statistics.

৫. Banbeis Report, 1993.

৬. Bangladesh Population Census, 1991, Vol-I & Vol-II.

৭. বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, রংপুর (১৯৯০), বরিশাল (১৯৮০) ও কুমিল্লা (১৯৮১)।

৮. শিক্ষাঙ্গন ভিত্তিক ম্যাগাজিন-মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস (বই-১১, সংখ্যা-৭)।

টীকা : মূল প্রবন্ধটি ৩ নভেম্বর, ১৯৯৫ রংপুর জেলা সমিতি, ঢাকা আয়োজিত, জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'বৃহত্তর রংপুরের স্কুল পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা : সমস্যা ও সমাধানের পথ' শীর্ষক প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি শিক্ষাবার্তা ৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯৬ এ প্রকাশিত হয়েছিল। এখন তার সার সংক্ষেপ প্রকাশিত হল।

[লেখক : ঢাকাস্থ রংপুর জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের রসায়নশাস্ত্রের সাবেক অধ্যাপক, বর্তমানে প্রথম সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (অতিরিক্ত কর কমিশনার) হিসাবে কর্মরত।]

ইতিহাস-গবেষণার রীতি ও ঐতিহ্য

মমতাজুর রহমান তরফদার

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার গত ৩০ জুলাই রাত ১২টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর কর্মব্যস্ততার মাঝেও তিনি শিক্ষাবার্তার উপদেশকমণ্ডলীতে থেকে আমাদের ধন্য করেছেন। ২৫ মে ১৯৯৭ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক টিএসসিতে আয়োজিত উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সেমিনারে প্রফেসর তরফদার প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছে। সম্ভবত এটি তাঁর প্রকাশিত শেষ প্রবন্ধ। শিক্ষাবার্তা-য় সেখান থেকেই প্রবন্ধটি পুনঃমুদ্রিত হ'ল। —সম্পাদক]

আধুনিক ঐতিহাসিক তাঁর গবেষণা-পদ্ধতির কোনো কৌশলই গোপন রাখতে চান না। সাক্ষ্যপ্রমাণ কি ভাবে ব্যবহার করে তিনি ঘটনার চলমান দৃশ্যপট নির্মাণ করেন সে বিষয়টি তিনি তাঁর পাঠকসমাজের গোচরে আনেন। ঐতিহাসিকের এই আত্মসচেতনতার সঙ্গে অনেকটা সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠেছে ইতিহাসেরও ইতিহাস লেখার ঐতিহ্য। বিভিন্ন প্রজন্মের ঐতিহাসিক ইতিহাসের প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কি ভাবে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, মানবীয় অতীত সম্বন্ধে তাঁদের ধারণাগুলি কোন ধরনের এবং মানবীয় কর্মপ্রবাহ, চিন্তন ও অনুভূতি ইতিহাস-গবেষণার এলাকার বাইরের জগতের সঙ্গে অনুরূপ প্রবাহ বা ঐতিহ্যের সঙ্গে কি ভাবে সম্পর্কিত হয়েছে— ঐতিহাসিক এ-সব বিশ্লেষণ করেন। ঐতিহাসিকের এই আত্মসচেতনতা ও ইতিহাস লেখার কৌশল সম্বন্ধে চেতনার বিকাশ ঘটেছে বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে এবং দক্ষিণ-এশিয়ার বাইরে— ইংল্যান্ডে, অনেকটা ইয়োরোপের ইতিহাসের গবেষণাকে কেন্দ্র করে।

বর্তমান শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশক পর্যন্ত ইংরেজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন ভারতের মুসলিম আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস। যে-সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনার সমগ্রতা গড়ে তোলে সেই শক্তিগুলি সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। ইতিহাস-চিন্তনের এই একরৈখিক ধারার প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করেছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক Dr. Peter Hardy তাঁর Historians of Medieval India নামক গ্রন্থে। মধ্য যুগের ভারতের অর্থনীতি ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে স্বল্পসংখ্যক ঐতিহাসিক ব্যতিক্রমধর্মী

গ্রন্থ লিখেছেন রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার প্রধান ধারাটির ওপর তাঁদের প্রভাব তেমন একটা পড়ে নি। ১৯৫৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত, ভারতীয় ঐতিহাসিকদের সম্বন্ধে আলোচনা-সভায় পঠিত এবং Historians of India, Pakistan and Ceylon (ed. C.H. Philips, London, পুনর্মুদ্রণ-১৯৬২) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে নিরেট রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার বিপরীত মেরুতে ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা-ঐতিহ্য গড়ে তোলার তাগিদ ও প্রস্তাবনা স্পষ্ট। সম্ভবত এ-ধরনের সৃষ্টিধর্মী প্রেরণার ফলেই ষাটের দশক থেকে মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস-গবেষণার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। গবেষণার ভর পরেছে এখন ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন দিক, ভূমিব্যবস্থা ও রাজস্ব-ব্যবস্থা, প্রকৌশল, সমাজ-কাঠামো ও বর্ণব্যবস্থা, বাণিজ্যে মুদ্রাব্যবস্থা ও স্বর্ণরৌপ্যের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর। ইসলাম ধর্ম, সুফীদর্শন, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও কিছু গবেষণা হয়েছে। আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আধুনিক ইতিহাস-গবেষণার বহুবিচিত্র প্রবণতা ও পদ্ধতিগত ঐ মেরুকরণের প্রতি যৎসামান্য নজর দিতে পেরেছি। ইতিহাস-গবেষণা সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ কথা বলতে গিয়ে মধ্য-যুগীয় ইয়োরোপের ও ভারতের ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত ও তাত্ত্বিক রীতিনীতি কখনো কখনো শুধু উল্লেখ করেছি।

দুই

ইতিহাস বলতে কি বুঝায়, খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতাসের সময় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সে-বিষয়ে বিভিন্ন ধারণা ও অভিমত চলে আসছে। বর্তমানে কিছুটা অপ্রচলিত একটি প্রবচন দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাচ্ছে : History is legends agreed upon. কিন্তু সর্বজনসম্মত পৌরাণিক কাহিনীগুলি evidence বা সাক্ষ্যপ্রমাণকেন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধকল কাটিয়ে ওঠে ঐতিহাসিক সত্যের রূপ নিতে পারে না। কাহিনীগুলিকে প্রায়ই কোনো স্থানকালের সীমার মধ্যে স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়; তবে কোনো কোনো যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝবার জন্য পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তির উপাদান সহায়ক হতে পারে। ইতিহাসের সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর অভিন্নতা সংক্রান্ত ধারণার বিপরীতে উল্লেখ্য আর একটি পরিশীলিত মতবাদ। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতায় অধ্যাপক J.B. Bury (১৮৬১-১৯২৭) বলেছিলেন, History is a science, no less and no more. — ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, একটুও কম নয়, একটুও বেশি নয়। বিউরি Positivism (প্রত্যক্ষবাদ)-এর প্রভাবে পড়ে কথাগুলি বলেছিলেন। আঠার-উনিশ শতকে মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুনের অনুবর্তী করে তোলার প্রবণতা চূড়ান্তভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল; Positivism এই প্রবণতারই সংজ্ঞায়িত রূপ। বর্তমান শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইয়োরোপের বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক চূড়ান্তভাবে এই মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ইতিহাসের দর্শনে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের প্রভাবও পড়েছিল অনেক ক্ষেত্রে

নির্ভেজাল রূপ নিয়ে। সম্প্রতি অবশ্য ছদ্মবেশী হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব The Great Tradition ও The Little Tradition জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষার আড়ালে মধ্য যুগের বাংলার ইতিহাসে এসে হাজির হয়েছে; ফলে বাংলার ইসলাম ছকেবাঁধা এই দুই ঐতিহ্যের মাঝখানে সম্পূর্ণ নতুন ও তৃতীয় প্রত্যয় রূপে নিশ্চল পেন্ডুলামের মতো ঝুলে আছে। ভারতে ও পৃথিবীর অন্য কতকগুলি অঞ্চলে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের অনুসরণে ইতিহাস লেখা হয়েছে প্রচুর। কিন্তু এ-সব রচনায় বিশ্বের মানবসভ্যতার জন্য সম্পূর্ণ একরৈখিক বিবর্তনের একটি ধারা যেন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস-দর্শনে এ-সব তত্ত্বের প্রভাব সত্ত্বেও দু-জন ঐতিহাসিক তত্ত্বনির্মাতা ইতিহাস-বিদ্যাকে একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত বিদ্যা হিসেবে তার স্বমর্যাদার অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের একজন হচ্ছেন ইতালীর বেনেডেত্তো ক্রোচে, অপর জন ইংল্যান্ডের আর. জি. কলিংউড। মনে করা হয়েছে, ইতিহাস অতীতের মানবীয় ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান-পদ্ধতি। এই অনুসন্ধান-কার্য পরিচালনা করা হয় সাক্ষ্যপ্রমাণের ব্যাখ্যার সাহায্যে। ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য অতীতের মানবীয় ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করা যাতে করে বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষ অতীতের মানুষের কৃতি জানতে পারে। আর এই মানসিক অনুশীলনের ফলে মানুষ নিজের কৃতি সম্বন্ধে সচেতনভাবে অবহিত হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ইতিহাসের civilizing influence প্রবল। এটি ইতিহাস-বিদ্যার মানবিক দিক।

তিন

ইতিহাস-গবেষণার প্রাথমিক পর্যায় দুটি : তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা। তথ্যমাত্রই পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত উপাদান বা reported fact. তথ্যভিত্তিক evidence বা সাক্ষ্যপ্রমাণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা নির্ণয় করতে পারেন। বিজ্ঞানও অজানা বস্তু, অজানা সূত্র বা অজানা pattern বা বিন্যাস খুঁজে বের করে। কিন্তু ইতিহাস আত্মকেন্দ্রিক (subjective) বিজ্ঞান। ইতিহাস-গবেষণার প্রক্রিয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও, এতে ঐতিহাসিকের মনের ভূমিকা মুখ্য হলেও ঐতিহাসিক চিন্তনে ঘটনার বস্তুভিত্তি হারিয়ে যায় না। কারণ, সাক্ষ্যপ্রমাণভিত্তিক, সমালোচনামূলক চিন্তনের আলোকে ঘটনার বিভিন্ন দিক যাচাই করে প্রয়োজনমতো ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌছান। তিনি এই কাজটি করেন ঘটনা সম্বন্ধে যথোপযুক্ত প্রশ্ন তুলে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের মারফৎ প্রাপ্ত সেইসব প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে। বিজ্ঞানের কাজও প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে সত্যের সন্ধান। প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক রত থাকেন সত্য আবিষ্কারের কাজেই। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে গবেষণার প্রক্রিয়া এবং উপাত্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রণালী বিভিন্ন। একজন রসায়নবিদ পরীক্ষাগারে বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে দুই ইউনিট হাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ইউনিট অক্সিজেন মিশিয়ে এক ইউনিট জল বানাতে পারেন। যে সকল রাসায়নিক উপাদানের মিশ্রণের ফলে একটি ভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি

হয় রসায়নবিদ অনেকক্ষেত্রে তাদের পরিমাণগত অনুপাত প্রমাণের সাহায্যে নিখুঁতভাবে দেখিয়ে দিতে সমর্থ হন। পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অসংখ্য সারণীর সাহায্যে যে ঐতিহাসিক তাঁর তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তগুলি তৈরির কাজে সিদ্ধহস্ত তিনিও এ-ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দুরূহ গবেষণা চালিয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ঘটনার কারণগুলির মধ্যে এক বা একাধিক অপরিবর্তনীয় চালিকাশক্তি আবিষ্কার করেন। এই চালিকাশক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটে বলে প্রকৃতির রাজ্যে একই ঘটনা বারবার ঘটে থাকে। এ-জাতীয় চালিকাশক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতেই জোয়ার-ভাটা, মৌসুমি বৃষ্টিপাত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, তাপের ওঠানামা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব। ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ-পরম্পরার মধ্যে উক্ত স্থায়ী, পুনরাবৃত্তিমূলক চালিকাশক্তি নেই বলে ইতিহাসের প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন মেনে চলে না; ইতিহাসের ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করা যায় না। ঐ একই কারণে কোনো ঘটনা বারবার ঘটে না।

ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যেমন করা যায় না, ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তেমনি গবেষণার পরীক্ষাগারে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় আনা যায় না। Evidence বা সাক্ষ্যপ্রমাণই ইতিহাস-গবেষণার বড়ো অবলম্বন। সাক্ষ্যপ্রমাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর থেকেই ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্যায়নের স্তরে হাজির হতে পারেন। গবেষণার এই সুশৃঙ্খল পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি বলতে বোধহয় বাধা নেই।

লিপিবদ্ধ ইতিহাস অতীতের মানবীয় ঘটনার বিবরণ। বিবরণের অর্থ নিছক বর্ণনা নয় - বিবরণের অর্থ গবেষণা- সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরিচালিত গবেষণা। গবেষণা-কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত কোনো একটি ইউনিটের জন্য সীমিত পরিমাণের কতকগুলি তথ্যই শুধু ঐতিহাসিক বেছে নিতে পারেন। তথ্য-নির্বাচনের এই প্রক্রিয়ায় তিনি এক ধরনের মানসিক সম্পাদনার কাজে ব্রতী হন। রাশি রাশি তথ্য হারিয়ে গেছে। ঐতিহাসিককে কাজ করতে হয় শুধু আবিষ্কৃত তথ্যেরও সামান্য অংশের ওপর নির্ভর করে। নতুন তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া ঘটনার প্রতি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দেয়, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ও তাৎপর্যও বদলে দেয়। গত শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের ঈজিয়ান অঞ্চলে সভ্যতার প্রতীকচিহ্নের আবিষ্কার, সাম্প্রতিককালে ইজরাইলের হাসোরে প্রত্নবস্তুর উদ্ধার, গুজরাট, রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশে সিন্ধুসভ্যতার প্রমাণবাহী উপাত্তের সন্ধান, বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে এবং চব্বিশ পরগনার চন্দ্রকেতু গড় সহ কয়েকটি স্থানে উৎখননের ফলে প্রত্নদ্রব্যাদি প্রাপ্তি, এবং গুজরাট ও মালোয়ায় এবং জৌনপুর ও বাংলায় ইরানি রীতির অনুসরণে চিত্রিত পাণ্ডুলিপির সন্ধান লাভ নতুন তথ্যের আবিষ্ক্রিয়ার কতকগুলি উদাহরণ। এইসব আবিষ্ক্রিয়ার ফলে তথ্যের ভাণ্ডারেই শুধু সমৃদ্ধি আসেনি, কয়েকটি সভ্যতার চারিত্র্য ও

অবস্থান সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই গবেষককে কাজ করতে হয়; নতুন তথ্যের আবিষ্ক্রিয়ার প্রতীক্ষায় তাঁর বসে থাকা চলে না। তথ্যচয়ন কোনো লটারির কাজ নয়। গবেষক চয়ন করেন বৈশিষ্ট্যমূলক (typical) তথ্য। এ ধরনের তথ্যই evidence; আর evidence থেকেই ঐতিহাসিক তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তর আদায় করতে পারেন। গবেষক যখন সাক্ষ্যপ্রমাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে রত হন অনুসন্ধান-পদ্ধতির এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ঐতিহাসিকের দায়িত্বে তখন নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটে। ঐতিহাসিক এখন একাধারে উকিল ও বিচারক। আকরগ্রন্থে ও প্রত্ন-উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তিনি যেন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে তাদের কাছ থেকে উত্তর আদায় করেন। সেইসব উত্তরের ভিত্তিতে তিনি ঘটনার জটিল গ্রন্থিগুলি খুলে দেন ; শেষ পর্যন্ত ঘটনার তাৎপর্য সম্বন্ধে রায় দেন। ভিন্ন ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারলে ঐ রায় টেকে না। নতুন evidence পেলে ঐতিহাসিক তখন আর আগেকার সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেন না। কো নো ঘটনা সম্বন্ধে evidence যদি আদৌ পাওয়া না যায়, কিংবা তথ্যের বিরলতা যদি প্রকট হয় তখন ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। যেখানে তথ্যের ক্ষেত্রে শূন্যতা প্রকট সেখানে assumption বা অনুমান বড়ো একটা কাজে আসে না। Assumption কার্যকর হয় অনেক সময় গণিতবিদ্যা জাতীয় 'যথার্থ' বিজ্ঞান বা exact science-এর গবেষণা ক্ষেত্রে। কারণ, গবেষণার পর্যায় বিশেষে পৌঁছে নির্ধারিত সমস্যাটির সমাধানের জন্য সংগৃহীত উপাত্তগুলির সমীকরণ থেকে অথবা তাদের অসম অবস্থান থেকে গবেষক মডেল তৈরি করে ধনাত্মক সূত্র বা উপাদান আবিষ্কার করতে পারেন। ইতিহাসের গবেষণায় evidence বা সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। সাক্ষ্যপ্রমাণের শূন্যতার ক্ষেত্রে অবশ্য বিকল্প, অথচ দুর্বল অবলম্বন থাকতে পারে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে গবেষক দেখলেন ঘটনা 'মরুপথে হারাল ধারা'। হয়তো তিনি কতকগুলি শূন্যস্থান দেখলেন। Evidence-এর অভাবে শূন্য স্থানগুলি পূরণ করা যাচ্ছে না। এ- ক্ষেত্রে ঘটনার কতকগুলি আভাসকে নির্দিষ্ট বিন্দু রূপে চিহ্নিত করে ঐতিহাসিক ঐ ঘটনার পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর মধ্যে রেখা টেনে Historical Imagination বা ইতিহাসভিত্তিক কল্পনার সাহায্যে বিন্দুগুলির মধ্যে তিনি যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। চৌদ্দ শতকের শেষার্ধে ফীরোজ তোগলক দু বার বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর যাত্রাপথ দিল্লীতে শুরু হয়ে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের অন্তর্গত একডালায় এসে শেষ হয়েছিল। এই পথের রূপরেখা স্পষ্ট নয়। তারীখ-ই-ফীরুজশাহীতে জিয়া উদ্দীন বারানী বলেছেন, সুলতান পথে থেমে আওয়াধ প্রদেশের গোরখপুরে ও খরোসায় দু-জন বিদ্রোহী হিন্দু রাজার আনুগত্য গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী থেকে অযোধ্যার অন্তর্গত গোরখপুর ও খরোসা এবং খরোসা থেকে পুব দিকে এগিয়ে ঘর্ঘরা-যমুনার সঙ্গমস্থল অতিক্রম করে এবং জিয়ারন হয়ে কোশী নদীর ওপর দিয়ে

একডালা পর্যন্ত যদি একটি রেখা টানা যায়, তবে ফীরোজ তোগলক কর্তৃক ব্যবহৃত পথটির অবস্থান বুঝতে পারা সম্ভব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাতেও ঘটনার শূন্যস্থান ঐ একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ হয়। কেউ কিনারায় দাঁড়িয়ে বুড়িগঙ্গার মাঝামাঝি একটি পানসি নৌকো দেখলেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ লক্ষ করলেন, নৌকাটি একেবারে তাঁর সামনে এসে গেছে। এখন তিনি পরিলক্ষিত স্থানিক বিন্দুগুলির মাঝখানে রেখা টেনে নিতে পারেন। যে দুটি উদাহরণ দেওয়া গেল তাতে ঘটনার প্রমাণাভাস বা slender evidence আছে বলে ঘটনার পুনর্নির্মাণে assumption বা অনুমান প্রয়োগ করা সম্ভব হলো। ইতিহাস-রচনায় এ ধরনের কল্পনাভিত্তিক নির্মাণ যুক্তিগ্রাহ্য।

চার

সমগ্র পৃথিবীর মানবীয় ঘটনা নিয়ে গবেষণার কাজ সীমিত শক্তি ঐতিহাসিকের জন্য দুঃসাধ্য— এ-যেন অনন্ত আকাশে জরিপকার্য পরিচালনা। সেইজন্য লিখতে হয় সীমিত ভূখণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ইতিহাস। এই সীমিত ভূখণ্ডের ইতিহাসেও গবেষককে সময়ের বুকে ছেদ টানতে হয়। এইখানে আসে periodization বা কাল বিভাজনের প্রশ্ন। কেউ যদি শর্কীদের সময়কার (১৩৯৮-১৪৯৫ খ্রি:) ইতিহাস বা ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সীমিত বাংলার ইতিহাস লিখতে চান তিনি ঐ যুগটিকে এবং ঐ বিষয়টিকে কেন গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন, সেই সব প্রশ্নের উত্তর তাঁকে যুক্তিসঙ্গতভাবে দিতে হবে। যুগ-বিভাজন এবং গবেষণার ইউনিট নির্বাচন ইতিহাসের গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। কাজ দুটো কতোটা নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা হলো, গবেষণার সাফল্য নির্ভর করে অনেকটা তার ওপর।

ভারতের ইতিহাসের ইউনিট নির্বাচন প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার। বর্তমান কালের এই উপমহাদেশকে উনিশ শতকের আগে একটি ভৌগলিক বা সাংস্কৃতিক ইউনিট রূপে ধরে নেওয়ার রেওয়াজ চালু ছিল না। ব্রিটিশ রাজত্বে যখন প্রায় সমগ্র উপমহাদেশ একই শাসনের অধীনে এলো, তখন বাংলার রেনাইসাঁস ও সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুষঙ্গ রূপে ভারতের ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার ধারণাও স্থায়ী রূপ পেলো। আবহাওয়া, ভূপ্রকৃতি, ভাষা, নৃগোষ্ঠী, খাদ্যাভ্যাস, মানসিক অভ্যাস, ধন উৎপাদনের পদ্ধতি এবং সার্বিক সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে ও বিভিন্নতায় চিহ্নিত অসংখ্য ভূখণ্ড নিয়ে যে উপমহাদেশ গঠিত, তাকে একটি মাত্র ইউনিটরূপে গ্রহণ করলে সেই ইউনিটের কোনো নির্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে গবেষণার কাজ প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। উপমহাদেশের কোনো কোনো ভাষাভিত্তিক ভূখণ্ডকে কিংবা বাণিজ্যিকসূত্রে গ্রথিত একাধিক অঞ্চলকে ইউনিট হিসেবে গ্রহণ করলে গবেষণার জন্য যুক্তিসম্মত বস্তুভিত্তি ও তাত্ত্বিক কাঠামো খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ইয়োরোপকে মহাদেশ বলে স্বীকার করে নিয়েও Social and Economic History of Medieval Europe লিখতে গিয়ে Henri Pyrenne রোমান

সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে পনের শতকের পশ্চিম ইয়োরোপকে বেছে নিয়েছেন গবেষণার ইউনিট হিসেবে। মধ্য যুগের ইয়োরোপকে এই অঞ্চলটির অর্থনীতিতে ও সমাজব্যবস্থায় এমনি কতকগুলি বিন্যাস তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন যা ঐ মহাদেশের অন্য অংশগুলিতে তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। চসারের (১৩৪০-১৪০০ খ্রি) সমকালীন ইংল্যান্ড বিশিষ্ট; কারণ সেখানে জাতি হিসেবে এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে একটি একক ইংরেজ লোকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। এই জাতির সাহিত্য, ধর্ম, অর্থনীতি ও যুদ্ধ-কৌশলের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যাচ্ছে, তা চরিত্রগতভাবে এ্যাংলো-স্যাকসন নয়, ফরাসী নয়; বরং তা একান্তভাবে ইংল্যান্ড দ্বীপের লোকজনের বৈশিষ্ট্য। এইজন্য চসারের ইংল্যান্ড Trevelyan- এর *English Social History*-তে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে। উপমহাদেশের ইতিহাস-গবেষণায় ইউনিট নির্বাচনের সমস্যার প্রতি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি বোধ হয় ফলপ্রদ। গবেষণার জন্য নির্বাচিত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের আরো কতকগুলি ভূখণ্ডের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সূত্রের সম্পর্ক থাকতে পারে। গবেষক যদি এ-ধরনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর গবেষণায় সচেতনার পরিচয় দিতে পারেন, তা হলে তাঁর আলোচনায় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ধরা দেবে।

একটি বিশেষ যুগকে গবেষণার জন্য বেছে নিলে যুগের সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিকে এ-ক্ষেত্রে আলোচনায় অনেকটা অনুভূমিকভাবে স্থান দিতে হয়। আলোচিত সমস্যাগুলির ধারা যুগসীমার বাইরেও প্রবহমান। প্রস্তাবনা ও উপসংহার জাতীয় অধ্যায়ে গবেষক ওগুলির আদি-অন্ত নির্দেশ করতে পারেন। অধ্যাপক আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ *The Foundation of Muslim Rule in India* গ্রন্থে একটি পটভূমি গোছের অধ্যায়ে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় বিভিন্ন তুর্কি কোমের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান-পতন, মোঙ্গলদের ভূমিকা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষত্রশক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তাদের সঙ্গে বহিরাগত তুর্কি শক্তির যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাফল্যের তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। মামলুক শাসনের ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের স্বাভাবিক, ঐতিহাসিক পরিণতি সম্বন্ধে লেখকের অর্থবহ ইঙ্গিত এবং মামলুক রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ও বিকাশমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে ঐ বিশ্লেষণধর্মী পটভূমিকা একত্রে পড়ে নিলে বুঝতে পারা যায় যে, এই সব পর্যালোচনার ফলে মামলুকদের ইতিহাসের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূদৃশ্য পুরোপুরি উন্মোচিত হয়েছে। যুগভিত্তিক গবেষণা-পদ্ধতি সমস্যাগুলির সার্বিক অনুধাবনে বাধা সৃষ্টি করেনি। সমস্যাভিত্তিক উর্ধ্বাধ পর্যায়ের (vertical) আলোচনায় গবেষক সমস্যাকেই গুরুত্ব দেন বলে যুগ-বিভাজনের সীমারেখাগুলি অতিক্রম করে তিনি সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা দেন। অধিকাংশ গবেষণাধর্মী নিবন্ধ বর্তমানে এই পদ্ধতির অনুসরণে রচিত হচ্ছে।

ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসগুলির মধ্যে সাহিত্যিক উৎসে প্রচারধর্মী মানসিকতা ও ব্যক্তিগত প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসে এ-ধরনের

প্রবণতা খুবই কম। দুটি উৎসের মধ্যে কোনোটিতেই ঐতিহাসিক-সত্য তেজাবি সোনার মতো ready-made অবস্থায় নেই। সওয়াল-জওয়াবের সমালোচনামূলক ও ব্যাখ্যাধর্মী পদ্ধতি প্রয়োগ করে উৎসগুলি থেকে চয়িত evidnce-কে ইতিহাস গঠনের কাজে লাগাতে হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসগুলি থেকেই Auxiliary Sciences বা সহায়ক বিজ্ঞানগুলির উৎপত্তি। মুদ্রাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, হস্তলিপি-বিজ্ঞান, স্থাপত্যবিদ্যা জাতীয় সহায়ক বিজ্ঞানকে ছাঁকা তথ্যের আকর হিসেবে গ্রহণ করার সময় দেখা যাবে, এ-সব বিজ্ঞানের নির্মাণে বা পাঠে নির্মাতার হাতের ছাপ পড়েছে, সম্পাদকের বা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের মনের ছাপ পড়েছে। মুদ্রা, লিপি প্রভৃতির স্রষ্টাদের অভিপ্রায় বুঝতে না পারলে এবং প্রত্নতথ্যগুলিকে সওয়াল-জওয়াবের প্রক্রিয়ার মধ্যে না ফেললে সত্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তারা আশানুরূপ ফল নাও দিতে পারে। প্রত্নতথ্যগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকের মানসিক ভূমিকা গৌণ নয়। ইতিহাস রচনায় সহায়ক বলে প্রত্নতত্ত্বকে ঐতিহাসিকের ভাষায় সহায়ক বিজ্ঞান বলা হয়। প্রত্নবিদ্যাগুলির প্রত্যেকটির অবস্থান একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকায়। একটু আগেই আলোচিত অনুসন্ধান-পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণে মুদ্রা, স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতির ইতিহাস লেখা যেতে পারে। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে, লিখিত ইতিহাসের সময়সীমা অতিক্রম করে, মানুষের ইতিহাসকে বহু সহস্র লক্ষ বছর পেছনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

একটু আগে পেশকরা বক্তব্যের জের টেনে বলতে চাই, অতীতে সংঘটিত মানবীয় ক্রিয়াকর্মের এবং সেই ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার বিবরণই ইতিহাস। এ-সব ক্রিয়াকর্মের মূলে আছে উদ্দেশ্যচেতনা। এ-জাতীয় চিন্তা-চেতনার ফলেই ঘটনার বহুবিচিত্র জগৎ গড়ে ওঠে। মানুষের চিন্তা-চেতনার— তার বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঘটে যুদ্ধ-বিগ্রহে, রাজনীতিতে, দর্শনে, বিজ্ঞানে এবং সমাজ-সংস্কৃতির আরো বিভিন্ন শাখা-উপশাখায়। সেইজন্য এই বিষয়গুলি ঐতিহাসিক আলোচনার আওতায় আসে। রাজনীতি— অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতিকে সব সময়ই স্পর্শ করেছে। আবার অর্থনীতি যখন রূপান্তরিত হয়, তখন সমাজ ও রাজনীতির চেহারা ও আত্মা পালটে যায়। আঠার শতকের পশ্চিম ইয়োরোপে যখন ধনতন্ত্র দানা বাঁধতে থাকলো, তখন থেকেই পশ্চিমের রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতির বুর্জোয়া ধারাটি বিকশিত হতে লাগলো। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার রাজনীতি, সমাজ-সংগঠন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। অর্থনীতিতে উৎপাদন-ব্যবস্থার মৌলিক উপাদানগুলিতে যখন পরিবর্তন আসে তখন সামাজিক সম্পর্কেও পরিবর্তন দেখা দেয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভাঙা-গড়ার পালা আসে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস লিখতে গিয়ে পরিসংখ্যানজাতীয় বা পরিমাণবাচক উপাত্তের বিরলতার দরুন গবেষক তথ্যনির্ভর গুণগত পদ্ধতির গবেষণা-রীতি বেছে নেন। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তগুলি শুধু বিবৃতির আকারেই উপস্থাপিত করতে পারেন।

সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি কতটা মজবুত তা নির্ভর করছে ঐতিহাসিকের সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষার বিশ্লেষণীশক্তির ওপর; অর্থাৎ যথাযথ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি তাঁর প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক জবাব পেয়েছেন কিনা, তার ওপর। সিদ্ধান্তগুলিকে ঐতিহাসিক কালাকানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করেন ; নইলে ঘটনার বিবর্তনের ধারা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপগুলি যেমন কালক্রমে বদলায়, তেমনি এদের কতকগুলি টিকে থাকে। বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তন, প্রবহমানতা এবং স্থিতিশীলতা ও Overlap লক্ষ করা ঐতিহাসিকের কাজ।

পাঁচ

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস আলোচনায় অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রয়োগ তাত্ত্বিকভাবে খুব বেশি হয় নি। এই ব্যর্থতার কারণ ঐতিহাসিকদের শক্তির সীমাবদ্ধতা। সীমিতশক্তির ঐতিহাসিক যে-কাজটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির অন্যান্য বিষয়গুলির বৈশিষ্ট্যসূচক, অপরিহার্য উপাদানগুলির ওপর বেশি করে আলোকপাত করা, অবশ্য অনেকটা সংশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তার ফলে অন্তত মানুষের কৃতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তনের বিষয়টি আপেক্ষিকভাবে স্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করবে। বিবর্তনের অর্থই হচ্ছে পরিবর্তন। তবে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় lever বা চালিকাশক্তির অভাবে সমাজে Historical lag বা ইতিহাসের অসম গতি দেখা দিতে পারে। যে সব চালিকাশক্তি সামাজিক গতিশীলতা আনে সেগুলি হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার, ভূমিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধনসম্পদের সৃষ্টি এবং রাজশক্তি ও সামরিকশক্তি নিয়ন্ত্রণ। এই চালিকাশক্তিগুলির অনুপস্থিতির দরুন সমাজে গতিশীলতার অভাব দেখা দেয়।

সামাজিক গতিশীলতার অর্থই হচ্ছে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন। ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে তাত্ত্বিক পর্যায়ের কতকগুলি অভিমত গড়ে উঠেছে। সমস্যাগুলির মধ্যে আছে বর্ণপ্রথার আওতায় সামাজিক গতিশীলতার প্রশ্ন এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সম্পর্ক। মরিস ডি. মরিস ও ফুকাজাওয়ার অনুসরণে অধ্যাপক ইরফান হাবীব পেশা পরিবর্তনের দু' একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ দিয়েই বলেছেন যে, জাতিগুলি, বিশেষ করে শ্রমিক-কারিগরগণ পেশা পরিবর্তন করতে পারত- জাতিপ্রথা এক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। এ-ধরনের পরিবর্তন কি ব্যতিক্রমী সামাজিক প্রবণতা, না ব্যাপক অর্থে সামাজিক গতিশীলতার উদাহরণ ? পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির মধ্যে আমরা গতিশীলতা লক্ষ করেছি—- কারণ তাদের মধ্যে গতিশীলতা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় চালিকাশক্তি বিদ্যমান ছিল · নিম্নবর্ণের লোকজনের মধ্যে

এবং ইসলামে দীক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে সামাজিক গতিশীলতার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের কতকগুলি অঞ্চলে বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার অনুপস্থিতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শূন্যতা লক্ষ করে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সংক্রান্ত তত্ত্বটির নির্মাতাগণ এই পরিস্থিতিকে পশ্চিম ইয়োরোপের সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয় মনে করে তাঁদের নিজ নিজ মতবাদের সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়েছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, ওই সময়ে ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু ছিল। কিন্তু সম্প্রতি John S. Deyell *Living Without Silver* নামক গ্রন্থে প্রাক-মুসলিম যুগের ভারতের কয়েকটি রাজ্যে ও আফগানিস্তানে তাম্রমুদ্রা, তাম্র ও রৌপ্যের দ্রব্য এবং দ্বিধাতু মানের মুদ্রার যে ক্যাটালগ দিয়েছেন তাতে করে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিতে চিড় ধরেছে। তা ছাড়া, পশ্চিম ইয়োরোপ ও জাপান ছাড়া সামন্ততন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ অন্য কোনো দেশে ঘটে নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের মুদ্রানীতি ও মুদ্রানীতির মাধ্যমে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বাণিজ্যিক অঙ্গীকরণ সম্বন্ধে বর্তমানে যে মূল্যবান গবেষণা চলছে গ্রন্থটি তারই একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। একেবারে সাম্প্রতিককালে বেশি Subaltern Studies-এর কর্মকর্তাগণ সমাজ পরিবর্তনের চিরাচরিত তত্ত্বকে মাথার উপর দাঁড় করিয়ে একেবারে উল্লম্ব অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। বিভিন্ন তত্ত্বের সীমিত আয়ুষ্কাল সত্ত্বেও বলতে হয়, সুষ্ঠু তাত্ত্বিক কাঠামো ছাড়া রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়ার ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নয়, সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাও বুঝতে পারা যাবে না।

ইতিবৃত্তে বা প্রত্ন-উৎসে সহজলভ্য মাল-মশলা মাত্রই ইতিহাস নয়। ওই উপাদান তথ্য। সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য তথ্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনার রূপরেখা ও প্রকৃতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ঘটনার মূল্যায়ন না করলে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তন বুঝতে পারা যায় না। সে-ক্ষেত্রে ঘটনার কার্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় একটি জরুরি কাজ। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিক G.M. Trevelyan 'Clio Rediscovered' প্রবন্ধে বলেছেন,

Even if cause and effect could be discovered with accuracy, they still would not be the most interesting part of history. It is not men's evolution but his attainment that is the great lesson of the past and the highest theme of history. The deeds themselves are more interesting than their causes and effects and are fortunately ascertainable with much greater precision.

কারণ ও ফলাফল যদিও বা যথাযথভাবে নির্ণয় করা সম্ভবপর, তারা কিন্তু মানবীয় ঘটনার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ নয়। মানুষের বিবর্তন নয়, বরং তার কৃতিই অতীতের বড়ো শিক্ষা এবং ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। ক্রিয়াকর্মের কারণ ও

ফলাফল অপেক্ষা ক্রিয়াকর্মগুলিই বেশি চিত্তাকর্ষক। আর তা সৌভাগ্যক্রমে অনেক বেশি যথাযথতার সঙ্গে নির্ণয় করা যায়।

জার্মান ঐতিহাসিক Meinecke ও বলেছেন,

... modern 'synthesizers' ... treat the individual phenomenon as a mere organ and example of universal developments, which means, in practice, as a mere point of intersection for so many abstract 'isms.'

আধুনিক সংশ্লেষণকারীরা একক ঘটনাকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করে বিশ্বজনীন ঘটনার বিকাশের উদাহরণ হিসেবে ওই ঘটনাকে উপস্থাপিত করে। কার্যত তারা উক্ত ঘটনাকে এমনিভাবে কতকগুলি বিমূর্ত মতবাদের ছেদবিন্দু হিসেবে দেখে।

দুজন ঐতিহাসিকই ওপরে উদ্ধৃত কথাগুলি বলেছেন Positivism-এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে। কিন্তু ট্রেভেলিয়ান কর্তৃক উল্লিখিত ঘটনা নির্ণয় কি কার্যকারণ নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে বাদ দিয়ে সম্ভবপর? আর মানুষের কৃতিকে বুঝতে গিয়ে কি সেই কৃতির বিবর্তনের ধারাকে অস্বীকার করা চলে ? ঘটনার বিবর্তন দেখাতে গিয়ে ঐতিহাসিক সংশ্লেষণের (Synthesis) প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। ঐতিহাসিকের বস্তুনিষ্ঠতাই ঘটনার যান্ত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে সংশ্লেষণ তৈরির প্রত্যক্ষবাদী (Positivistic) প্রক্রিয়া বন্ধ করতে পারে। ইতিহাসের জগৎ থেকে Positivism-এর অপচ্ছায়া দূরে সরে গেছে। তবে এ-ক্ষেত্রে এক ধরনের Gresham's Law কাজ করতে পারে : প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিশ্বময় প্রভাবের যুগে Positivism আবার ইতিহাসের দর্শনের এলাকায় অনুপ্রবেশ করতে পারে।

ইতিহাস মানুষের চিন্তনের, তার অভিজ্ঞতার, তার ক্রিয়াকর্মের সমগ্রতার রেকর্ড। তাই ইতিহাসে স্থান পায় রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া, রাজনীতির ক্রিয়াশীলতা, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের ও মূল্যবোধের এবং যুগে যুগে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির স্বরূপ, অর্থনীতির বহুমুখী প্রবাহ এবং ধর্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা এবং মানবীয় চিন্তনের ও কৃতির চিরপরিবর্তনশীল রূপ। আপাতদৃষ্টিতে অতীত যেন মূক, বধির এবং অনন্তকালের বুকে লগ্ন এক নিরেট পাষাণ। সে অতীত ঐতিহাসিকের সংবেদনশীল বিশ্লেষণের ফলে কথা বলে। প্রিজমের সাহায্যে সূর্যালোক বিশ্লেষণের ফলে যেমন সুষ্ঠু অনুসন্ধান-পদ্ধতির মাধ্যমে তেমনি রূপরসশব্দগন্ধবর্ণের বৈচিত্র্যে প্রতিভাসিত হয়ে হালকা কুয়াশার রাজ্যে গতিশীল ঘটনা-প্রবাহের এক আশ্চর্য বর্ণালী যেন ভেসে ওঠে। অতীতের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিস্ময়কর রূপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের বাণী উদ্ধৃত করছি :

Consider all that lies in that one word Past! What pathetic, sacred, in every sense poetic, meaning is implied in it; a meaning growing ever clearer the further we recede in time. The more of the same

past we have to look through! History after all is the true poetry. And reality, if rightly interpreted, is grandeur than fiction.

সেই একটিমাত্র শব্দ 'অতীতে'র সমগ্র তাৎপর্য সম্বন্ধে ভেবে দেখুন ! শব্দটিতে কি যে বিয়োগান্ত পবিত্র এবং সকল দিক দিয়ে কাব্যিক অর্থই না নিহিত রয়েছে ! সময়ের দিক দিয়ে যতই আমরা পেছনে চলে যাই, ততই এই অর্থ স্পষ্টতর হয়— যে অতীতের ভেতরটা আমাদের অবলোকন করতে হয় সেই অতীতের অর্থ আরো স্পষ্টতা পায়। বলতে গেলে, ইতিহাস হচ্ছে একমাত্র সত্যিকার কাব্য ; আর বাস্তবকে যদি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে তা হয়ে ওঠে উপন্যাসের চেয়েও মহান।

ইতিহাস এক মহান কাব্য— তবে বিশেষ ধরনের কাব্য। ভাববাদী কবি বলেছেন,

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।

ঐতিহাসিকের চিন্তনের স্পর্শ পেয়েই ইতিহাসের ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে সে ঔজ্জ্বল্য আসে সাক্ষ্যপ্রমাণের পরীক্ষার বহু স্তর পার হয়ে। বস্তুনিষ্ঠতাই ইতিহাসের ভিত্তি।

নারীমুক্তি, বেগম রোকেয়া ও বর্তমান প্রেক্ষিত

মোতাহার হোসেন সুফী

সভ্যতার প্রাণধর্ম অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া-এগিয়ে চলা। বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ ছিল প্রকৃতির নিতান্ত অসহায় সন্তান। বিরূপ প্রকৃতি, পরিপার্শ্ব ও শত প্রতিকূলতার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে মেধা, মনন, শ্রম ও যোগ্যতার দ্বারা মানুষ ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে অগ্রগতির পথে। মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও সাধনায় উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটেছে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির। পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে উন্নত জীবনযাপনের নিরলস প্রচেষ্টায় সভ্যতার সৃষ্টি। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের জীবন অধিকতর উন্নত। মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামের ফসল মানবসভ্যতা। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মানবমুক্তির ইতিহাস।

মানবের দুটি অংশ— এক পুরুষ, দুই নারী। দেশে দেশে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী। মানবমুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ নারীমুক্তি। নারীমুক্তি ব্যতীত মানবমুক্তির সাধনার সফলতা সুদূরপরাহত। যুগে যুগে নারীমুক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করে যাঁরা অবদান রেখেছেন সেসব পথিকৃতদের অন্যতম বেগম রোকেয়া। নারীমুক্তির আদর্শে বেগম রোকেয়া ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁর কাছে নারীর মুখ্য পরিচয় নারী মানুষ। মানুষের মর্যাদা নিয়ে সর্বদা সকলক্ষেত্রে মাথা সমুন্নত রাখার জন্যে বেগম রোকেয়ার দৃপ্ত ঘোষণা— "সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ। আর কার্যত দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক। বাস্তবিকপক্ষে আমরাই সৃষ্টি জগতের মাতা।" বেগম রোকেয়ার আজীবনের সাধনা নারী সমাজের সার্বিক কল্যাণ— এক কথায় নারীমুক্তি। নারীমুক্তি তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন ও কল্পনা। তাঁর নারীমুক্তির আন্দোলন মানবমুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তি সম্পর্কিত বিশাল কর্মকাণ্ডের প্রধান তিনটি ভাগ — এক, সমাজচিন্তা, দুই, শিক্ষা আন্দোলন ও তিন, সাহিত্যচর্চা।

বেগম রোকেয়ার আবির্ভাবলগ্ন— সে এক অন্ধকার যুগ। উনিশ শতকের শেষভাগে ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জমিদার সাবির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বেগম রোকেয়া। পায়রাবন্দ গ্রাম ও জমিদার বাড়ির পরিবেশ বর্ণনা করে বেগম

১০ বর্ষ : ১২তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭

রোকেয়া বলেছেন, "........ আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ির তুলনা কোথায়? .... বাড়ির চতুর্দিকে গভীর বন, তাহাতে বাঘ, শুকর, শৃগাল— সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোন কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা "ঘুঘু", "বউ কথা কও" "ও খুকি, ও খুকি", "চোক গেল" প্রভৃতি পাখির ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের "হুয়া হুয়া ক্যা হুয়া" শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি, মাগরেবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখির "কা-অ্যা-কি-কা-আক-কু" ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি, এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশবজীবন পল্লীগ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে।" বেগম রোকেয়ার বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ের অকপট বর্ণনা— আধুনিক জীবনের সকলপ্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এক অজ পাড়াগাঁয়ে অতিবাহিত হয়েছে তাঁর শৈশবজীবন। ইংরেজ আমলে বাংলার অগণিত গ্রামের ন্যায় রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রাম ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো থেকে বঞ্চিত। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবার সাবির পরিবারে ছিল পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়ি, অবরোধের বন্ধন ছিল কঠোর। শুধু পুরুষ মানুষ নয়; অনাত্মীয়া মহিলাদের সম্মুখেও সাবির পরিবারের মেয়েদের পর্দা করতে হতো। এই পরিবারের অবিবাহিতা কোন মেয়ে এমন কি সে শিশুকন্যা হলেও তাকে বাড়ির চাকরানী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক দেখতে পেত না। পরিবারের মেয়েদের মতো বেগম রোকেয়াও তাঁর শৈশবে কার্যত ছিলেন গৃহবন্দিনী। স্বীয় শৈশবজীবনের তিক্ত স্মৃতির উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন— " অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবেমাত্র পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আমাকে স্ত্রীলোকদের হইতেও পর্দা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন কাহারও সম্মুখে যাইতে নাই, অথচ পর্দা করিতে হইত। পুরুষদের তো অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়েমানুষের অবাধ গতি— অথচ তাহাদের দেখিতে না দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ির কোন লোক চক্ষুর ইসারা করিত, আমি যেন প্রাণভয়ে যত্রতত্র— কখনও রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে কখনও কোন চাকরানীর গোল করিয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনও তক্তাপোষের নিচে লুকাইতাম।" অন্যত্র বেগম রোকেয়া বলেছেন— " অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বাড়ির চাকরানী ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোক দেখিতে পায় না।"

সাবির পরিবারে পর্দার নামে অবরোধের কঠোরতার কারণে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সকল পথ ছিল রুদ্ধ। সেযুগে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার আলোদান করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি পুরুষসমাজ। লেখাপড়া মুসলমান সমাজের এক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা বলতেন— "লেখাপড়া শিখিয়া মেয়ে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হইবে।" অভিজাত মুসলমান পরিবারের মেয়েদের ন্যায় সাবির পরিবারের মেয়েদের ধর্মীয়বিষয়ে জ্ঞানদানের জন্য আরবিভাষা শিক্ষা নয় ব্যবস্থা ছিল শুধু কুরআন পাঠ করানোর। এর

অর্থও তাদের শেখানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। মেয়েদের বাংলা কিংবা ইংরেজি বর্ণপরিচয়টুকুও শেখানো ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বাঙালি মুসলমানসমাজের অন্যান্য দুর্ভাগিনীর ন্যায় কোন বিদ্যায়তনে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাননি বেগম রোকেয়া ; তিনি যেটুকু লেখাপড়া শিখেছেন তা সম্ভবপর হয়েছে গৃহের সীমাবদ্ধ পরিসরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে। স্বীয় জীবনের বেদনাময় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বেগম রোকেয়া বলেন— "বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই, কেবল জ্যেষ্ঠভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয়-স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে থাকুক, বরং নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন— কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই।" কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ না করেও কেবল জ্যেষ্ঠভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখে সেই অন্ধকার যুগে বেগম রোকেয়ার মন কিভাবে জ্ঞানের, শিক্ষার ও স্বাধীন চিন্তার আলোকে আলোকিত হয়েছিল, সেকথা আজ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

ইংরেজ শাসনে "বিভেদ করে শাসন কর" নীতির বিষময় প্রতিক্রিয়ায় জীবনের সকলক্ষেত্রে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ছিল পশ্চাদপদ। উনিশ শতকের শেষার্ধে পুরুষসমাজের মধ্যে ধীর পদক্ষেপে জাগরণের সাড়া সৃষ্টি হতে দেখা গেলেও নারীসমাজের মধ্যে সে ধরনের চিন্তাভাবনার কোন প্রকাশ দেখা যায়নি। বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে সামগ্রীক কল্যাণের স্বার্থে পর্দার শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং শিক্ষা ও ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত নারীসমাজের দুর্গতি মোচনের প্রতি ছিল বেগম রোকেয়ার সজাগ দৃষ্টি। তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যসম্ভারে নারীসমাজের পশ্চাদপদতা ও অবনতির কারণসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। বেগম রোকেয়ার সমাজচিন্তার স্বরূপ অনুধাবন করলে দেখা যায়, তিনি গভীরভাবে এই সত্যে বিশ্বাস করতেন যে, নারী ও পুরুষ সমাজদেহের দুটি চক্ষুস্বরূপ। মানুষের দুটি চোখ; সর্ববিধ কাজকর্মের প্রয়োজনে মানুষের দুটি চোখেরই গুরুত্ব সমান। তেমনি সমাজদেহেরও দুটি চোখ নারী ও পুরুষ। একটি চোখ নষ্ট হলে যেমন মানুষের কাজেকর্মে সৃষ্টি হয় নানা বিঘ্ন, অন্তরায়, তেমনি সমাজদেহের একটি চোখ অকেজো হলে সমাজেরও উন্নতিমূলক কাজে সৃষ্টি হয় নানা বাধাবিঘ্ন, দেখা দেয় অচলাবস্থা। সমাজের এক অংশের জাগরণ ছাড়া অপরাংশের জাগরণ সম্ভবপর নয় মোটেও। বিভিন্ন দেশের সমাজপ্রগতির কারণসমূহ পর্যালোচনা করে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষের সমান ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব সমাজের সার্বিক উন্নতিসাধন। এর কোন বিকল্প নেই। বেগম রোকেয়া বলেন— "... আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ ; আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে ? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে— একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। ... জগতের যে

সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিনী, সহধর্মিনী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মন্য পুতুল জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই, একথা নিশ্চিত।"

ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে মুসলমান নারীসমাজের মধ্যে রেঁনেসা তথা পুনর্জাগরণের বাণী বহন করে এনেছেন বেগম রোকেয়া। মুসলিম নারীসমাজ স্বাবলম্বী হোক, শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞানে-কর্মে পুরুষদের মতই যোগ্যতা অর্জন করুক, সামাজিক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের মত নারীও সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম হোক— এইটিই ছিল তাঁর আত্যন্তিক কামনা। এ কারণেই বেগম রোকেয়ার কর্মজীবনের এক বিরাট অংশ অধিকার করেছিল মুসলিম নারীসমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ও সেজন্যে স্কুল স্থাপন এবং অপরদিকে সমাজে ও রাষ্ট্রে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য সমিতি গঠন- প্রথম মুসলিম মহিলা সমিতি ' আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান নারীসমাজের জন্য একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। ১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় "আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম" বা মুসলিম মহিলা সমিতি। মুসলমান নারীসমাজের পশ্চাদপদতা তথা অনগ্রসরতার কারণগুলো বেগম রোকেয়া তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে মুসলমান নারীসমাজের মধ্যে যে সমস্ত কুপ্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে, যে সমস্ত কূপমণ্ডুকতা ও গোঁড়ামী আছে সেগুলো দূরীভূত করে মুসলমান নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণও মঙ্গল সাধনের মহতী উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম।"

বেগম রোকেয়ার জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম বিশিষ্ট ক্ষেত্র ছিল এই সমিতি। সমিতির ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ততা রয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের কাহিনী। তিনি নিজেই বলেছেন "আঞ্জুমানের কাগজপত্র আলোচনা করিয়া দেখ, আমার কর্মজীবনের বহু কথা তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে।" জাতিগঠনমূলক কাজের জন্যেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম।"

যুগ যুগ ধরে মুসলিমসমাজে যে কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, সংকীর্ণ চিন্তাধারা ও অবনতির কারণসমূহ পুঞ্জীভূত হয়ে প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল, তা একমাত্র শিক্ষা প্রচারের দ্বারাই দূর করা যেতে পারে একথা বেগম রোকেয়ার কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই ছিল সত্য। অন্তর দিয়ে এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। বেগম রোকেয়ার শিক্ষাআন্দোলনের এইটিই শ্রেষ্ট বৈশিষ্ট্য। সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি এই সত্যও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শিক্ষার বিস্তার ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভবপর নয় কোনক্রমেই। দেশের বিপুল জনসমষ্টির অর্ধেক নারী। এই বিপুল জনসমষ্টিকে অশিক্ষা

ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে জাতির উন্নতি সাধন অলীক কল্পনামাত্র। দেশ ও সমাজের বিপুল কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষের যুগপৎ অংশগ্রহণ জাতীয় উন্নতির এক অপরিহার্য শর্ত। সমাজের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে শিক্ষাপ্রচারের মাধ্যমে নারীসমাজের উন্নতিসাধনের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বেগম রোকেয়া।

১৯০৯ সালের ৩ মে। বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসপিপাসু স্বামী খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন অকালে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী। প্রয়াত স্বামীর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন ও সেইসাথে শিক্ষা প্রচারের আন্তরিক আকাঙ্খায় ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবরে তিনি প্রথমে ভাগলপুরে মুসলিম বালিকাদের জন্য স্থাপন করেন একটি স্কুল। তাঁর শিক্ষানুরাগী স্বামী মৃত্যুর পূর্বে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন এবং স্ত্রী বেগম রোকেয়াকেই মনোনীত করেন ট্রাস্টি। এই বিপুল পরিমাণ টাকার জন্যেও দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন সপত্নী কন্যা ও জামাতার। ১৯১০ সালের শেষভাগে ভাগলপুর পরিত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন তিনি। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চে নতুন উদ্যমে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রী নিয়ে ১৩নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে তিনি "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের" ক্লাস শুরু করেন। ১৯৩০ সালের মধ্যেই তাঁর অসাধারণ কর্মপ্রচেষ্টায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লর্স স্কুল পরিণত হয় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমান নারীসমাজে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারই ছিল বেগম রোকেয়ার অন্তরের একান্ত কামনা।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? বেগম রোকেয়ার সুস্পষ্ট যুক্তিপূর্ণ অভিমত এই যে, অর্থ উপার্জন করা কিংবা পরীক্ষায় পাশ করা—এর কোনটিই হওয়া উচিত নয় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেহ মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। নিজেকে চেনা, নিজের পরিবেশকে জানার জন্যই প্রয়োজন শিক্ষার। একজন বিদ্যার্থীর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা, আদর্শ মানুষ, আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। বেগম রোকেয়া বলেন "... শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা Faculty দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। .... ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ মন এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনযোগসহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনযোগপূর্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতে শিখি তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাস" করা "বিদ্যা" কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।" বেগম রোকেয়ার মতে, লেখাপড়া পরীক্ষা পাসের জন্য না হয়ে জ্ঞানলাভের জন্য হওয়া উচিত। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য— মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ করে গড়ে তোলা। মেয়েদের সেই ধরনের শিক্ষাদান করতে হবে যাতে তারা সংসারজীবনে গড়ে উঠতে পারে আদর্শ

গৃহিণী, আদর্শ জননী ও আদর্শ নারীরূপে। আধুনিক জগতের বিভিন্ন জাতির মেয়েদের মতো মুসলিম মেয়েরাও যেন সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারে যথাযোগ্য স্থান। তাই শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, মেয়েদের নানাভাবে দেশের সেবা এবং পরোপকার ব্রতে উদ্বুদ্ধ করে তোলা "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" স্থাপনের ছিল মহতী উদ্দেশ্য।

জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়েও শিক্ষাপ্রচার আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন বেগম রোকেয়া। ১৯২৬ সালে Bengal Womens Educational Conference [বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সম্মেলন]- এ সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করে তিনি মুসলমানসমাজের দুরবস্থা ও শিক্ষাবিস্তারের পথে নানা প্রতিকূলতা সম্পর্কে জোড়ালো ভাষায় ব্যক্ত করেছেন স্বীয় অভিমত। তিনি বলেন, "২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজসেবা করিয়া- বিশেষত ১৬ বৎসর যাবত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালন করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে "বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।"

.... আমি আজ ২২বছর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন? সে জীব ভারতনারী। ...."

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বাঙালি মুসলমান সমাজের সমাজপতিদের রক্ষণশীল মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করে ইতিহাসের উদ্ধৃতির আলোকে উক্ত অভিভাষণে তিনি আরও বলেন— ".... সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিসর, ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্ক আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করেন নাই, বরং আমাদের ধর্মশাস্ত্রের একটি অলংঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীলোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসুল মকবুল [অর্থাৎ পয়গম্বর সাহেব]। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষা লাভ করা সমস্ত নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য। তেরশত বৎসর পূর্বেই আমাদের জন্য এই শিক্ষাদানের বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ তাহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচারণেই বংশগৌরব মনে করিতেছে। এখনও আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের কয়েকটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে— যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরআন শরীফ পাঠ ছাড়া আর কিছু— বিশেষত ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া না হয়।"

বেগম রোকেয়া নারীমুক্তি লক্ষ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে স্ত্রী-শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠান "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" স্থাপন করেছেন,

নারীসমাজের মধ্যে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা, সংঘবদ্ধতা ও ঐক্যশক্তির বোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে যেমন প্রথম মুসলিম মহিলা সমিতি "আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম " প্রতিষ্ঠা করেছেন অনুরূপভাবে শক্তিশালী ও ক্ষুরধার লেখনী ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন অনন্য সাহিত্যরাজী। ধ্রুবতারার মতো একটি লক্ষ্যের প্রতি তাঁর সমস্ত কর্ম পরিচালিত হয়েছিল— সে লক্ষ্য নারীমুক্তি। তাঁর সাহিত্য-সাধনার স্বরূপ অনুধাবন করলে দেখা যায়, নারীসমাজের পশ্চাদপদতা, অশিক্ষা, কূপমণ্ডুকতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অবরোধপ্রথার প্রতি অসহায় আত্মসমর্পণ তাঁর অন্তর মথিত করেছিল। নারীত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং নারীজীবনের মর্মন্তুদ ব্যথা তাঁর হৃদয়কে করেছিল আলোড়িত। জাতির বৃহত্তর কল্যাণকামনায় সমাজদেহের অপরিহার্য অঙ্গ নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মুক্তির জন্যে তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন প্রবল আবেগ। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যসম্ভারে।

বেগম রোকেয়া রচিত সাহিত্য পরিমাণে বিপুল না হলেও বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাঁর গ্রন্থগুলোর নাম-"মতিচূর", [১ম ও ২য় খণ্ড], Sultanas Dream [সুলতানার স্বপ্ন], "পদ্মরাগ" ও "অবরোধবাসিনী"। "মতিচূর" [১ম খণ্ড] প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। ঐ একই বছরে তিনি রচনা করেন "Sultanas Dream" পুস্তকাকারে Sultana's Dream প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৮ সালে। "মতিচূর" [১ম খণ্ড] প্রকাশের ষোল বছর পরে ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় "মতিচূর" [২য় খণ্ড]। এছাড়া প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখিকা মেরী করেলীর Murder of Delicia নামক উপন্যাসের মর্মানুবাদ করে তিনি লেখেন "ডেলিসিয়া হত্যা"। "সুলতানার স্বপ্ন" কাহিনীটি লেখিকা প্রথমে ইংরেজিতে Sultana's Dream লিখে পরে নিজেই অনুবাদ করেছিলেন বাংলায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, "ডেলিসিয়া হত্যা" এবং "সুলতানার স্বপ্ন" কাহিনী দুটি "মতিচূর" [২য় খন্ড] গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বেগম রোকেয়ার এক স্মরণীয় কীর্তি। এছাড়া বেশ কতকগুলো কবিতা, প্রবন্ধ ও রসরচনা বেগম রোকেয়া লিখেছেন যেগুলো সন্নিবিষ্ট হয়নি কোন গ্রন্থে।

বেগম রোকেয়ার "মতিচূর" [১ম খণ্ড] গ্রন্থের "স্ত্রী জাতির অবনতি", "সুগৃহিণী", "গৃহ", "অর্ধাঙ্গী", " বোরকা" প্রভৃতি প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও অধঃপতিত অবস্থা, সমাজে প্রচলিত অমানবিক নানা প্রথা নারীজাতিকে কিভাবে পঙ্গু করে রেখেছে এবং সমাজের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণে নারীর ভূমিকাই বা কি- সে সম্পর্কে বেগম রোকেয়া স্বীয় যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেছেন জোরালো ভাষায় অকুণ্ঠচিত্তে। "বোরকা" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সঙ্কুচিত হইয়াছে। ...... আমরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবেনা। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকল প্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।"

"মতিচূর" [২য় খণ্ড] গ্রন্থের "জ্ঞানফল", "নারীসৃষ্টি", "নার্স নেলী", "শিশুপালন", "সুলতানার স্বপ্ন", "ডেলিসিয়া হত্যা", "মুক্তিফল", "সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধরাজীও নারীমুক্তি সম্পর্কিত। "জ্ঞানফল" ও "মুক্তিফল" রূপকথা দুটির মূল বক্তব্য : নারীজাতিকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে সমাজের কীরূপ ক্ষতি হয়- তা পাঠক-পাঠিকাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সেইসাথে দেশের কল্যাণসাধনের জন্য নারী-পুরুষ উভয়কে আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করা। "ডেলিসিয়া হত্যা" রচনায় পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত ও নিগৃহীত নারীর আর্ত হৃদয়ের এবং "নার্স নেলী" রচনায় নারীকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখলে তার ফলাফল কীরূপ বিষময় হয়— অঙ্কিত হয়েছে তার মর্মস্পর্শী চিত্র। "সুলতানার স্বপ্ন" রচনায় লেখিকা স্বপ্নে দেখেছেন এক অপূর্ব, অদ্ভুত নারীরাজ্যের। সেই রাজ্যের নাম "নারীস্থান"। সেই স্বপ্নরাজ্যে পুরুষ পর্দার অন্তরালে গৃহকোণে আবদ্ধ। কিন্তু এতে পুরুষ বিদ্বেষের কোন পরিচয় নেই। আর নারীরা এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রকৃতিকে বশীভূত করে আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করেন। সুযোগ দেয়া হলে নারীরা বিদেশী আক্রমণের মোকাবিলাই শুধু নয় দেশরক্ষা ও রাজ্যশাসনের গুরু দায়িত্ব পালন করতেও সক্ষম। বাংলার নারীসমাজকে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা দানের জন্য লেখিকা নারীত্বের উচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছেন "সুলতানার স্বপ্ন" রচনায়।

"পদ্মরাগ" উপন্যাসে লতিফ আলমাস ও জয়নাব ওরফে সিদ্দিকার ভাগ্যবিড়ম্বনার কাহিনীর পাশাপাশি রূপায়িত হয়েছে ভাগ্যলাঞ্ছিতা অসহায়া কতিপয় রমণীর খণ্ড ক্ষুদ্র কাহিনী। উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা লেখিকার মানসকন্যা। নারীমুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ সিদ্দিকা। সিদ্দিকার দৃপ্ত ঘোষণা— "আমি সমাজকে দেখাইতে চাই একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।" ভাগ্যাহতা নারীদের সাবলম্বী হয়ে অর্থনৈতিক দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তিকে স্বীয়জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা। মানুষকে ধর্ম কিংবা সম্প্রদায় ও গোত্রের ভিত্তিতে নয়— মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দানের পক্ষপাতী ছিলেন বেগম রোকেয়া। "পদ্মরাগ" উপন্যাস অঙ্কিত তারিনী ভবন বিদ্যালয় মানবমিলনের একটি আদর্শ স্থান। চিত্রটি এরূপ :

"বিদ্যালয় বিভাগে ব্রাহ্মণ, হিন্দু, খ্রিস্টান শিক্ষয়িত্রী তো ছিলেনই। ক্রমশ মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের ধর্মশিক্ষার জন্য দুই তিনজন মুসলমান শিক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করা হয়।" তারিনী ভবন বিদ্যালয়ে "... নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিনী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।" "পদ্মরাগ" উপন্যাসের নিবেদন অংশে ধর্ম সম্পর্কে লেখিকার অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ধর্ম একটি ত্রিতল অট্টালিকার নগর। নিচের তলে অনেক কামরা হিন্দু-ব্রাহ্মণ, শুদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা; মুসলমান-শিয়া, সুন্নী,

হানিফী, সাফী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়; ঐরূপ খ্রিস্টান- রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি। তাহার উপর দ্বিতল দেখ, কেবল মুসলমান— সবই মুসলমান ও হিন্দু- সবই হিন্দু ইত্যাদি। তাহার উপর ত্রিতলে উঠিয়া দেখ— একটি কক্ষ মাত্র, কামরা বিভাগ নাই, অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু, কিছুই নাই— সকলে এক প্রকার মানুষ এবং উপাস্য কেবল এক আল্লাহ। সূক্ষ্মভাবে ধরিতে গেলে কিছুই থাকে না— সব "নাই" হইয়া কেবল আল্লাহ্ থাকেন।" ধর্ম সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্বচ্ছ, উদার ও মানবিক। উদার মানবিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল তাঁর শিল্পীমানস। কোন ভেদবুদ্ধি ও সংকীর্ণ চিন্তাধারা তাঁর শিল্পীমানসে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি একজন মানবতাবাদী। এর পরিচয় তাঁর সকল রচনার ন্যায় "অবরোধবাসিনী" গ্রন্থেও ছড়িয়ে রয়েছে। একদা অমানবিক অবরোধ-প্রথায় পিষ্ট হয়ে নারী নানাভাবে নির্যাতিত, মানুষের মর্যাদা নিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত, মনুষত্ববোধ থেকেই বা কিভাবে বিচ্যুত হয়েছে "অবরোধবাসিনী" গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে সেই মর্মস্পর্শী দিকের প্রতিই লেখিকা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। মৃত্যুবরণের পূর্বমুহূর্তেও বেগম রোকেয়ার মন ও মানস নারীকল্যাণ ও নারীমুক্তির চিন্তা-চেতনায় ছিল সক্রিয়। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বরের ভোররাত্রে তিনি ইহজগত থেকে গ্রহণ করেন চিরবিদায়। সেই রাতেও ১১টা পর্যন্ত টেবিলে বসে তিনি লেখার কাজ করেছেন। পেপারওয়েটের নিচে তাঁর লেখা যে অসমাপ্ত রচনাটি পাওয়া গেছে তার নাম "নারীর অধিকার।" এটি বেগম রোকেয়া রচিত প্রবন্ধাবলীর সর্বশেষ প্রবন্ধ। বিবাহ পুরুষ ও নারীর ধর্মানুমোদিত বৈধ সুসম্পর্ক। অথচ বিবাহের নিয়মাবলীর মধ্যে দেখা যায় নানা ত্রুটি। বিবাহসম্পর্ক স্থাপনে পুরুষের প্রাধান্য। পুরুষের একতরফা স্ত্রী তালাক ও বহুবিবাহ নিন্দনীয় সামাজিকপ্রথা। অনেকক্ষেত্রে দেনমোহরানার ওপর ধর্মানুমোদিত নারীর অধিকার রক্ষকবচ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে হয় পদদলিত। পুরুষের ব্যক্তিস্বার্থে মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন হয় বিবাহসম্পর্ক, ভেঙে গুড়িয়ে যায় বিবাহিত নারীর সাধেরসংসার। সকল সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়া ছিলেন ক্ষমাহীন। বিবাহবিচ্ছেদ যাতে স্বামীর খেয়াল খুশিতে না হয় এবং এ ব্যাপারে স্ত্রীরও যাতে মতামত প্রকাশের সমান অধিকার থাকে সেজন্য মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষুরধার লেখনী ধারণ করে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন বেগম রোকেয়া।

বেগম রোকেয়ার পরলোকগমনের পর অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল হয়েছে অতিক্রান্ত। বিশ্বপরিসরে আজ ব্যাপকতা লাভ করেছে নারীআন্দোলন। নারীঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বপর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নারী সম্মেলন। ১৯৭৫ সালে বিশ্বনারীদশক ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বনারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা করা হয়। বিশ্বনারী অধিকার প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন বৃহত্তর ব্যাপ্তি লাভ করে ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের বেইজিং শহরে অনুষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ আয়োজিত চতুর্থ বিশ্ব নারীসম্মেলন। এই

সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে পৃথিবীর ১৮০টি দেশের প্রায় ২০ হাজার প্রতিনিধি। এই সম্মেলনের মুখ্য কর্মসূচি— সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। বিশ্বের নারীসমাজের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ এই সম্মেলন। নারী-পুরুষের সম্পর্ক এবং নারীর সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্মেলনে গ্রহণ করা হয় নানা প্রস্তাবনা। বিশ্বপরিসরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চলছে আন্দোলন— এটি নিঃসন্দেহে আশার লক্ষণ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নারীর অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পৃথিবীর অনুন্নত দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও জনসংখ্যার অর্ধেক নারীসমাজের পশ্চাদপদতা দুঃখজনক। নিরক্ষরতার হার অত্যন্ত ব্যাপক। গ্রাম গ্রামান্তরের বিপুলসংখ্যক নারী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। জীবনের প্রায় সকলক্ষেত্রে নারী আজও বৈষম্যপীড়িত। দারিদ্র্যের দুঃসহ ভার আজো বেশি বহন করতে হয় নারীকে। একই ধরনের শ্রম দান করে ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত নারী। তারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার। নারীকে সহ্য করতে হয় পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন। যৌতুকের কারণে আজো নিহত হয় নারী। ক্ষেত্রবিশেষে এসিড নিক্ষেপ করে শরীর ঝলসে দেয়া হয় এমনকি গায়ে আগুন লাগিয়ে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে মারা হয়। ধর্ষণের শিকার হলে আইনের ফাঁকফোঁকরে ন্যায্য বিচার পায় না ধর্ষিতা নারী।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সনাতনী ধ্যানধারণা, জীবনাচরণ, অশিক্ষা ও অসচেতনতার কারণে ন্যায্যঅধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে নারীসমাজ। সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার কারণে নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও নারীনির্যাতন রোধে কিছু কিছু আইন প্রণীত হলেও সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও সদিচ্ছার নিতান্ত অভাব। গোঁদের ওপর বিষফোঁড়ার ন্যায় মৌলবাদের উত্থানে নারীমুক্তির পথে সৃষ্টি হয়ে চলেছে নানা অন্তরায়। ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে হরণ করা হয় নারীর মানবিক অধিকার।

বর্তমান দেশজ প্রেক্ষাপটে মাথা চাড়া দিয়েছে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রশ্ন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর পশ্চাদপদতা কাটিয়ে ওঠার জন্য, নারীর প্রতি সকলপ্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। নির্যাতিতা, নিগৃহীতা অসহায়া নারীকে সহায়তা প্রদান, প্রয়োজনে আইন সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়ন, নারীসমাজের মধ্যে ন্যায্য অধিকার আদায় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের জন্য নারীআন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা আজো নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বাংলাদেশ একটি বিশাল গ্রাম— অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ। জনসমাজের অর্ধেক নারীসমাজের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রাপ্য মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের জন্য আজো প্রয়োজন সচেতনতা সৃষ্টি। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত সংগ্রাম।

নারীমুক্তি আন্দোলনে নারীবাদ বহু আলোচিত এক বিষয়। পাশ্চাত্যের নারীআন্দোলন নারীবাদের দ্বারা প্রভাবিত। পাশ্চাত্যের নারীবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ভোগবাদ। জীবনকে

উপভোগের লক্ষ্যে নারীবাদীদের সোচ্চার দাবি— "আমার শরীর আমার নিজের।" নারীবাদীরা নারী ও পুরুষের অবাধ যৌনমিলনে বিশ্বাসী। এতে ধর্মসম্মত বিবাহবন্ধনের নেই কোনো স্বীকৃতি। নারীবাদীদের কাছে সন্তানের পিতৃপরিচয় কোন বিষয় নয়। ভ্রূণ হত্যা ও কুমারী মাতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামে রত পাশ্চাত্যের নারীবাদীরা।

পাশ্চাত্যের নারীবাদের বৈশিষ্ট্য বিচারে বেগম রোকেয়া কি নারীবাদী? পাশ্চাত্যের নারীবাদের দ্বারা তিনি কি প্রভাবিত হয়েছেন? তাঁর নারীবাদের স্বরূপ কি? বেগম রোকেয়ার নারীবাদের স্বরূপ আলোচনায় গবেষক হুমায়ুন আজাদ "নারী" গ্রন্থে "পুরুষতন্ত্র ও রোকেয়ার নারীবাদ" অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন, "রোকেয়া কোনো বিশেষ ধর্মকে বাতিল করেন নি, বাতিল করেছেন সব ধর্মকেই।" [নারী— হুমায়ুন আজাদ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ২৮]। এই যুক্তির সপক্ষে ধর্ম সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার একটি মন্তব্য গবেষকের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত আবদুল কাদির সম্পাদিত বেগম রোকেয়া রচনাবলী [প্রথম পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ১১] থেকে ধর্ম সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মন্তব্যের উদ্ধৃতি :

... "আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনো মাথা তুলিতে পারি নাই। ... যখনই কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়োছেন, অমনিই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাত তাঁর মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। ....

.... আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ...এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে- কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর- প্রেরিত কিনা, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। ..... "ধর্ম" শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। .... — [নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২১৬-২১৮ পৃ:]

উদ্ধৃতাংশকে ভিত্তি করে ধর্ম সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা ও নারীবাদকে প্রতিষ্ঠাদানের প্রয়াস লক্ষ্যযোগ্য। এ প্রসঙ্গে গবেষক ও আলোচকদের একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রথমে "আমাদের অবনতি" প্রবন্ধে সংযোজিত উদ্ধৃত অংশ পরবর্তীতে "স্ত্রী জাতির অবনতি" প্রবন্ধে পরিবর্জন করেছেন বেগম রোকেয়া নিজে। রোকেয়া রচনাবলীর সম্পাদক আবদুল কাদিরেরও রয়েছে স্বীকৃতি। তাই বেগম রোকেয়ার বাতিল উদ্ধৃতিকে ভিত্তি করে তাঁকে ধর্মদ্রোহিনী ও নারীবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠাদানের প্রয়াস কতখানি যুক্তযুক্ত তা বিবেচ্য।

বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারার উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যসম্ভারে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয় বরং বলা সঙ্গত ক্ষোভ এবং তাতে নেই ধর্মের প্রতি কোন বিদ্বেষ। নারীমুক্তি সম্পর্কিত রচনাবলীর কোথাও তিনি ধর্মকে অস্বীকার করেননি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজ ধর্মের প্রতি ছিলেন অনুগত। তাঁর নিজের কথা, "কোন বিশেষ

ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে সামাজিক আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন।" [প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা- ১১]

তিনি ধর্মের মূলমন্ত্রকে গ্রহণ করে খোলসকে বর্জন করার দিয়েছেন তাগিদ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের কর্তৃত্ব দৃঢ় বলে ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষ প্রভুত্ব বিস্তার করে রমণীর ওপর। ধর্মগ্রন্থে নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দান করা হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার বাস্তবায়ন দুরূহ। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধর্মের অপব্যাখ্যা ও ধর্মের বাড়াবাড়িকে বেগম রোকেয়া করেছেন ঘৃণা। আপন ধর্ম তো নয়ই অন্য কোন ধর্মের প্রতি বেগম রোকেয়ার ছিল না কোন বিদ্বেষ। তাই যৌক্তিক নয় তাঁকে ধর্মদ্রোহিনী অভিধা প্রদান। নারীমুক্তির জন্য ধর্ম ও সমাজ বন্ধনকে অস্বীকার করে নারীকে প্রদর্শনীর সামগ্রীতে পরিণত করতে চান নি তিনি। তাঁকে পুরুষতন্ত্রের ও পুরুষ প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী বলে তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার যে প্রয়াস চালানো হয় তা যেমন যুক্তিযুক্ত নয় তেমনি গ্রহণযোগ্যও নয়।

পাশ্চাত্ত্যের নারীবাদের সঙ্গে প্রাচ্যের নারীবাদের রয়েছে সুপ্রচুর পার্থক্য। পাশ্চাত্ত্যের সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবনযাপন সম্পর্কিত ধ্যানধারণার সঙ্গে প্রাচ্যের সমাজজীবন ও পারিবারিক জীবনযাপন সম্পর্কিত ধ্যানধারণার রয়েছে বিপুল পার্থক্য। বেগম রোকেয়ার মানসজগতের স্বরূপ নির্ণয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাশ্চাত্ত্যের নারীবাদের কোন প্রভাব পড়ে নি তাঁর মন ও মানসে। তবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীমুক্তি চেতনার প্রসার হয় নারীবাদের বৈশিষ্ট্য তাহলে বেগম রোকেয়াকে নারীবাদী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তাঁর নারীবাদের প্রকৃতি ভিন্ন— রয়েছে স্বাতন্ত্র্য। নারীমুক্তির সাথে সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ডে বেগম রোকেয়ার যে পরিচয় পরিস্ফুট সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে তাঁকে। বেগম রোকেয়া নারীমুক্তির যে আদর্শ রচনা করেছেন তা বাংলাদেশের নারীসমাজকে আজো দেয় দিকনির্দেশনা— দেয় পথের সন্ধান। বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা তথা নারীমুক্তির দর্শন হোক মানবমুক্তির আলোকবর্তিকা।

তথ্যসূত্র

১. রোকেয়া জীবনী, শামসুন নাহার মাহমুদ, প্রথম স্কুল সংস্কারণ, নভেম্বর, ১৯৫৮
২. নারী— হুমায়ুন আজাদ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
৩. বেগম রোকেয়া রচনাবলী— সম্পাদনা, আবদুল কাদির, প্রকাশক বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, মার্চ, ১৯৯৩।
৪. বেগম রোকেয়া : জীবন ও সাহিত্য- মোতাহার হোসেন সুফী, প্রকাশক— দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৬।

[*শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক, 'শিক্ষাবার্তা' সম্পাদনা পরিষদের সদস্য।*]



১৯৮৭-৯৭

নির্বাচিত রচনা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

এ. এন. রাশেদা সম্পাদিত

•

প্রকাশক
শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা

সম্পাদক
এ.এন.রাশেদা
২৮/৫ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০৪
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

অক্ষর বিন্যাস
যথাশব্দ কম্পিউটারস্
১২৪/এ আজিজ সুপার মার্কেট (দোতলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রাপ্তিস্থান
বইপত্র, পাঠক সমাবেশ, জনান্তিক
আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

মূল্য
শোভন- ২৫০ টাকা
সুলভ - ২১০ টাকা
বিদেশে - $ ১৫

মুদ্রণে
রিকো প্রিন্টার্স
৯, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫। ফোন ঃ ৫০০৭১৮

ISBN 984-31-0174-0

Editor : A.N. Rasheda. **First Edition :** Falgun 1404. February 1998. **Distributor :** Jatio Sahitya Prakashany, 21/1 Purana Paltan, Dhaka-1000. **Price :** $ 15. **Publisher :** Shikkhabarta Prakashana. 28/5 BUET, Dhaka-1000.

উৎসর্গ

শিক্ষার নৈতিকতা সমুন্নত রাখার সংগ্রামে নকলবাজ ও সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত ও লাঞ্ছিত শিক্ষকদের উদ্দেশে নিবেদিত —

জয়ন্ত কুমার দে (নিহত) প্রভাষক , সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ। জগলুল হায়দার (অপমানজনিত ও মানসিক আঘাতে অকাল-প্রয়াত), প্রভাষক, সরকারি আলীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা। ইয়াহিয়া ইসলাম মিয়া, অধ্যক্ষ, রাজবাড়ি সরকারি কলেজ, রাজবাড়ি। অতুল চন্দ্র চন্দ, সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।

সম্পাদকের কথা

১৯৯৭-এর ডিসেম্বরে উদ্‌যাপিত হল 'শিক্ষাবার্তা'-র দশ বছর পূর্তিউৎসব। উৎসবের অনুষ্ঠানমালায় ছিল : ১. ২৭ ডিসেম্বর '৯৭ — দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষাপ্রসার : সমস্যা ও সমাধানের পথ' শীর্ষক সেমিনার, ২. শিক্ষকদের পেশাগত মান-উন্নয়ন কর্মসূচি (২৫-২৭ ডিসেম্বর '৯৭) এবং ৩. দশ বছরের প্রকাশিত নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহ নিয়ে সঙ্কলন প্রকাশ।

ইতোমধ্যে সব কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গ্রন্থপ্রকাশের নিমিত্তে দশবছরের বিপুল প্রবন্ধরাজির মধ্য থেকে যে-সব প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়েছিল তা খুব সুচিন্তিত ছিল বলে দাবি করা যাবে না। তবে একটা সময়কে ধরে রাখার জন্য অর্থাৎ এই সময়কালে যে-সব ঘটনা ঘটেছে এবং যে-চিন্তাভাবনা ও দেশের শিক্ষক, শিক্ষাবিদরা করেছেন এবং শিক্ষবার্তার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রবন্ধ কিছু আলোচনা (যা ইতঃপূর্বে আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ে মুদ্রিত হয় নি) — তা এই প্রবন্ধসঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এভাবেই নির্বাচন করেছিলাম বেশ কিছু প্রবন্ধ, তবে একটি খণ্ডে সবগুলোর স্থান সঙ্কুলান হয় নি। তাই দু-খণ্ডে প্রবন্ধসমূহ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ২৭ ডিসেম্বর। সেদিনই আমাদের ঘোষণা ছিল যে দ্বিতীয় খণ্ড ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হবে। সেভাবেই কাজ শুরু হয়েছিল। নানা ঝামেলা সত্ত্বেও দ্বিতীয় খণ্ড যথাসময়ে প্রকাশ করা গেল।

দেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বাড়ছে। গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে পাঠকের সংখ্যাও। কিন্তু সৃষ্টিশীল, চিন্তাধর্মী পাঠকের সংখ্যা আর কতটুকুই-বা বেড়েছে! শিক্ষামূলক, চিন্তামূলক বই তেমন বিক্রি হয় না। যাঁরা শিক্ষকতা পেশায় আছেন, যাঁদেরকে জ্ঞানের দিশারি বলা হয় তাঁদের মধ্যেও জানার আগ্রহ, বই কেনার আগ্রহ কম।

তবুও গর্ব করার মত 'শিক্ষাবার্তা'-র কিছু আছে। শিক্ষাবার্তা বিশাল শিক্ষক-সমাজের মাঝে সামান্য হলেও কিছু পাঠক তৈরি করতে পেরেছে। লক্ষণীয়, যাঁরা সরকারি কলেজে শিক্ষকতায় আছেন, তাঁদের বুনিয়াদি ট্রেনিংকালে 'শিক্ষাবার্তা'-র চাহিদা বাড়ে ওই কদিনের জন্য, হয়ত টার্ম-পেপার তৈরির তাগিদে কিন্তু শিক্ষক-সমাজের মাঝে সব সময় চিন্তাভাবনার তাগিদ থাকলে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভাবনার তাগিদও গড়ে উঠত; নাড়া পড়ত ছাত্রসমাজের মাঝেও। শিক্ষকরা তখন সংগঠিতভাবে সৃজনশীল কর্মে ছাত্রসমাজকে যেভাবে পরিচালিত করতে চাইতেন, যেভাবে সচেতন করতে চাইতেন — তা পারতেন। কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকই এ বিষয়ে সম্যক উদ্বুদ্ধ নন। তাই দেশকে বিংশ-শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য — উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে

তোলার কাজে শিক্ষক-সমাজ যে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারতেন, বর্তমানে তা পারছেন না। অধিকাংশ শিক্ষক-সংগঠনের কাছে — শিক্ষকদের জ্ঞান ও চেতনা সৃষ্টি মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আর্থিক দাবি আদায়ে সোচ্চার হওয়াটাই মুখ্য ।

দশ বছর আগে শিক্ষাব্যবস্থার নানা দুর্বলতার দিক চিহ্নিত করার, শিক্ষক-সমাজকে অধিকার ও কর্তব্য সচেতন করার এবং সমাজপ্রগতির চিন্তাভাবনায় একনিষ্ঠ করার দায়িত্ব নিয়ে যে 'শিক্ষাবার্তা'-র যাত্রা শুরু হয়েছিল — তার দশ বছর পূর্তি-উপলক্ষে দু-খণ্ড নির্বাচিত রচনা শিক্ষানুরাগীদের অন্তত কিছুটা আলো দেখাতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক দ্বিজেন শর্মা, অধ্যাপক মোতাহার হোসেন সুফী, ড. সত্যব্রত রায় এবং সার্বক্ষণিকভাবে আমার জীবনসঙ্গী ড. গোলাম মহিউদ্দীন। স্নেহাশীর্বাদ জানাচ্ছি প্রুফ দেখতে সাহায্যের জন্য উত্তমকুমার রায় এবং বার-বার প্রুফ সংশোধনের জন্য যথাশব্দ কম্পিউটারস্-এর কম্পোজিটর গিয়াস উদ্দিন, গণেশ হাওলাদার ও মজিবুল হককে। মুদ্রণপ্রমাদ তারপরও রয়ে যাবে নিশ্চিতই। ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে যে দেখবেন আপনারা সে বিষয়ে আমার ভরসা আছে।

সূচিপত্র

বিশ্ববিদ্যালয়, নানাদিক থেকে বঞ্চিত খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রয়োজন ও আন্দোলনের ফল। এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয় মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান পড়ে থাকে এবং ভবিষ্যতেও পড়তে চাইবে। প্রশ্ন হলো যারা এতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন ও গবেষণা করতে চায় তারা সে-সুযোগ পাবে কোথায়? দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে। সেজন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক এবং দেশীয় প্রয়োজনে মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ চালু করা দরকার। বিজ্ঞান গবেষণার সাথে সাথে মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণাও দেশের স্বার্থে প্রয়োজন। মনে হয় প্রাথমিক পর্যায় থেকেই এই দুটি অনুষদ চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিরাট কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে না। যেহেতু সরকারি বিএল কলেজে মানববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনার্স ও কোনো কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স পড়ানো হয় সে কারণে ঐ কলেজে এবং স্থান সংকুলান না হলে অন্য কলেজে এই দুটি অনুষদ চালু করা যেতে পারে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও এভাবে তার কার্যক্রম শুরু করেছিল।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে সব প্রত্যাশার কথা বলা হলো তা একা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পূরণ করা সম্ভবপর নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হলো শিক্ষা দান করা। কিন্তু কেবল শিক্ষাদানে পূর্ণতা পায় না, যতক্ষণ না জীবনে তা প্রয়োগ করা যায়। সে দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, দেশের সরকারের। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বা পরিবেশ, বন ও উড টেকনোলজি পড়ে কাউকে যদি ব্যাংকে কলম পিষতে হয় তাহলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে প্রত্যাশার কথা বলা হলো তা কেবলই কথার কথা হয়ে দাঁড়াবে।

শেষে আরেকটি কথা। মানবোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা সম্পর্কে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে প্রত্যাশার কথা বলা হলো, প্রশ্ন উঠতে পারে, সে-প্রত্যাশা তো দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই। কথাটি মিথ্যে নয়। তবে যেহেতু দেশের পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গতানুগতিক ধারায় চলছে আর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু হতে যাচ্ছে একেবারের প্রাথমিক পর্ব থেকে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য সাহেবও বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন লালন করছেন, সে কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে শিক্ষক সমাজের একটু বেশি প্রত্যাশা।

[অধ্যাপক, *সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা।*]

শিক্ষা-সংস্কার প্রসঙ্গ

এম. শহীদুল্লাহ

আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সুদীর্ঘকাল ধরেই বহুলভাবে আলোচিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতা লাভের আদিলগ্ন থেকে এমনকি তারও বহুপূর্ব থেকেই আমরা যে বিভিন্ন রকম সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছি সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি এ কথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে বিভিন্ন সংস্কারের উপলব্ধি থেকেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা এবং এ পথ বেয়েই এসেছে আমাদের বহুল প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সমস্ত সংস্কার আজও পর্যন্ত পুরোপুরি সাধিত হয় নি – পূরণ হয় নি আমাদের সাধ; অর্জিত হয় নি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল। অনেক সময় অনেকেই সরব ও মুখরোচক আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংস্কার প্রসঙ্গে। অনেক নরম-গরম আলোচনা হয়েছে এসব নিয়ে বলতে গেলে কথায় সংস্কারের বুলি কপচানো আজ একরকম ফ্যাশনেই পরিণত হয়েছে। সংস্কারের কথা না বললে লোক ভোলানো বক্তৃতা করা যায় না, কাগজে, সাপ্তাহিকে বা জার্নালে কোন লেখা ছাপা হয় না। সংস্কার প্রসঙ্গে বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে কলামের পর কলাম, পাতার পর পাতা লেখা হয়েছে। এ বিষয়ে শত সহস্র সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সর্বত্র, সবারই মুখে কম-বেশি উচ্চারিত হতে শোনা যায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা প্রভৃতি সংস্কার আমাদের জীবন জীবিকা তথা অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতার সর্বোচ্চ মহল থেকেও সিদ্ধান্ত এসেছে। সরকারিভাবে উদ্যোগও নেয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বারংবার কমিশন গঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে। কিন্তু উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আজও পর্যন্ত চোখে পড়ে না। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম, অরাজকতা আমাদের দৈনন্দিন সমাজ চিত্র; রাজনৈতিক নৈরাজ্য, ব্যালটচুরি, শক্তি প্রয়োগ, বোমাবাজি, খুনখারাবী আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রাত্যহিক ছবি; মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যেরর ঊর্ধ্বগতি, জীবনযাত্রার মানোবনতি, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অন্যতম চিত্র; মুখস্থ নির্ভরতা, গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা, নকল, কারচুপি প্রভৃতি শিক্ষাজগতের অতি পরিচিত দৃশ্য। এসব

৩য় বর্ষ : ৩য় সংখ্যা, মে-জুন ১৯৯০

থেকে মুক্তির কথা বিবেকবান মাত্রই অনুধাবন করছেন। সবাই তিলে তিলে অনুভব করছেন সংস্কার ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কিন্তু কীভাবে অর্থবহুল কোন সংস্কার সম্ভব তা কেউই সে রকমভাবে বলছেন না। কাজেই অবস্থার সত্যিকার কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। শিক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গটিই এ প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য-বিষয় আর সেজন্যই শুধু এ বিষয়ের মধ্যেই এ প্রবন্ধের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা হয়েছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রেও সমস্যা বিজড়িত একটি ক্ষেত্র যেখানে জাতীয় অগ্রগতির জন্য সংস্কার অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রেও কিছু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বহুদিন ধরেই আলোচনা হয়ে আসছে। স্বাধীনতার পূর্ব ও পরে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশনও গঠিত হয়েছে। বিভিন্নভাবে প্রস্তাবও এসেছে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধনের জন্যে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমের পরিবর্তে বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়ার সুপারিশ করা হয়েছে, স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। ইংরেজি ভাষাকে একবার নির্বাসন দিয়ে আবার পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে, এসব শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টারই ফল। এছাড়াও বলা হচ্ছে যে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত রাখতে হবে, ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে— এবং রাজনীতি-মুক্ত থেকে শুধু পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে হবে ছাত্রদের। শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এতে কি শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত কোনো পরিবর্তন সাধিত হবে? বস্তুত সমস্যার গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে, কিছুটা গৌণ বিষয়কেই প্রধান করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ফলে সমস্যা যা ছিল তা-ই রয়ে গেছে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এসব করেও যদি কোন পরিবর্তন না এসে থাকে তাহলে কিভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব? এর উত্তরে একথা বোধ হয় স্পষ্ট করেই বলা যায় যে শিক্ষাক্ষেত্রে কোন রকম অর্থবহুল পরিবর্তন আনতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার উপাদানগুলিকে খতিয়ে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে উপাদানগুলিতে পরিবর্তন সাধন করতে হবে। প্রথমেই দেখতে হবে শিক্ষা বলতে কি বুঝায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সে উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হচ্ছে, যদি না হয় তাহলে কীভাবে তা সম্ভব ইত্যাদি।

একথা তো সর্বজনবিদিত যে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন এবং মেধার বিকাশ। শিক্ষার্থীর নিজ প্রতিভাশক্তির স্ফূরণ ঘটানো ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে তার নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ ও অন্বেষণী শক্তির বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়ে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলাই শিক্ষার অন্যতম কাজ। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর কথায় বলা যায় যে, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে 'the highest and most harmonious development of an individual's powers to a complete and harmonious whole.' এই development-ই জীবনের লক্ষ্য, আর এ লক্ষ্য অর্জনের সহায়তা করাই শিক্ষার কাজ। অতীতের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাথে পরিচিত

হয়ে, নিজস্ব চিন্তাশক্তি, বিচার-বুদ্ধি, প্রতিভা ও অনুধাবন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে লব্ধ পুরাতন জ্ঞানের বিচার, বিশ্লেষণ, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে শিক্ষার্থী যাতে নতুনের উদ্ভাবন করতে পারে, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে পারে — সেটাই শিক্ষার কাজ।

একথা তো সত্য যে নিজস্ব বিচারশক্তিই মানুষকে বিশেষত্ব দান করে এবং তাকে স্বতন্ত্র মহিমায় বিভূষিত করে। শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন সেই শক্তির স্ফূরণ ও বিকাশ ঘটাতে পারে এবং বিকশিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা যেন জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে পারে, জ্ঞান বিজ্ঞানকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে, নতুন নতুন সত্যের আবিষ্কারে ব্রতী হতে পারে, সে লক্ষ্যেই শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। T. H. Huxley-র কথায় বলা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে— to carry the interpretation of Nature a step further than his predecessors.এটা সম্ভব শুধু সেই শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে শিক্ষার্থীর মানসিক ও নৈতিক শক্তি ও বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ ও চর্চার সুযোগ আছে। তোতার মত অন্যের শেখানো বুলি আওড়ানোও কোন কিছুকে বিনা শর্তে গ্রহণ করার নাম শিক্ষা নয়, বরং এর অর্থ নিজস্ব শক্তির বলিদান। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ অবস্থাই আজ আমাদের দেশে বিরাজিত। প্রতিটি জিনিসকে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর নিজের নিরিখে তার গুণাগুণ বিচার করে তারপর তার গ্রহণ,বর্জন বা প্রয়োজনবোধে তার পরিবর্তন করা একজন শিক্ষার্থীর অন্যতম কাজ। মিলের মতে একজন শিক্ষার্থী 'must use observation to see, reasoning and judgement to forsee, activity to gather Materials for decision, discrimination to decide and when he has decided, he needs firmness and self control to hold to his deliberate decision.'

এ লক্ষ্য সাধন করতে হলে শিক্ষাদান বা গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি উপাদানকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। শিক্ষাদান, (teaching) শিক্ষাগ্রহণ (learning) এবং মূল্যায়ন (testing) শিক্ষাব্যবস্থার এ তিনটি মৌলিক উপাদানের প্রকৃতির উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হবে না হবে। এটা তো ঠিক যে শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ পক্ষ শিক্ষার্থী যাদের মৌলিকত্ব বিকাশের লক্ষ্যেই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত। কাজেই শিক্ষাদান, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি এমনভাবে পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হওয়া বাঞ্চনীয় যা শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রেষণা (motivation) একটি গুরুত্বপূর্ণ factor । শিক্ষার্থীদের দুভাবে motivate করা যেতে পারে। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে তথা বৈচিত্র্যপূর্ণ উপস্থাপনা এবং অন্যান্য কৌশল অবলম্বনে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি অনুরাগী করে তোলা যেতে পারে (intrinsic motivation)। আবার কিছু বাহ্য enforcement এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে (extrinsic motivation)। শিক্ষাদান পদ্ধতি motivation এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান

রাখতে পারে। বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি নানাভাবে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি অনুরাগী করে তুলতে পারে। তবে আমাদের দেশে intrinsic motivation অপেক্ষা extrinsic motivation- ই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে আমাদের

দেশে পরীক্ষা অন্যতম বাহ্য motivation। শিক্ষাদান পদ্ধতি কেমন এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তার উপরই নির্ভর করে শিক্ষার গতি প্রকৃতি কী হবে। আর যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য মৌলিকত্বের বিকাশ, তাই শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থায় মৌলিকত্বের বিকাশের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

এবারে বিচার করে দেখা যাক আমাদের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতিসমূহ এ লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সহায়ক। এক বাক্যে বলা যায়, আমাদের বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি বিকাশের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। অবশ্য প্রতিভা যে একেবারেই বিকশিত হচ্ছে না তা নয়, তবে যে দুএকটি হচ্ছে তা নিতান্তই আকস্মিক এবং একেবারেই দৈব কারণে। শিক্ষাব্যবস্থার কোনো ভূমিকা এ সমস্ত মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে নেই। কারণ, শিক্ষার্থীদের স্বকীয়তা বিকাশের ব্যাপারটি আমাদের দেশে গুরুত্ব সহকারে দেখা হয় না। নৈতিকভাবে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হলেও শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে তা উৎসাহিত করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। নিচের আলোচনা থেকে ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করা যায়।

প্রথমেই দৃষ্টিপাত করা যাক পরীক্ষা পদ্ধতির দিকে। আগেই বলা হয়েছে যে পরীক্ষা একটি অন্যতম বিষয় যা অনেকাংশেই নির্ধারণ করে যে শিক্ষার গতি প্রকৃতি কি হবে। একথাও সত্য যে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ মূলত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও পরীক্ষার মত বহিঃপ্রেষণার (extrinsic motivation) জন্যই জন্মে থাকে। প্রথম কারণে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি অনুরাগের জন্য শিক্ষা, বা জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞানার্জন আমাদের দেশে খুব কমই হয়ে থাকে। আসল motivation হচ্ছে পরীক্ষা পাশ ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ। কাজেই পরীক্ষায় যে দিকগুলির গুরুত্ব অধিক, শিক্ষাক্ষেত্রে সে দিকগুলিই প্রাধান্য পাবে। শিক্ষার্থীদের মৌলিকত্ব বিকাশের দিকটিকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা *শিক্ষাবার্তা*-য় প্রকাশিত ড. মোকসেদুল হামিদ এর "পরীক্ষা পদ্ধতি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" প্রবন্ধটিতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ড. হক উল্লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতিসমূহের কোনটিই সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীদের মৌলিকত্ব বিকাশের দিকটি উৎসাহিত করে না। ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক, ত্রি-বার্ষিক প্রভৃতি সবরকম পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের মুখস্থ শক্তি পরীক্ষা করা। কোন শিক্ষার্থী কত বেশি মুখস্থ বিদ্যায় পারদর্শী সেটাই মূল্যায়নের মাপকাঠি — অর্থাৎ যে যত ভাল মুখস্থ করতে পারে সে

তত ভালো রেজাল্ট করছে। ফলত শিক্ষার্থীরা নিজ মেধা বা চিন্তাশক্তিকে ঘূণাক্ষরেও কাজে না লাগিয়ে ভাল text বা নোট বই থেকে, আবার কখনও গৃহশিক্ষকের তৈরি নোট থেকে উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় তা হুবহু উগলিয়ে দিয়ে আসছে এবং ভালো ফলাফল করছে। যে যত বেশি টাকা খরচ করে ভালো গৃহশিক্ষকের দ্বারস্থ হয়ে যত ভালো নোট তৈরি করে নিতে পারছে সে তত ভালো ফল করছে— আর অর্থাভাবে যে শিক্ষার্থী তা পারছে না, প্রতিযোগিতায় তারা তলিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে গৃহশিক্ষকতা লাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। গৃহশিক্ষকতা অবশ্যই খারাপ জিনিস নয়, যদি নোট তৈরির পরিবর্তে মৌলিকত্ব বিকাশের কাজে তা ব্যবহৃত হয়। এভাবে নোট তৈরি ও মুখস্থ শক্তির উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপের ফলে, স্বকীয়তা বিকাশের ন্যূনতম উৎসাহও আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রদান করে না। শিক্ষার্থীদেরকে কখনো কোনভাবে বলা হচ্ছে না যে কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয় মূল উৎস থেকে হুবহু নকল করতে পারবে না। এবং কেউ করলে তাকে ফলভোগ করতে হবে। এমনটিও কখনো বলা হচ্ছে না যে শিক্ষার্থীকে বই পড়ে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং পঠিত বিষয়ের বিচার, বিশ্লেষণ, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে এবং কোন দুজন শিক্ষার্থীর উত্তরও এক হতে পারবে না। ফলত মুখস্থ করাই আমাদের শিক্ষার্থীদের আসল কাজে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও উৎস থেকে হুবহু লেখা যায় বলে পরীক্ষা হলে নকল প্রবণতা সর্বকালের সর্বপ্রকার রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে. — যা এক চরম ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে এবং সব মহলকে জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। পরীক্ষায় যদি কখনো এমন প্রশ্ন এসে যায় যেখানে শিক্ষার্থীকে অন্তত কিছুটা নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগাতে হয়— হুবহু মুখস্থ বিদ্যা কাজে লাগে না, তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীরা ঢালাওভাবে ফেল করছে। এ অবস্থায় তাই শিক্ষার্থীদের স্বকীয়তার মৃত্যু ঘটছে। কাজেই পরীক্ষা পদ্ধতিতে এমন সংস্কার প্রয়োজন যা চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাতে বাধ্য করবে। অনেকবারই অবশ্য পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য কমিশন গঠিত হয়েছে। আবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ প্রসঙ্গে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। কিন্তু সবসময়ই যেটা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝে থাকি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের পরিবর্তে রচনাধর্মী, আবার কখনও বা রচনাধর্মী প্রশ্নের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের প্রবর্তন। সম্প্রতি আবার বলা হচ্ছে যে প্রশ্ন Subjective না হয়ে Objective হবে, যাতে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে পক্ষপাতিত্ব না হয়। কিন্তু প্রশ্ন Subjective, objective, short, broad যাই হোক না কেন, সব প্রশ্নই বর্তমানে সাধারণত Li fe out প্রকৃতির হয়ে থাকে, অর্থাৎ মূল text এর thesis, antithesis, synthesis ছাড়াই হুবহু text থেকে কোন না কোন অংশ অবিকল তুলে দিয়ে উত্তর করা সম্ভব। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর করবার জন্য মুখস্থ বিদ্যাই যথেষ্ট— বিচার বিশ্লেষণ, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন প্রভৃতির

কোনই প্রয়োজন নেই। ফলে শিক্ষার্থীর নিজ চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাবার মোটেও প্রয়োজন নেই — বই খুলে লিখে দিলেই চলে। পরিণতিতে নকল করতে যথেষ্ট সুবিধা হচ্ছে। আর নিতান্তই কেউ নকল করতে না চাইলে মুখস্থ করলেই হলো। আসল কথা হচ্ছে প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত বা রচনাধর্মী যাই হোক না কেন প্রশ্নের ধরন হতে হবে এমন যাতে ছাত্রকে তার উত্তর করতে হলে মূল text এর thesis, antithesis এবং synthesis করার প্রয়োজন হয় এবং শুধু শিক্ষার্থী বাধ্য হবে তার নিজ মেধা শক্তিকে কাজে লাগাতে। ফলস্বরূপ মুখস্থ বিদ্যাও নকল প্রবণতা বন্ধ হতে বাধ্য হবে। তবে একথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোন দুটি ছাত্রের উত্তর অবিকল এক হতে পারবে না। তাহলে গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতাও অনেকাংশে হ্রাস পাবে বা গৃহশিক্ষকতা চালু থাকলেও তা উৎপাদনমুখী অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব বিকাশের কাজে লাগবে। তাই প্রশ্নের ধরন হতে হবে interpreative, inferential, critical evaluation ও imaginative response প্রকৃতির। এ ধরনের প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই প্রমাণ করবে শিক্ষার্থী বিষয়টি কতটুকু বুঝে। এছাড়াও ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, বার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক এবং ত্রি-বার্ষিক গতানুগতিক পরীক্ষার পরিবর্তে প্রতিটি বিষয়ের (topic) শিক্ষাদান সমাপ্ত হবার পরপরই তার উপর Test হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ পরীক্ষার কারণ ও আসল উদ্দেশ্য পঠিত বিষয়টি শিক্ষার্থী কতটুকু আয়ত্ত করতে পারলো তা যাচাই করা। তাই প্রতিটি বিষয়ের পাঠদান সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর test হওয়া উচিত। গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী কতটুকু response করছে না করছে না তা বিচার করা সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভাল ফলাফল শিক্ষার্থীদের ভাগ্য বা অনেকাংশে chance এর উপর নির্ভর করে। কোন ছাত্র বেশি না জেনে মুষ্টিমেয় কটি কমন পেয়ে ভাল রেজাল্ট করতে পারে, অন্যদিকে একজন ভাল বুঝেও প্রশ্ন হুবহু কমন না পেয়ে তার চেয়ে খারাপ ফল করতে পারে। কাজেই সত্যিকার মেধা বিচার বর্তমান পদ্ধতিতে হচ্ছে না। অবশ্য আমাদের দেশে স্বজনপ্রীতি ঘটতে পারে বলে public examination-এর মূল্যায়নের অংশ হিসেবে অন্তঃমূল্যায়নের অপব্যবহার হতে পারে ভেবে ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে অন্তঃমূল্যায়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব না হলেও অন্তত দশম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষাগুলোর জন্য এ মূল্যায়ন পদ্ধতি খুবই সহায়ক।

তবে উপরের দিকেও, sitting পরীক্ষা ছাড়াও Assignment, Essay ইত্যাদি মূল্যায়ন পদ্ধতির অংশ হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। তবে অবশ্যই Plagiarism কে অনুৎসাহিত করতে হবে। Assignment এবং Essay তে মৌলিকত্বের ছাপ থাকতে হবে। Take home পরীক্ষাও চালু করা যেতে পারে — তবে উত্তর সম্পূর্ণ নিজস্ব হতে হবে— নকল উত্তর হলে অবশ্যই শিক্ষার্থীকে ফলভোগ করতে হবে। এছাড়াও সেমিনার প্রদান ও সেমিনারে অংশগ্রহণ মূল্যায়নের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হওয়া বিধেয়। এতে শিক্ষার্থীদের চিন্তার স্ফূরণ ঘটবে এবং চিন্তাশক্তি

বিকশিত হবে। শিক্ষার্থীরা নিজস্বভাবে চিন্তা করবে, মতামত প্রদানে সক্ষম হবে। ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এ সমস্ত পদক্ষেপই কেবল পরীক্ষা পদ্ধতিতে অর্থবহ সংস্কার সাধন করতে পারে. অন্যথায় শিক্ষার পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটলেও গুণগত মানের কোন পরিবর্তন হবে না। পরীক্ষা পদ্ধতি ছাড়াও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার এমন কিছু পরিবর্তন আনতে হবে যা শিক্ষার্থীদের মৌলিকত্ব বিকাশের উপযোগী। আমাদের বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি এ জন্যে মোটেও উপযোগী নয়। বর্তমানে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে Direct Instruction Method অনুসরণ করা হয় এবং এটিই একমাত্র পদ্ধতি বলা যায়। এ পদ্ধতিতে একমাত্র শিক্ষকই কোন বিষয় সম্পর্কে যা কিছু বলার তার প্রভাষণে বলে থাকেন. আর শিক্ষার্থীগণ সারাক্ষণ নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষক যা কিছুই বলুন না কেন শিক্ষার্থীরা সেটিকে দৈববাণী স্বরূপ গ্রহণ করে থাকে। এমনকি শিক্ষকের অনেক Point শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও সেটিই শিক্ষার্থীরা সত্য বলে গ্রহণ করে থাকে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষার খাতায় আলোচনার আলোকে না লিখলে ভাল নম্বর পাওয়া যায় না। এ সমস্ত কারণে ছাত্ররা এতই পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে শিক্ষক যা বলছে বা বইতে যা পড়ছে তার বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না, চিন্তা করতে চায়ও না, এমন কি চিন্তা করা উচিত বলেও মনে করে না।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রভাষণের তেমন কোন গুরুত্ব আছে বলেও শিক্ষার্থীরা মনে করে না, কারণ তারা বেশ ভাল করেই জানে যে, শিক্ষকের আলোচনা না শুনেও কোন ভাল পাঠ্য পুস্তক থেকে অথবা গৃহশিক্ষকের তৈরি নোট মুখস্থ করেই পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়। আর ভাল ফল করাই যেহেতু পড়াশোনার মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রভাষণ না শুনেই যদি ভাল ফল করা যায় তবে প্রভাষণ শোনার তেমন প্রয়োজনই বা কি। এ কারণে উচ্চতর ক্লাসসমূহে উপস্থিতির হার দিন দিনে কমে যাচ্ছে, যা কিছু ছাত্র ক্লাসে আসছে তা মূলত হাজিরার ভয়ে। তবে কিছু শিক্ষার্থী যে আলোচনায় আগ্রহী তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এ সমস্ত শিক্ষার্থীও শিক্ষকের আলোচনার সত্যাসত্য, ভালোমন্দ বিচার না করেই বিনা প্রশ্নে তা গ্রহণ করে থাকে— যা কখনো উচিত নয়। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি বিষয় নিজের জ্ঞানের/অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রতিটি জিনিসকে যাচাই করে দেখা উচিত। আমাদের বর্তমান পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় ছাত্রছাত্রীদের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকায় তাদের নিজস্ব চিন্তা প্রয়োগ ও বিকাশ সম্ভব নয়। Direct Instruction Method শিক্ষার্থীর মৌলিকত্ব বিকাশে সহায়ক নয় বলে পাশ্চাত্যের শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের অনেকেই এটিকে অনুৎপাদনশীল বলে মনে করেন। তারা মনে করেন শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন এমন পদ্ধতি যেখানে ছাত্ররা নিজস্ব চিন্তাশক্তি কাজে লাগাতে বাধ্য হবে। শিক্ষামনোবিজ্ঞানীরা তাই Direct Instruction পদ্ধতির পরিবর্তে Discovery learning পদ্ধতির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ পদ্ধতি ছাত্র নির্ভর, pair ও group discussion এ পদ্ধতির

মুখ্য প্রতিপাদ্য। আলোচনার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়াই এ পদ্ধতির মূল কথা। প্রত্যেক ছাত্র আলোচনা প্রক্রিয়ায় তার মতামত রাখবে এবং সবার মত থেকে গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ নিজেরাই সামগ্রিক সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকের সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করা যাবে। শিক্ষক আলোচনার অংশ হতে পারেন বটে, তবে মুখ্য আলোচক অবশ্যই নন। চিন্তাশক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে এভাবে শিক্ষার্থীদের নিজ উদ্ভাবনী শক্তি বিকশিত হবে এবং সাধিত হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষক আলোচনা করবেন, পরিকল্পনা করবেন, কার্যাবলী নিরূপণ করবেন এবং ছাত্রদের অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি ছাত্রদের দুর্বলতা ও সবলতা অবলোকন করবেন এবং পরবর্তী lesson সেভাবে পরিকল্পনা করবেন।

এই পদ্ধতি পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছে। আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই এ পদ্ধতি বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলত ঐ সমস্ত দেশের স্কুলের শেষ অধ্যায়ের ছাত্ররা কোন আলোচনায় যে সমস্ত মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করতে পারে আমাদের rote learning পদ্ধতিতে শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীরাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা পারে না।

আমাদের দেশেও তাই পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। direct Instruciton পদ্ধতির পরিবর্তে Descovery Learning Method এর ব্যাপক ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয়। পুরোপুরি না হলেও অন্তত এ পদ্ধতির ৫০ ভাগ নিশ্চিত করা যেতে পারে। whole class lecture -এর পাশাপাশি seminar ও tutorial ক্লাসের ব্যবস্থা করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে seminar মুখ্য আলোচকের বিষয় পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হলেই চলবে না, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলোচনায় অংশ নিতে হবে। অনেকেই আলোচনায় অংশ না নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে, সেজন্য এটিকে চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসাবে গণ্য করতে হবে। seminar Presentation ও Participation-এ প্রতি বছর অন্তত ১০০ নম্বর বা প্রতিটি subject এ ১০ নম্বর এর Seminar থাকতে পারে। তদ্রূপ Tutorial class-এও নির্ধারিত বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু বাসা থেকে লিখে আনবার জন্য Task দেওয়া ও তৈরি Essay সংশোধন করার মধ্যে Turorial সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। আলোচনাই হবে প্রধান এবং Tutotial আলোচনা চূড়ান্ত মূল্যায়নের অংশ হিসাবে বিবেচিত হতে হবে। এর উপরও ১০০ নম্বর রাখা যেতে পারে। অবশ্য এজন্য প্রয়োজন শিক্ষকের সততা। এছাড়াও lecture situation-এ অবাধ প্রশ্নকরণ ও মতামত প্রদানের অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সবের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষার্থীদের মৌলিকত্ব বিকাশ করা সম্ভব।

এ পদ্ধতিকে অবশ্য অনেকেই ধীরগতি সম্পন্ন মনে করেন, আর তাই গতি রক্ষার জন্য এর পাশাপশি Direct Instruciton পদ্ধতি ও ব্যবহার করা যেতে পারে। কাজেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা

পদ্ধতিতে আলোচ্য পরিবর্তনসমূহ অপরিহার্য। এসব পরিবর্তনের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থবহুল পরিবর্তন আনা সম্ভব।

তবে আমাদের দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষাদান ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিবর্তনসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব প্রতিকূলতা বিদ্যমান। দেশের জ্বরাগ্রস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা বা রাজনৈতিক-সামাজিক প্রভৃতি নানা কারণে আমাদের দেশে জনসংখ্যার সাথে গতি রক্ষা করে সমানুপাতিক হারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। ফলে যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোতে ছাত্রদের অধিক চাপ পরিলক্ষিত হয় যা একটি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থাই বটে। প্রতিটি ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা আদর্শ Class-size এর তুলনায় বহুগুণে বেশি। একটি শ্রেণীতে যেখানে কাম্য ছাত্র সংখ্যা ২৫ অথবা ৩০ সেখানে আমাদের রয়েছে গড়ে প্রায় ১০০ বা তারো বেশি ছাত্রছাত্রী। এরকম একটি বৃহৎ ক্লাসে Pair work, group discussion তথা interactive problem Solving activities-এর সার্থক প্রয়োগ কখনোই পুরোপুরি সম্ভব নয়। অতবড় ক্লাসে কোন ছাত্র ঘাপটি মেরে চুপচাপ বসে থেকে মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ বিশ্রাম দিলেও, এমনকি আরেক ধাপ এগিয়ে সুখ নিদ্রার আশ্রয় নিলেও অনেক সময় শিক্ষকের গোচরীভূত হয় না।

কোন ছাত্র গাল গল্প করছে কিনা, পাঠ্য বিষয় বাদ দিয়ে রাজনীতি কিংবা প্রণয়ের গল্প করছে কিনা তাও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এরকম কোন ক্লাসে সেমিনার প্রদান এবং সেমিনার আলোচনায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান রাখাও সম্ভব নয়। এমনকি Lecture situation এও অতবড় ক্লাস কখনো কাম্য হতে পারেনা। আবার একটি ক্লাসকে বিভিন্ন ছোট ছোট group-এ ভাগ করে tutorial class এ Student interaciton, অর্থপূর্ণ group ও pair work ব্যবহার করা, সেমিনার প্রদান ও সেমিনারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব বটে, তবে সেক্ষেত্রেও আমাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বাস্তব অসুবিধা রয়েছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের যেমন অভাব রয়েছে তেমনি অভাব রয়েছে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের। আমাদের বর্তমান অবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের যে অনুপাত তাতে Discovery Learning-এর সফল বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। এমনকি College বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সুপারিশকৃত ও সৃষ্ট পদসমূহের বিরাট অংশ শূন্য পড়ে রয়েছে। তাই আলোচিত পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন তথা শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থবহুল পরিবর্তনের জন্য একদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি যেমন অপরিহার্য, তেমনি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ ছাড়াও আদর্শ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের সমতা রক্ষার জন্য আরো বহুসংখ্যক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

এ সমস্ত পরিবর্তন অসম্ভব কিছু নয়। একটি গণমুখী সরকার অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এ পরিবর্তনগুলি অনায়াসে সাধন করতে পারে। আর, শুধু তখনই শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব।

[অধ্যাপক, *ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*]

উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রসঙ্গে

সুনীল কুমার গোলদার

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি যে নানা দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তাতে সন্দেহের অবকাশ খুব কমই আছে। ১৯১৭ সালের স্যাডলার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের সবগুলি দেশে যতগুলি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলিতে এই স্তরটি সম্পর্কে কিছু না কিছু মন্তব্য সংযোজিত হয়েছে। কোন কোন রিপোর্টে এই স্তরটি অবলুপ্ত করে মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে বিভক্ত করার কথা থাকলেও তা যে খুব ফলপ্রসূ হয় নি, আমাদের প্রতিবেশী দেশটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই স্তরটি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের ভিত্তি- ভূমিরূপে বিবেচনার দাবি রাখে। সে কারণে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যান্য সকল বিষয়ের মতো বিজ্ঞানেরও পঠন, পাঠন ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট সকলেরই যথেষ্ট যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

আমরা জানি যে, বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকের মতো ব্যবহারিক দিকটিও সমান গুরুত্ববহ। সাধারণ শিক্ষায় অবশ্য এই দুয়ের গুরুত্বের কিছুটা ইতর বিশেষ করা হয়। তাত্ত্বিক দিকটিকেই এক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, আর সে কারণেই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সাধারণত শতকরা ৭৫ ভাগ নম্বর তাত্ত্বিক বিষয়ে ও বাকি শতকরা ২৫ ভাগ নম্বর ধার্য করা হয় ব্যবহারিক বিষয়ে। অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, আমাদের দেশে— এই ব্যবহারিক পরীক্ষা ও তার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দিন দিনই তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ছে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তা আজ প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে।

অধুনা বিজ্ঞানের পঠনপাঠন শুরু হয় বাল্যশিক্ষার অব্যবহিত পর থেকে ও চলে সারা মাধ্যমিক স্তর জুড়ে। মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সর্বপ্রথম ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হয়। মজার ব্যাপার হলো এই যে, এই পরীক্ষাতেই পরীক্ষার্থীদেরকে ব্যবহারিক পরীক্ষা নামক প্রহসনের একটি মহড়া সর্বপ্রথম রপ্ত করানো হয়। এই ধারণা নিয়েই তারা উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়েই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

তৃতীয় বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯০

আর সব বিষয়ের মতো মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞানের দুটি পত্র থাকে। প্রত্যেক পত্রের তাত্ত্বিক বিষয়ে ৭৫ নম্বর ও ব্যবহারিক বিষয়ে ২৫ নম্বর থাকে। পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষা তিনটি অংশে বিভক্ত- (১) নোটবই (Note Book), (২) মৌখিক পরীক্ষা (Viva Voce) এবং পরীক্ষণ (expt)। প্রত্যেক অংশের জন্য শিক্ষা বোর্ডের ধার্যকৃত নম্বর যথাক্রমে ৫, ৫ এবং ১৫।

প্রথমত নোটবইয়ের কথাই ধরা যাক। নোটবইতে পরীক্ষার্থী যে সব পরীক্ষা নিজ হাতে সম্পন্ন করেছে তা সূচিপত্রসহ লিপিবদ্ধ থাকবার কথা। এক একটি পরীক্ষণের আবার সুস্পষ্ট কয়েকটি অংশ থাকে। যেমন মূলতত্ত্ব, যন্ত্রপাতির নাম, কার্যধারা, উপাত্ত বা ছক, ফলাফল ও সতর্কতা। কিছু নিয়মাবলীও ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য মান্য। যেমন নোটবইয়ের বামপার্শ্বের পাতায় পেন্সিল দিয়ে পরীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় মূলযন্ত্রের বা বর্তনীয় চিত্রটি অঙ্কিত থাকা প্রয়োজন; বামপার্শ্বস্থ পাতায় হিসাব ও ক্ষেত্রবিশেষে লেখচিত্র সন্নিবেশিত থাকা দরকার এবং কার্যধারা ও সতর্কতা লিখতে অতীতকাল ও কর্মকর্তৃবাচ্য (Past tense & Passive voice) ব্যবহার করা আবশ্যক। নোটবইটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হওয়াও বাঞ্ছনীয়। তার জন্য কিছু নিয়মকানুনও ছাত্রছাত্রীদের অবলম্বন করতে হয়, যা প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন সাপেক্ষ। যেমন শিরোনামগুলো বড় হরফে লেখা, বিষয়ান্তরে যাওয়ার প্রাক্কালে কিছু স্থান ফাঁকা রাখা ইত্যাদি। সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীরা গবেষণাগারে যে সব পাঠ নিয়ে ফলাফল নির্ণয় করেছে তা নোটবইয়ের ছকে বা ক্ষেত্রবিশেষে সংযোজিত লেখচিত্রে সন্নিবেশিত এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষণ শিক্ষক বা প্রদর্শনশিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত থাকবার কথা। বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে, বাজারের কোনও না কোন ব্যবহারিক গাইড বইয়ের অবিকল নকল পাঠদ্বারা লিপিবদ্ধ নোটবইও প্রায়শই শিক্ষকদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে দেখা যায়। যা হোক, পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত সবগুলি পরীক্ষণ কোন পরীক্ষার্থী উপর্যুক্ত মতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করলে ও তা নোটবইতে লিপিবদ্ধ করলেই শুধুমাত্র তার পূর্ণ নম্বর পাবার কথা। কিন্তু শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষকদিগকে (অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত) সরবরাহকৃত নির্দেশিকায় এ সব বিষয়ে কিছুই বলা থাকে না। তার ফলে এ ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের যথেচ্ছাচারের যথেষ্ট সুযোগ থেকে যায়। ফলত মূল্যায়ন সার্বিকভাবে অর্থাৎ কলেজ নির্বিশেষে সমান বা সমতুল্য হয় না।

দ্বিতীয়ত, মৌখিক পরীক্ষা প্রসঙ্গে আসা যাক। এরও দুটি অংশ থাকে (১) পরীক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী ও (২) সংশ্লিষ্ট পত্রের পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নাবলী। এক্ষেত্রেও কোন নম্বর বিভাজন নির্দেশিকায় থাকে না। মৌখিক পরীক্ষায় পরীক্ষকদের অবাধ ক্ষমতা (discretionery Power) প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ থাকে এবং তার অপপ্রয়োগও হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, পরীক্ষার্থী যে পরীক্ষণটি পরীক্ষকদের সামনে সরেজমিনে সম্পাদন করে দেখায় সেটির দিকে নজর দেওয়া যাক। পাঠক্রমে যতগুলি পরীক্ষণ অন্তর্ভুক্ত,

ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে তার সবগুলি সন্নিবেশিত থাকে। পরীক্ষার্থীকে লটারির মাধ্যমে যে কোন একটি পরীক্ষণ বাছাই করতে হয়। তাকে তিনটি সুযোগ দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য হলো পাঠক্রমের সবগুলি না হলেও অন্তত অধিকাংশ পরীক্ষণে তার দক্ষতা যাচাই করা। কিন্তু এই তিনটি সুযোগেও যদি সে ইপ্সিত/সম্পাদিত পরীক্ষণটি লাভ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে তার ইচ্ছানুসারে একটি পরীক্ষণ সম্পাদন করতে দেওয়া হয়। এটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেও তার খুব বেশি নম্বর প্রাপ্য হয় না, কারণ পাঠক্রমের উপর তার সামগ্রিক দক্ষতা খুবই সীমিত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কত নম্বর তার প্রাপ্য, সেটা কোথাও সংজ্ঞায়িত হয় নি। অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের এটিও একটি ক্ষেত্র বটে। যা হোক, লব্ধ পরীক্ষণটিকে একটি প্রশ্নরূপে বিবেচনা করা হয় এবং পরীক্ষার্থীকে একটি উত্তরপত্রে তার বিভিন্ন অংশে নোটবইয়ের অনুরূপভাবে (কেবলমাত্র চিত্র ও প্রায়শঃই কার্যধারা বাদে) লিপিবদ্ধ করতে হয়। উল্লেখ্য যে, পরীক্ষণটি বাছাইয়ের পর পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষকদের সামনে উত্তরপত্রে আবশ্যিকভাবে সর্বপ্রথম মূলতত্ত্ব ও ছক লিখে স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হয়। এরপর যন্ত্রপাতির পাঠ গ্রহণকালে ন্যূনপক্ষে একটি পাঠ দেখিয়ে তাতে পরীক্ষকের স্বাক্ষর নিতে হয়। উপর্যুক্ত বিষয়াবলী সুচারুরূপে উত্তরপত্রে লিখিত হলে পরীক্ষার্থীর পূর্ণ নম্বর পাবার কথা। অবশ্য এক্ষেত্রে মূলতত্ত্ব, ছক, হিসাব ও ফলাফলে পৃথকভাবে নম্বর বন্টিত থাকে। আর উত্তরপত্রে যেহেতু নোটবই বা মৌখিক পরীক্ষার তিনগুণ নম্বর থাকে তাই এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ইদানীং উপর্যুক্ত শর্তাবলী লংঘন করে অতিরিক্ত নম্বর প্রদানের প্রবণতা হামেশাই লক্ষ করা যাচ্ছে।

পরীক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবই যে এর অন্যতম কারণ তাতে সন্দেহ নেই, তবে বোর্ডের নির্দেশিকায়ও এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত থাকে না।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিচার কাজ। তাই এ কাজে যথাযথ প্রশিক্ষণ থাকা অত্যাবশ্যক। তাত্ত্বিক পরীক্ষকদের জন্য অতীব স্বল্পকালীন একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্য আছে। শিক্ষাবোর্ড থেকে উত্তরপত্র গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে দেড়-দু ঘন্টার একটা সভায় এই প্রশিক্ষণের কাজটি সমাধা করা হয়। নতুন পরীক্ষকদের বেলায় তা যথোপযুক্ত কিনা তা গবেষণাসাপেক্ষ। মূল্যায়ন কাজটি তাই অনেকটা 'গাইতে গাইতে গায়েন ও বাজাইতে বাজাইতে বায়েন'- এর মতো। ব্যবহারিক পরীক্ষকদের জন্য বস্তুত কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই নেই। তাই উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ সমগ্র ব্যাপারটিই যেন এখানে অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের এক উন্মুক্ত ক্ষেত্রস্বরূপ।

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দিন দিন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাতে উচ্চনম্বর প্রাপ্তি একটা গুণক বিবেচিত হওয়ায় পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, গৃহশিক্ষক, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষক স্বয়ং) ব্যবহারিক পরীক্ষাকে নানাভাবে প্রভাবিত করায় সচেষ্ট থাকেন আর যেহেতু এখানে উভয় পরীক্ষক (অভ্যন্তরীণ ও

বহিরাগত পরীক্ষক যথাক্রমে তাত্ত্বিক বিষয়ের অনুরূপ পরীক্ষক ও প্রবীণ পরীক্ষকরূপে বিবেচ্য) সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত থাকেন, তাই এই প্রভাবের মাত্রা নানাদিকে নানাভাবে বিস্তৃত হতে পারে এমনকি কখনও কখনও তা বহিরাগত পরীক্ষকের শারীরিক লাঞ্ছনার কারণও ঘটাতে পারে। একদা লেখকের অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভের দুর্ভাগ্য ঘটেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাগত পরীক্ষকরা এবিধ কোনও প্রকার কুপ্রভাব বা হুমকির আশঙ্কা করলে উত্তরপত্রগুলি স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে এসে এককভাবে (অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক ছাড়াই) মূল্যায়ন করতে পারেন। বেদনাদায়ক সত্য এই যে, শিক্ষা বোর্ডের এই পরীক্ষায় তদনুরূপ কোন বিধান বা রক্ষাকবচ নেই। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহিরাগত পরীক্ষককে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বিশেষ কোন উপায়ও থাকে না।

সামগ্রিক বিচারে ব্যাপারটিকে তাই প্রহসন ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে? 'সবই সামাজিক অবক্ষয়' বলে পাইকারী মন্তব্য করে বিষয়টিকে কোনমতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। এই অবস্থার নিরসণকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলেরই এগিয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।

[*প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা।*]

প্রসঙ্গ : উৎপাদনমুখী শিক্ষা

মকবুল আহমেদ

'উৎপাদনমুখী শিক্ষা' কথাটি বাংলাদেশে অনেক দিন থেকে শোনা যাচ্ছে। অনেকের লেখায় ও বক্তৃতায় দাবিও থাকে উৎপাদনমুখী শিক্ষা প্রচলনের জন্য। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাটা উৎপাদনমুখী নয় বলে কারো কারো আপসোসের অন্ত নেই। জনগণের বিভিন্ন স্তরে এর আলাপ আলোচনা চললেও এবং কোন কোন স্তরে এর আকর্ষণ বাড়লেও জনগণের মাঝে এই 'উৎপাদনমুখী শিক্ষা'র ধারণা চালু করেছে শাসকশ্রেণী। 'উৎপাদনমুখী শিক্ষা' বলতে কি বোঝানো হয়ে থাকে, এর প্রচার ও প্রসারের জন্য শাসকশ্রেণীর কেন এতো প্রয়োজন এবং এই শিক্ষা কতটুকু সাধারণ শিক্ষার পরিপূরক কিংবা আদৌ পরিপূরক কিনা, প্রভৃতি বিষয় আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাধারণত বিভিন্ন প্রকার টেকনিক্যাল শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাই 'উৎপাদনমুখী শিক্ষা' বলে পরিচিতি লাভ করেছে। সাধারণ শিক্ষা কিংবা উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে মাধ্যমিক পর্যায়ে বা তার পরে সংক্ষিপ্ত কোর্সে কোনো কাজের উপযোগী টেকনিক্যাল শিক্ষা নিয়ে তড়িঘড়ি কাজে লেগে যাওয়াটাকে 'উৎপাদনমুখী শিক্ষা' বলে বিবেচিত হচ্ছে। বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণের কাছে অতি উৎপাদনের জন্যে পরিশ্রম করা- ভালো কাজ ও পবিত্র দায়িত্ব বলে প্রচার করে। কিন্তু শ্রমিকের সেই উৎপাদিত দ্রব্য শ্রমিক সমাজের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, নাকি জনগণকে অভুক্ত রেখে বিত্তশালী দেশে রপ্তানি করা হয়, নাকি তার বিনিময়ে গুটি কয়েক লোক মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে এই মৌলিক প্রশ্নটি বিবেচনায় আগে আনা হয় না। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক নিজের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সেই পণ্য পুনরায় তাকে অতি মূল্য দিয়ে কিনে নিতে হয়; নতুবা ক্রয়ক্ষমতাহীন অবস্থায় শ্রমিকের কাছে সেই পণ্যটি দুর্লভ দর্শনীয় দ্রব্য হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় বন্টনের যে বৈষম্য ও নৈরাজ্য বিদ্যমান তার কোনো সুরাহা না করেই বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিকের অধিক পরিশ্রমের ওপর পবিত্রতা আরোপ করে এই বিরোধমূলক প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে শ্রমিককে উৎপাদনের জন্য বাধ্য করার যে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন তাকেই 'উৎপাদনমুখী শিক্ষা' বলা হচ্ছে।

ব্যক্তিগত মুনাফামুখী ও হালে বিদেশে রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানায় কাজ পাওয়ার জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তারই নামকরণ করা হয়েছে

তৃতীয় বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯০

'উৎপাদনমুখী শিক্ষা'। পুঁজিপতির ব্যক্তিগত মুনাফার প্রয়োজনে আধুনিক কলকারখানার কাজ করার উপযোগী করে তুলতে একজন শ্রমিককে যে প্রশিক্ষণ পুঁজিপতির নিজের টাকায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্পন্ন করতে হতো তা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রীয় তদারকির মাধ্যমে করে নেয়। এই প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে। বৃত্তির জন্য এই শিক্ষাকে বলা হচ্ছে যুগের উপযোগী আসল শিক্ষা। সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষাকে গুরুত্বহীন ভাবতে শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে প্রচারও করা হচ্ছে। তারা প্রচার করছে : বিএ, এমএ পাশ করে কি লাভ? বিএ পাশ করা লোকের আধিক্যের ফলে নাকি দেশে বেকার বেড়ে গিয়েছে এবং শিক্ষার নাকি কোনো ভবিষ্যত নেই। আসলে একটি পরনির্ভরশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকায় এবং দেশকে বহুজাতিক কোম্পানির পণ্যের বাজারে পরিণত করায় দেশের অধিকাংশ লোককে কর্মহীন বেকার জীবনযাপন করতে হয়। দেশব্যাপী বেকারত্বের কারণ যে স্বয়ং পুঁজিতান্ত্রিক পশ্চাৎপদ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত এ সত্য কথাটি তারা সুচতুরভাবে আড়াল করে এবং দোষটা দেয় বিএ, এমএ সাধারণ শিক্ষার ওপর। তাছাড়া পুঁজিতন্ত্রের এমন করুণদশা হয়েছে যে, এক কালের মুনাফামুখী ও সুবিধাভোগী ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষিত লোকেরাও চাকরির দাবিতে মিছিল নিয়ে রাস্তায় বের হতে বাধ্য হয়েছে। অথচ, গ্রামে-শহরে ডাক্তারের অভাবে বিনা চিকিৎসায় শত শত লোক রোগ-ভোগে মারা যাচ্ছে।

আসলে কোনো ধরনের উচ্চ শিক্ষা নিজে থেকে বেকার সৃষ্টি করে না, বরং পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন বেকার সৃষ্টির জন্যে দায়ী। তারপরেও শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী সাধারণ শিক্ষার ওপর দোষটা দিয়ে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে জনগণের সচেতনতার অভাবে।

সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা ব্যাপারে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী জনগণকে যেমন অনুৎসাহিত করে তুলছে, সাথে সাথে তা ব্যয়বহুল করেও ফেলেছে। বুর্জোয়া শ্রেণী চায়, সাধারণ শিক্ষা নিজের শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে। তারা চায়, উচ্চ বিত্তরা উচ্চ শিক্ষা কিনে নিক, আর নিম্ন বিত্তরা পাক শুধু কারখানায় কাজ করতে পারার মতো প্রশিক্ষণ। শিক্ষাকে উচ্চ দামে বিক্রয় করা বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্দেশ্য নয়, ক্রয় ক্ষমতাহীন জনগণের ব্যাপক অংশকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। বুর্জোয়া শ্রেণী দিনরাত বলে বেড়ায়, এতো ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান পড়ে লাভ নেই বরং অফিসে কারখানায় কাজ পাওয়ার মতো প্রশিক্ষণটাই ভালো জিনিস। তারা বলে, তাতে কাজ পাওয়ার মতো সম্ভাবনা যেমন আছে অন্যদিকে উপোস করা থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। অথচ এদেশের শ্রমিকেরা যে মানবেতরভাবে জীবনযাপন করে একথা কে না জানে। শাসকশ্রেণী ও তাদের ভাড়াটে পণ্ডিতেরা আরও বলে- এ গরিব দেশে উচ্চ শিক্ষা বিলাসিতার নামান্তর, এটা বড়লোকী কাজ। বিপ্লবী ছাত্র সমাজের প্রতিরোধের মুখে এরশাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খানের যে শিক্ষানীতি বাতিল হয়েছে তার মূল কথাটি তাই।

দুই

পুঁজিবাদী শোষণ শাসনের ফলে বাংলাদেশের জনগণকে যে অভাব অনটনের মধ্যে বসবাস করতে হয় সে অবস্থায় কোনো নিম্নবিত্ত লোকের সন্তানকে সাধারণ ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার জন্য যে ধাপগুলো অতিক্রম করে আসতে হয় সে রকম আর্থিক সামর্থ্য ও মানসিক ধৈর্য তাদের থাকে না। নিজের সন্তানকে উচ্চ শিক্ষিত দেখতে চায় না এমন পিতা মাতা সমাজে বিরল। নিজের অশিক্ষার অজ্ঞানতা থেকে ওঠে আসার ব্যাকুলতা সব মানুষের মধ্যে থাকে। কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের কাছে তাদের অজ্ঞনতা জয় করার চেয়ে ক্ষুধা জয় করা অতি জরুরি হয়ে পড়ে। তাই পুঁজির পীড়ণে অসহায় মানুষ দারিদ্র্য ও বেকার জীবনের ভয়াবহতা লক্ষ করে 'কর্ম সংস্থানের জন্য টেকনিক্যাল শিক্ষা' শাসক শ্রেণীর ছুড়ে দেয়া শ্লোগানটি গ্রহণ করে নেয়।

অপরদিকে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সন্তানদের ভুলেও এই টেকনিক্যাল শিক্ষার দুয়ারে পা দিতে দেখা যায় না। রাষ্ট্র আগে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছে। সাধারণ শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি স্তরে কারা কি ভাবে যাবে তা আগে থেকেই নির্ধারিত। উচ্চ শিক্ষা যেহেতু ব্যয়বহুল ও মেধা নির্ভর সেহেতু উচ্চ বিত্তরাই যে তার আয়ত্ত করে নেবে তা বলাই বাহুল্য। শিক্ষাকে টাকা দিয়ে কেনার ব্যাপারটি আড়াল করার জন্য উচ্চ শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে মেধা বা প্রতিভার দোহাই দিতে শাসক শ্রেণী অভ্যস্ত। শুধু প্রতিভাবানরাই উচ্চ শিক্ষা পাবে এ ধরনের কথা বাংলাদেশের সব শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খানের শিক্ষানীতিতে (যা পরে প্রত্যাখ্যাত) একেই বলা হয়েছে 'সিলেকটিভ এডুকেশন।'

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে প্রতিভা জিনিসটা আসে কোথা থেকে। আমাদের দেশে প্রতিভাবানদের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি হচ্ছে 'ইন্টেলিজেন্স টেস্ট'। এই টেস্টে যে দক্ষতা দেখাতে পারবে সে ভালো সুযোগ পাবে, উচ্চ শিক্ষায় যাবে। আর যারা খারাপ করবে তারা যাবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে। এই 'ইন্টেলিজেন্স টেস্ট' কতটা বৈজ্ঞানিক বা শ্রেণী নিরপেক্ষ এবং মানুষ নানা রকমের প্রতিভা নিয়ে জন্মায় এই ধারণাটুকুই বা কতোটা যুক্তিসিদ্ধ। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ 'শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক'-এ ব্রায়ান সাইমনের বিখ্যাত বই 'ইন্টেলিজেন্স টেস্ট' থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ব্রায়ান সাইমন বলেছেন, একটি সন্তান এলো হয়তো এমন পরিবার থেকে যার বাবা মা উভয়ে গল্প পড়ে শোনানো, ছবি আঁকতে শেখানো, বিজ্ঞানের কিছু সহজবোধ্য বিষয় বোঝানো ইত্যাদি নিয়ে ছেলেমেয়েদের প্রতি মনোযোগ দিতে পেরেছেন। আর একজন এলো এমন পরিবার থেকে যেখানে কায়ক্লেশে জীবনযাপন করে এমন শ্রমিক পিতা পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষ মনোযোগই দিতে পারেন না। এদের ছেলেমেয়েরা তথাকথিত ইন্টেলিজেন্স পরীক্ষায় খারাপ।

জন্মগত প্রতিভা সম্পর্কে ব্রায়ান সাইমন বলেছেন : এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যার ভিত্তিতে বলা চলে শিশুদের মানসিক ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে মস্তিষ্ক ও জটিল স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস নিরীক্ষা থেকে উল্টো কথাই বলা হয়েছে। বিখ্যাত রুশ শরীর বিজ্ঞানী ও মনস্তাত্ত্বিক পাভলভ বলছেন যে, জটিল স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস নিরীক্ষা ও পরীক্ষা করে আমরা যে ধারণা পাচ্ছি, যা অনেক বেশি সুদৃঢ় ও বৈজ্ঞানিক, তাতে দেখা যায় স্নায়ুতন্ত্রের কর্ম সম্প্রসারণতা ও ক্ষমতা খুবই বেশি। কোনো কিছু ধর্তব্যের ও বিশ্লেষণের বাইরে নয়, এমন সব কিছুই বর্জন করা যেতে পারে, যদি পূর্বশর্তগুলো ইতিবাচক হয়।' জন্মগত প্রতিভার ধারণার বিভ্রমকে আরো স্পষ্ট করার জন্য বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিদ লুনাচারস্কির অভিমত উদ্ধৃত করতে চাই। "মানুষের 'নিচু' জাতিগুলিকে শিক্ষা দ্বারা বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে উত্তোলন করা যায় না ইত্যাকার কুৎসা প্রচার সত্ত্বেও আমরা জানি যে, এটা মিথ্যা। অনগ্রসর যাযাবর জাতির মাঝারি ধরনের সামর্থ্যে কোনো শিশু ও অভিজাত বংশের সন্তানের মধ্যে আসলে কোনোই পার্থক্য নেই। দুটি একই বাড়িতে লালিত পালিত হলে, একই স্কুলে লেখাপড়া শিখলে সেখানে এককভাবে নিজস্ব যোগ্যতাই কেবল তাদের উন্নতির নির্ণায়ক হবে।"[১] উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিভা জিনিসটাও বুর্জোয়ারা ক্রয়ও করে নেয়। এটা এমন একটা কৌশল যা দিয়ে শাসক বুর্জোয়া শ্রেণী শাসিত জনগণের সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে খুবই সূক্ষ্মভাবে পরাভূত রাখে।

তিন

উচ্চ বিত্তের জন্য উচ্চ শিক্ষা আর নিচু শ্রেণীর জন্য টেকনিক্যাল শিক্ষার যে আয়োজন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য কি? পুঁজিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য বস্তু দুটি। এক, বিদ্যমান পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছে বশ্যতা স্বীকারের উপযোগী শাসিত জনগণের মানসিক অবস্থা বজায় রাখা এবং জায়মান প্রতিবাদী চেতনাকে বিষাক্ত করে দেয়া। দুই, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্মচারী ও পুঁজিপতির কারখানার জন্যে কর্মদক্ষ শ্রমিক যোগান দেয়া।

ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান পড়ার ফলে এবং এ সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা নেয়ার পর শিক্ষার্থী যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয় এবং যে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে তাতে তার পক্ষে সমাজ বিকাশের নিয়মগুলি বুঝতে সম্ভবপর হয়। তাছাড়াও পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত নিয়ম ও অনিয়মগুলির কার্যকরণ সমৃদ্ধ ব্যাখ্যা করতে, বুঝতে সে সক্ষম হয়ে ওঠে। একজন সত্যিকারে মানবিক জ্ঞানবিজ্ঞান সুশিক্ষিত মানুষ সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় পরখ করতে শেখে। ইহজাগতিকতা ও বিশ্ববীক্ষা হয় তার অন্বিষ্ট। এরূপ শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতা গড়ে ওঠে সে সমাজের বিদ্যমান শাসন-শোষণ ব্যবস্থার সকল অন্যায় ও অসঙ্গতির প্রতি বিক্ষুব্ধ ও প্রতিরোধী হয়ে ওঠে এবং নিপীড়নমূলক ও শোষণমুলক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে ভাঙতে তৈরি হয়।'

শিক্ষা মানুষকে শুধু শিক্ষিত ও জ্ঞানী করে তুলে না নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতাও বাড়িয়ে তোলে। আবার জ্ঞান কর্মজীবীদের সচেতন ও স্বাধীনচেতা করে বলে শোষণ-শাসনে তারা বশ্যতা স্বীকারে অবাধ্য হয়। আগের দিনে জমিজমা ও সম্পত্তির মালিকেরা অজ্ঞ শ্রমিক পছন্দ করলেও আজকের দিনে (পুঁজিবাদী উৎপাদনের দিনে) উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের শর্তে দক্ষ শ্রমিক অপরিহার্য। বুর্জোয়ারা সহজেই বুঝতে পারলো, অজ্ঞ বা অশিক্ষিত শ্রমিকের চেয়ে শিক্ষিত শ্রমিকই উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাতে পারে অনেক বেশি। কিন্তু পুঁজিপতিদের কাছে দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন হলেও তাদের শিক্ষা বা জ্ঞান বিপজ্জনক। জ্ঞানী শ্রমিক নিজের পেশার ক্ষেত্রে দক্ষ হলেও সাথে সাথে পুঁজিপতি শোষণ নিপীড়ন সম্পর্কে সচেতন ও প্রতিবাদীও বটে। এই সক্রিয় সচেতনতাই পুঁজিপতির কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিপতি এমন শ্রমিক চায়, যে উৎপাদনে দক্ষতা দেখাবে, কিন্তু জ্ঞানী হবে না। অর্থাৎ পুঁজিবাদী শোষণ-শাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো কিছুই বুঝে ওঠার আগেই তাকে মেশিন চালানো শেখানো হবে এবং পাঠানো হবে কারখানায়। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা স্থলে কারিগরি শিক্ষার প্রস্তাব। এমন কি প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বেই কর্মমুখী করার প্রয়াস চলছে।

শাসন-শোষণকে নিরাপদ ও স্থায়ী রাখতে হলে শুধু দমনমূলক ব্যবস্থাই বুর্জোয়াদের জন্য যথেষ্ট নয়, তাকে জ্ঞানের ওপরও বিশেষভাবে খবরদারী করতে হয়। জ্ঞানচর্চার যাবতীয় মাধ্যমসহ উচ্চ শিক্ষাকে বুর্জোয়া শ্রেণী তার স্বশ্রেণীর হাতে একচেটিয়া রাখতে চায়। শিক্ষার হাতিয়ার দিয়ে তারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রকেও কুক্ষিগত করে রাখে। এই ভাবে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদেরকে বাধ্য করে পুঁজিপতির কারখানার যোগ্য শ্রমিক হবার জন্য টেকনিক্যাল শিক্ষা নিতে।

পুঁজিবাদী শোষণের স্থিত অবস্থার কোনো হেরফের না হবার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণী শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজায় যাতে নিপীড়িত শ্রেণীর সন্তানদেরকে প্লেগের চেয়ে সংক্রামক জ্ঞান জিনিসটি স্পর্শ করতে না পারে। শ্রেণী শোষণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী যে কলকারখানা, জমিজমা, বাড়িঘর ও অন্যান্য বিপুল সম্পত্তির ওপর মালিকানা অর্জন করেছে তা বজায় রাখার জন্য তাদের পোষা পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী প্রভৃতি বল প্রয়োগকারী সংস্থা বিদ্রোহী জনগণের বিরুদ্ধে সব সময় ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এই সব বল প্রয়োগকারী সংস্থার উর্দী পরিহিত কৃষক সন্তানেরা জনগণের বিদ্রোহী অংশের সাথে সহজে মিশে যাবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কম নেই। লুনাচারস্কি বলেন, 'কোনো সময়, কখনই রাষ্ট্র এককভাবে বল প্রয়োগের উপর ভরসা রাখে নি। নিচের শ্রেণীগুলিকে দমনের জন্য চিরদিনই প্রধান উপায় হিসেবে তলোয়ার, স্থূল শক্তিই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু একই সময়ে সমাজের নিচুতলার মানুষের চেতনাকে বিষাক্ত করার পদ্ধতির প্রয়োগও অব্যাহত ছিল। প্রথমত, অধস্তন শ্রেণীকে জ্ঞান লাভের সুযোগ দেয়া চলবে না, জনগণকে অজ্ঞ রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই অজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে এই সব বোধ দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে যে, দাস বিদ্যমান পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ

ন্যায়সঙ্গতভাবে সে এটাকে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা হিসাবেই দেখবে। তার সাধারণ বিবেচনাকে বিকৃত করতে হবে, বসবাসের পরিস্থিতির কাছে তাকে স্বেচ্ছায় নতিস্বীকারের শিক্ষা দিতে হবে।[৫]

চার

নিচু শ্রেণীর জন্য শিক্ষাকে কারিগরিকরণের বা উৎপাদনমুখী করার পেছনে তাদেরকে জ্ঞানালোক থেকে বঞ্চিত রাখার কাজ ছাড়াও বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বিতীয় আর একটি নগদ প্রয়োজনের দিকও রয়েছে, যা আগেই উল্লেখ করেছি। তা হচ্ছে, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের প্রয়োজনে এবং নতুন প্রযুক্তি উপযোগী দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ সচল রাখা। পুঁজিতন্ত্রের শোষণ প্রক্রিয়াটি জিইয়ে রাখার জন্য এবং ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থে বুর্জোয়ার দরকার ট্রেনিং প্রাপ্ত, বাধ্য উৎপাদন কর্মী ও দক্ষ মেশিন চালক। সম্পত্তিবান শ্রেণী এককালে শোষণের ও শাসনের স্বার্থে কৃষক-শ্রমিককে অজ্ঞ রাখার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু আজকের সম্পত্তিবান শ্রেণী— আজকের বুর্জোয়া শ্রেণী— তাদের মুনাফামুখী উৎপাদনের প্রয়োজনে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার শ্লোগানে মুখর। ব্রিটিশ ভারতের জমিদার শ্রেণীর কাছে অজ্ঞ কৃষক-সমাজ ছিল শ্রম শোষণের উত্তম হাতিয়ার। ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর প্রয়োজনে এদেশের কৃষক সন্তানদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইলে দেশীয় জমিদার শ্রেণী তার বিরোধিতা করে। কারণ, তখনও এ দেশীয় সম্পত্তিশালী শ্রেণী আধুনিক শিল্প কারখানার মালিক হয়ে ওঠে নি। আজকের সম্পত্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণী শুধু পুঁজি ও কলকারখানার মালিক হয় নি, একটি আধুনিক রাষ্ট্রেরও মালিক হয়েছে। তাদের এই আধুনিক কলকারখানা ও রাষ্ট্র যন্ত্রের কাছে নিরক্ষর ও অজ্ঞ কৃষক শ্রমিকের কোনো মূল্য নেই। তাই পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তোলা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। শাসিত জনগণের সন্তানদেরকে যে টেকনিক্যাল শিক্ষা নেয়ার জন্য শাসকশ্রেণী হরহামেশা প্ররোচিত করছে, সেই টেকনিক্যাল শিক্ষার ভিত্তিই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। যে লোক প্রাথমিক শিক্ষার চৌকাঠ অতিক্রম করে নি তাকে টেকনিক্যাল শিক্ষা দেয়া সহজ হয়ে ওঠে না। সেই জন্য প্রাথমিক শিক্ষার খরচার দায় দায়িত্ব নিজের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের কাঁধে নিতে হয়। নিরক্ষর তমসাচ্ছন্ন জনগণকে শিক্ষার আলো দেয়ার জন্য রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে বা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে ভাবলে বড়ো ধরনের ভুল করা হবে। এ কালের রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কিছুটা লেখাপড়া জানা কর্মীর ও দক্ষ শ্রমিক বাহিনীর। তবে শিক্ষাটা এমন পর্যায়ে রাখা চাই, যা প্রশিক্ষণ গোছের, যা শুধু কাজ চালাবার মতো এবং যা দিয়ে শুধু মেশিন চালানোই সম্ভবপর। জ্ঞান জিনিসটা যেন সেখানে মোটেই না পৌছায়।

জনগণের নিচু শ্রেণীর সন্তানদের টেকনিক্যাল স্কুলে পাঠাতে হলে উচ্চ শিক্ষাকে উচ্চ মূল্যের পণ্য হিসেবে বাজারে না তুললে তা বুর্জোয়া শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকারে

রাখার সুযোগ থাকে না। সূক্ষ্ম কৌশল হিসেবে প্রতিভার দোহাই দিয়ে শাসক শ্রেণী সিলেকটিভ এডুকেশনের কথা বলে এবং সর্বসাধারণের সন্তানদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে টেকনিক্যাল শিক্ষার উপযোগিতা তুলে ধরে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শিক্ষাও অন্য দশটা দামী পণ্যের মতো পরিণত হওয়ায় ক্রয়ক্ষমতাহীন নিচু শ্রেণী থেকে আগত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়ে তার একাংশ সেখানে লেখাপড়ার ইতি ঘটায়, আরেকাংশ টেকনিক্যাল শিক্ষার শিবিরে যোগ দিতে বাধ্য হয়। পুঁজিপতি কলকারখানার মালিক হয়ে ওঠার সাথে সাথে রাষ্ট্রের মালিকেও পরিণত হয়। আর সমগ্র নিপীড়িত জনগণ রাষ্ট্রের ও কলকারখানার মেশিনের দাসে পরিণত হয়ে মানবেতর জীবনের ভাগ্যকে মেনে নেয়।

পাঁচ

শ্রমের বদৌলতে মানুষ আজ পৃথিবীতে মানুষ হয়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং প্রকৃতিকে জয় করে চলেছে। প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্বের এবং তার ফলে এ যাবৎ কালের অর্জিত মানুষের সকল সুকীর্তির ফসল ভোগ করার অধিকার আজকের দিনের সকল মানুষের আছে। তেমনি সত্যিকারের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা পাওয়ারও অধিকার সকল মানুষের রয়েছে। ভালো মেশিন চালক হওয়ার বা দক্ষ মজুর হওয়ার জন্য মানুষের জন্ম হয় নি। উৎপাদন যন্ত্র ও উন্নত প্রযুক্তি পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার ফলে শ্রমজীবী মানুষ পুঁজি ও যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদ এ দাসত্ব থেকে কোনো শ্রমজীবীকে রেহাই দিতে পারে না। একমাত্র সমাজতন্ত্রই পারে যন্ত্রকে মানুষের দাসে পরিণত করতে, অধীনতা মূলক যাবতীয় শৃঙ্খল থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে এবং বিশ্ব সভ্যতার যাবতীয় সুকীর্তির সাথে সকল মানুষকে সহগামী করতে। একজন মানুষ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলে নিজের পেশার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতে বাধা থাকে না। যেখানে শিক্ষাকে পণ্য করা হয় নি কিংবা পুঁজিবাদী দেশের মতো উচ্চ শ্রেণীর জন্য উচ্চ শিক্ষা আর নিচু শ্রেণীর জন্য টেকনিক্যাল শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করে রাখে না সেখানে ব্যক্তি জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে খণ্ডিত মানুষ হয়ে বেড়ে ওঠে না। সোভিয়েত শিক্ষাবিদ লুনাচারস্কি বলেন, 'কারও নির্বোধ হওয়া উচিৎ নয়। যাবতীয় বিজ্ঞান ও কলার মূল বিষয়গুলি সকলেরই জানা উচিত। মুচি কিংবা রসায়নের অধ্যাপক আপনি যাই হোন না কলা বিদ্যার একটিও বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে অবশ্যই আপনি হবেন এক চক্ষুহীন বা কালার মতো এক মারাত্মক পঙ্গু মানুষ।'[১]

মানব সমাজ শ্রম বিভাগের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি সুনাগরিককে তার কাজের নিজস্ব ক্ষেত্রে অবশ্যই নিখুঁত হতে হয় যদি রাষ্ট্র তার মৌলিক অধিকার পরিপূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। তাই বলে প্রতিটি মানুষের কেবল নিজের পেশাটুকু জানা তার নিয়তি হয়ে উঠবে না। কোন ইঞ্জিনিয়ার বা চিকিৎসক যদি সমাজ বিজ্ঞান,

ইতিহাস ও শিল্প সাহিত্যের সাধারণ বিষয়গুলি না জানে, আর কোনো ইতিহাসবিদ বা কোনো সাহিত্যিক দর্শন ও বিজ্ঞানের খবর না রাখে; যদি একজন আইনজীবী, অন্যজন ডাক্তার, আরেকজন রসায়নবিদ এভাবে প্রত্যেকে কেবল নিজের কাজটুকুর বাইরে অজ্ঞ থাকে তাহলে সে অবশ্যই একজন খণ্ডিত মানুষ হিসেবে বাস করবে। মানুষের শিক্ষা এমন হওয়া আবশ্যক, যে নিজের কাজের নাড়ি নক্ষত্র জানার সাথে সাথে জ্ঞানের সাধারণ ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত হবে, সচেতন থাকবে এবং সাহসিকতার সাথে বলতে পারবে 'মানবিক কোনো কিছুই আমার কাছে পর নয়।'

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় ও উচ্চ শিক্ষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পড়া আর মাধ্যমিক পর্যায়ে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ নেয়া ভিন্ন জিনিস।

২. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক, ১৯৮১, কলকাতা, পৃ. ৬৬।

৩. Biron Simon- intelligence Test, 1968, Lawrence and wishart, london, P-91.

৪. আনাতোলি লুনাচারস্কি, শিক্ষা ১৯৮৬, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃ. ১৫৯।

৫. 'যদি কোন সত্যিকার বুদ্ধিজীবী, সৎ বুদ্ধিজীবী, যার মন অর্জিতব্য অর্থের অঙ্কে, বিয়ের সম্ভাব্য পাত্রী, বাড়িঘর সাজানোর চিন্তায় ভরাট নয়, যে সত্যিকার ভালো ডাক্তার বা শিক্ষক হতে ইচ্ছুক, সে যদি নিজ বিজ্ঞানে আত্মসমর্পিত থাকে, আজীবন এতে তবে সে অবশ্যই সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠবে। যে বুদ্ধিজবী বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজের কাজকে সর্বতোভাবে বিচার বিবেচনা করে, সমাজতন্ত্রী হওয়াই তো তার নিশ্চিত ভবিতব্য। আর সে সমাজতন্ত্রী না হলে অবশ্যই তার বিবেককে হত্যা করতে হবে, নিজেকে বিবেকহীন হতে হবে।' আনাতোলি লুনাচারস্কি, শিক্ষা, ১৯৮৬, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো পৃ. ১০৪-১০৫।

৬. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা-৯২।

৭. প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা-৫২।

[*প্রভাষক, বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাঁশখালী ডিগ্রি কলেজ, চট্টগ্রাম।*]

সোনা ঃ অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আ. সা. ও. কারনী

ভূমিকা

সোনার প্রতি মানুষের আকর্ষণ দুর্নিবার। যুগ যুগ ধরেই উজ্জ্বল সোনালি রঙের এ ধাতুটি বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য সৃষ্টি করেছে অসহনীয় দারিদ্র আর মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান মানুষকে দিয়েছে সীমাহীন বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ। অতীতের গল্পকথায় সোনা চিত্রিত হয়েছে সকল অনর্থের মূল হিসাবে। এই সোনার লোভেই স্পেনীয়রা ধ্বংস করেছিল আজটেক আর মায়া সভ্যতা. পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন জাতির নাম নিশানা মুছেই স্পেনীয়. পর্তুগিজ আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা জাহাজ ভর্তি সোনা নিয়ে এসেছিল তাদের নিজ নিজ দেশে। এই স্বর্ণের অধিকার নিয়েই সংঘটিত হয়েছে একাধিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আমেরিকার সোনার দখল নিয়ে ইংল্যান্ড ও স্পেনের যুদ্ধ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সোনা নিয়ে ইংল্যান্ড ও ট্রান্সভালের যুদ্ধ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সোনার এক-একটি ভাণ্ডার আবিস্কৃত হবার সাথে সাথেই শুরু হয়েছিল এক একটি স্বর্ণতৃষ্ণা. জন্ম হয়েছিল অসংখ্য অপরাধ. মৃত্যু আর বিয়োগান্ত ঘটনার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনার সন্ধান পাবার পরের ঘটনাবলী আজও মূর্ত হয়ে আছে জ্যাক লন্ডনের বর্ণনায়।

অনাদিকাল থেকেই মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরি সকল সম্পদের মূল্যায়ন হয়েছে সোনা দিয়ে। ব্যবহার্য সকল সম্পদের মূল্যও নির্ধারিত হয়েছে সোনায়। আর তাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতর স্বর্ণকারদের নৈপুণ্য ও আন্তরিক নিষ্ঠায় তৈরি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত অসংখ্য সৃষ্টিও পুনরায় গলিয়ে ফেলা হয়েছে—এর একমাত্র কারণ এগুলি ছিল সোনার তৈরি।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সাথে সাথে সোনার তৈরি জিনিসপত্রও আবিষ্কৃত হওয়ায় সাধারণভাবে মনে করা হয় যে. তামা আহরণের সময় বা তারও আগে থেকেই মানুষ সোনা আহরণ শুরু করেছে। সম্ভবত মানুষের ব্যবহৃত

চতুর্থ বর্ষ : ২য় সংখ্যা. মার্চ-এপ্রিল ১৯৯১

ধাতুর মধ্যে সোনাই ছিল প্রথম। সোনা প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থাতে পাওয়া যায় বলে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পক্ষেও এ ধাতুটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল।

তবে প্রাচীনকালে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় উৎপাদিত সোনার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমিত সামান্য পরিমাণ এই সোনাই লোকের হাতবদল হত। আমেরিকা আবিষ্কার এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রাজিলে বিশালকায় স্বর্ণক্ষেত্রের বিকাশের ফলে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং বিশ্বে সোনার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে স্বর্ণের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৯ টন। উনবিংশ শতকের শুরুতে স্পেনের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকান উপনিবেশসমূহের যুদ্ধের ফলে সোনার উৎপাদন দারুণভাবে হ্রাস পেলেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সোনার বার্ষিক উৎপাদন ২০১৩ টনে উন্নীত হয়। বিংশ শতকের শুরুতে এ পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮৫৪ টনে উপনীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সোনার উৎপাদন পুনরায় হ্রাস পায়। ১৯৪০ সালে উৎপাদিত ১২৬৮ টনের স্থলে ১৯৪৫ সালে মাত্র ৮১২ টন সোনা উৎপন্ন হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বে সোনা উৎপাদনের বার্ষিক পরিমাণ প্রায় ১৫০০ টন। অনুমান করা হয় যে, এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে মোট প্রায় ৮০,০০০ টনেরও বেশি সোনা উৎপন্ন হয়েছে— তবে এর এক বিপুল পরিমাণ অংশই জমা হয়ে আছে বিশ্বের সুরক্ষিত ব্যাংকসমূহের নিরাপদ প্রকোষ্ঠে অথবা সাবধানী মানুষের গোপন ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে।

সোনার হরিণের খোঁজে

বস্তুজগতে সোনার গুরুত্বের জন্যই প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সোনা আহরণে মানুষ তার মেধা ও শক্তিকে সর্বতোভাবে প্রয়োগ করেছে। সোনা নিষ্কাশনের পদ্ধতি আয়ত্ত করে মিশরীয়গণ দ্রুত উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, চতুর্থ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে সাধারণ ধাতুকে সোনায় পরিণত করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছেন আলকেমিস্টরা। সোনাসন্ধানী এই আলকেমিস্টরা পারদ, গন্ধক ও সোহাগার সংমিশ্রণে এমন একটি শক্তিশালী 'রস' তৈরি করতে চেয়েছিলেন যার ছোঁয়ায় যেকোন ধাতু সোনায় পরিণত হতে পারে। সাধারণ ধাতুকে সোনায় পরিণত করতে সফল না হলেও আলকেমিস্টদের সেই নিবেদিত প্রয়াস একেবারে নিস্ফল হয় নি। তাদের ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তবে আশার কথা এই যে, পরশ পাথরের সন্ধানে মেধা ও শক্তির অপচয় না করে ভূতত্ত্ববিদগণ নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন সোনার নতুন নতুন প্রাকৃতিক ভাণ্ডার খুঁজে বের করার কাজে। আর প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত সেই আকরিকের বিপুল পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দূর করে তা থেকে লাভজনকভাবে সোনা নিষ্কাশনের পন্থা উদ্ভাবনে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন ধাতুবিদগণ। তারই ফলস্বরূপ সাধারণ ধাতুকে

সোনায় রূপান্তরিত করা সম্ভব না হলেও প্রকৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত এই ধাতুটি নিষ্কাশনে বিভিন্ন লাভজনক পদ্ধতি আজ মানুষের করায়ত্ত হয়েছে।

নিষ্কাশন

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সোনার সিংহভাগই মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে এই সোনা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৫-৩৫ শতাংশ রূপা, প্রায় ২০ শতাংশ তামা এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ সোনার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। তবে মজার বিষয় এই যে, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সোনা, তামা ও রূপার এই সংকরের গঠন ও উপাদান বিন্যাস মানুষের তৈরি অনুরূপ রাসায়নিক গঠনবিশিষ্ট সংকরের চাইতে ভিন্ন।

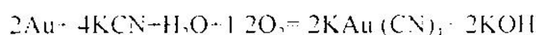
সাধারণত ১ টন খনিজে সোনার পরিমাণ ৫-১৫ গ্রাম হলেই তা থেকে সোনা নিষ্কাশন লাভজনক হতে পারে। প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের ফলে আজকাল অবশ্য ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে সঞ্চিত খনিজে টনপ্রতি মাত্র ১ গ্রাম সোনা থাকলেও তা থেকে লাভজনকভাবে সোনা উৎপাদন সম্ভব। খনিজ থেকে সোনা নিষ্কাশনের পদ্ধতি সোনার খনিজের প্রকৃতি এবং এই খনিজের সঙ্গে মিশ্রিত অন্যান্য পদার্থের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে। খনিজে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকভাবে নিষ্কাশনযোগ্য তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত থাকলে প্রথমত এই ধাতুগুলি এবং পরে সোনা নিষ্কাশন করা হয়। সোনা উৎপাদনের এ পদ্ধতি সবচাইতে লাভজনক। ভূতত্ত্ববিদদের মতে পৃথিবী সৃষ্টির শুরুতে এক জটিল ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় কোয়ার্জে প্রোথিত সরু ফাটল যোগ সঞ্চিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে আশপাশের কোয়ার্জে স্থানান্তরিত হয়ে এতে প্রোথিত সরু ফাটলে সঞ্চিত এই সোনা আলগা হয়ে পড়ে এবং পানির স্রোতের সাথে স্থানান্তরিত হয়ে অন্যত্র জমা হয়। এভাবেই উৎপত্তিস্থল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ধীরে ধীরে সোনার এক নতুন ভাণ্ডার গড়ে ওঠে। সম্ভবত প্রথম দিকে এই সোনাই মানুষের নজরে এসেছিল। সোনাযুক্ত এই পানির উৎস খুঁজতে গিয়েই মানুষ পাথরের স্তরের মধ্যে সোনাযুক্ত কোয়ার্জের শিরা আবিষ্কার করে।

এ থেকে সোনা নিষ্কাশনের জন্য এগুলি একটি চালুনিতে নিয়ে চালুনিটি পানিতে নিমজ্জিত রেখে সজোরে আন্দোলিত এবং মাঝে মাঝে কাত করে ধূলাবালি এবং হালকা অপদ্রব্য সোনা থেকে পৃথক করে ফেলা হয়। এভাবে চালুনিটি পুনঃপুনঃ আন্দোলিত ও কাত করে (সামান্য কিছু পরিমাণ ভারী অপদ্রব্য ছাড়া) অন্যান্য সকল পদার্থ সোনা থেকে পৃথক করে ফেলা সম্ভব। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এভাবে সোনা পৃথক করার সময় সোনার কণার বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয়না। তবে এ পদ্ধতি অত্যন্ত ধীর ও কষ্টসাপেক্ষ। এতে শুধু একটি কোদাল, চালুনি এবং খোচানি প্রয়োজন হয় বলে সোনা নিষ্কাশনের এ পদ্ধতি গরিবের পদ্ধতি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

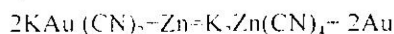
আধুনিক একটি পদ্ধতিতে পানির স্রোতের সাহায্যে কাদাবালি ও ভারী পদার্থসমূহ থেকে সোনা পৃথক করা হয়। এজন্য হেলানো একটি চ্যানেল বা সুইচ ব্যবহার করা

হয়। হেলানো এই সুইচের তলদেশে একটি ধাতব অথবা আঁশবিশিষ্ট কাপড়ের ছাকনী স্থাপন করা হয় এবং উপরিভাগ থেকে সোনার খনিজ ও পানির মিশ্রণ নিচে গড়িয়ে পড়তে দেয়া হয়। ফলে হালকা পদার্থ এবং পাথরের কণাসমূহ পানির তোড়ে ভেসে গেলেও সোনা এবং অন্যান্য ভারী পদার্থসমূহ সুইচের তলদেশে স্থাপিত কাপড়ের আঁশে আটকা পড়ে। কিছু সময় পর পর এ কাপড় থেকে সোনার কণা সরিয়ে নেয়া হয়। এই পদ্ধতিতে সোনা থেকে তামা ও লোহার অক্সাইডের ভারী কালো কণা পৃথক করা সম্ভব হয়না, তাই পরবর্তীতে একটি চুম্বকের সাহায্যে লোহার কালো অক্সাইড এ মিশ্রণ থেকে পৃথক করে ফেলা হয়।

পারদ খুব সহজেই সোনার সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে, এমনকি কক্ষ তাপমাত্রাতেই পারদ সোনার সংস্পর্শে আশা মাত্রই 'এমালগাম' নামে পরিচিত একটি সংকর তৈরি হয়। মিশ্রিত অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ থেকে সহজেই এ 'এমালগাম' পৃথক করে ফেলা যায়। আর তাই সোনা নিষ্কাশনের জন্য পৃথকীকৃত এবং ঘনীভূত স্বর্ণকণাসমৃদ্ধ খনিজ চূর্ণ করে তাতে পারদ মিশ্রিত করে 'এমালগাম' তৈরি করা হয়। অতঃপর কাপড় বা চামড়ার সাহায্যে চাপ দিয়ে 'এমালগাম' থেকে অতিরিক্ত পারদ বের করে দেয়া হয়। তবে 'এমালগাম' তৈরির মাধ্যমে সোনা নিষ্কাশনের এ পদ্ধতিতে অন্যান্য মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়না— এমনকি আকরিকের সম্পূর্ণ স্বর্ণ আহরণও সম্ভব হয় না। এ অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সায়ানাইড পদ্ধতি নামে অভিহিত একটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এ পদ্ধতিতে ক্ষারীয় বা ক্ষার-মৃত্তিকাজাতীয় সায়ানাইড দ্রবণে নিম্নবর্ণিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়।


$2Au + 4KCN + H_2O + 1 2O_2 = 2KAu(CN)_2 + 2KOH$

অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ সায়ানাইডে দ্রবীভূত হয় না এবং ফলে ছেঁকে সহজেই পৃথক করে ফেলা সম্ভব হয়। অবশেষে এ দ্রবণ থেকে সোনার অধঃক্ষেপ তৈরি করে সোনা পৃথক করা হয়।


$2KAu(CN)_2 + Zn = K_2Zn(CN)_4 + 2Au$

এমালগাম পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ সোনা নিষ্কাশন সম্ভব, পক্ষান্তরে সায়ানাইড পদ্ধতিতে ৯৫-৯৭ শতাংশ সোনা নিষ্কাশিত হয়। তবে সহজ, অল্প ব্যয়সাপেক্ষ এবং অপেক্ষাকৃত বড় কণা থেকে সোনা নিষ্কাশনের জন্য অধিকতর উপযোগী এমালগাম পদ্ধতি আজও বহুল ব্যবহৃত।

বিশুদ্ধতা নির্ণয়

প্রায় চার হাজার বছর আগে প্রাচীন মিসরীয়রা সোনার বিশুদ্ধতা নির্দেশের রীতি চালু করেন। তারপর বিভিন্ন সময়ে এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানেও এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রীতি চালু আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে সহস্রাংশের ভিত্তিতে সোনার বিশুদ্ধতা নির্দেশিত হয়। এই পদ্ধতিতে

এক কিলোগ্রাম সোনায় ২৫০ গ্রাম অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকলে সেই সোনার বিশুদ্ধতার মান ৭৫০। অপরদিকে ব্রিটেন, সুইজারল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে বিশুদ্ধতার পরিমাণ নির্দেশে 'ক্যারট' ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে সবচাইতে বিশুদ্ধ সোনাকে ২৪ ক্যারট হিসাবে নির্দেশ করা হয়, সোনার খাঁদ বা অপদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি সাথে সাথে ক্যারট নির্দেশক সংখ্যার মান হ্রাস পায়। যেমন, ২২ ভাগ স্বর্ণ এবং ২ ভাগ অপদ্রব্যের মিশ্রণ এ পদ্ধতিতে ২২ ক্যারট নামে অভিহিত হয়। পরীক্ষাগারে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্য নেয়া হয়। তবে স্বর্ণকারগণ কোন একখণ্ড সোনার বিশুদ্ধতা নিরূপণে যথেষ্ট শক্ত ও কালো রঙের একটি কষ্টিপাথর ব্যবহার করে থাকেন। সোনার যে টুকরার বিশুদ্ধতা নির্ণয় করতে হবে তার সাহায্যে এ কষ্টিপাথরে ৩/৪ মি.মি. চওড়া একটি দাগ দেয়া হয়। তারপর বিশুদ্ধতা জানা আছে এমন একটি সোনার সূঁচের সাহায্যে এর পাশেই আর একটি দাগ দেয়া হয়। এ দাগ দুটো একই রঙের হলে তাদের বিশুদ্ধতা একই পরিমাণ, দাগ দুটির রং এক রকম না হলে অপর একটি (জানা আছে এতটা বিশুদ্ধ) সোনার সূঁচের সাহায্যে আবার দাগ দেয়া হয়। এভাবেই যতক্ষণ দুটো দাগ এক রকম না হয় ততক্ষণ পরীক্ষার কাজ চলতে থাকে। সবশেষে একটি বিশেষ দ্রবণের সাহায্যে একই রকম রঙ বিশিষ্ট দাগ দুটিকে ভিজিয়ে দেয়া হয়। এতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় স্বর্ণের সূক্ষ্ম কণা উৎপন্ন হয় এবং এ কণার রঙ সোনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এখন পরীক্ষা করা হচ্ছে এমন খণ্ডের কণার রঙ অধিকতর হালকা বলে তবে অপদ্রব্যের পরিমাণ বেশি বলে সহজেই বোঝা যায়। এভাবেই একজন অভিজ্ঞ স্বর্ণকার স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করে থাকেন। আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত সহজ এ পদ্ধতিটি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য এবং সোনার বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে বহুল ব্যবহৃত। তবে আমাদের ব্যবহৃত সোনার প্রায় সবটাই খাঁদমিশ্রিত। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিশুদ্ধ সোনা তৈরি সম্ভব হলেও সাধারণত খাঁদমিশ্রিত সোনা আমরা ব্যবহার করি কেন? এর প্রধান কারণ এই যে, ধাতুসমূহের মধ্যে সোনাই সবচাইতে টান ও চাপ প্রসর। মাত্র এক গ্রেন পরিমাণ সোনাকে টেনে প্রায় ১$^1/_2$ মাইল লম্বা তার তৈরি এবং এই একই পরিমাণ সোনাকে পিটিয়ে বা চাপ দিয়ে প্রায় ৬ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট শিট তৈরি করা সম্ভব; বস্তুতপক্ষে বিশুদ্ধ সোনা এতই নমনীয় যে, হাতের নখের সাহায্যে একখণ্ড সোনায় আচড় দেয়া সম্ভব। আর তাই শক্তিবৃদ্ধি করে ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্যই সোনায় খাঁদ মিশানো হয়। সোনার সাথে সাধারণত তামা, রূপা, ক্যাডমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত করা হয়। এতে সোনার শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে রঙেরও খানিকটা পরিবর্তন ঘটে।

ব্যবহার

সোনা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় একটি ধাতু। দীর্ঘদিন ফেলে রাখলেও এর উজ্জ্বল্য তেমন হ্রাস পায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে হাজার হাজার বছর আগের (নয়াপ্রস্তর যুগের) যে সোনা পাওয়া গিয়েছে তার উজ্জ্বল্য আজও এতটুকু ম্লান হয় নি। বার বার গলিয়ে

আকৃতি প্রদানের প্রক্রিয়াতেও এই ধাতুটি খুব সামান্যই নষ্ট হয়। তদুপরি আমরা আগেই বলেছি বিশুদ্ধ সোনা অত্যন্ত নমনীয়। বিশুদ্ধ সোনার এই নমনীয়তার দরুন একখণ্ড সোনায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নকশা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। উপরোক্ত গুণাবলীর জন্যই যুগ যুগ ধরে মুদ্রা ও অলঙ্কার তৈরি এবং অন্যান্য বস্তুর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সোনা ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মুদ্রা তৈরিতে

মুদ্রা তৈরিতে প্রায় সার্বজনীনভাবে সোনা এবং তামার সংকর ব্যবহৃত হয়েছে। সোনার সঙ্গে তামার মিশ্রণে যথেষ্ট শক্ত এবং সোনার চাইতে গাঢ় রঙের একটি সংকর তৈরি হয়। মুদ্রা তৈরিতে সোনার ব্যবহার ঠিক কবে প্রচলিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতকে গ্রিসে এবং প্রথম শতকে আর্মেনিয়ায় প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পাওয়া গেছে। মুসলিম শাসন আমলের শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মুদ্রা তৈরিতে প্রায় ৯৫ শতাংশ সোনা বিশিষ্ট সংকর ব্যবহৃত হত। সোনার মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহৃত সংকরে সোনার পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে তা প্রায় ৮০ শতাংশে নেমে আসে। ব্রিটেনে মুদ্রা তৈরিতে সোনা ও ১০ শতাংশ তামা বিশিষ্ট সংকর ব্যবহৃত হত। কাগজের মুদ্রার প্রবর্তনের ফলে বর্তমান বিশ্বে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন সীমিত হয়ে পড়েছে। তবে আজও কোন দেশের বাজারে প্রচলিত মুদ্রার মোট পরিমাণ এবং সেই দেশের সোনার মজুতের পরিমাণের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। যে দেশের সোনার সরকারি ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে দেশ তত ধনী। আন্তর্জাতিক লেনদেনেও সোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অলঙ্কার নির্মাণে

সোনার সবচাইতে জনপ্রিয় ব্যবহার অলঙ্কার নির্মাণে। তবে স্বর্ণালঙ্কার তৈরিতেও বিশুদ্ধ সোনার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। স্মরণাতীতকাল থেকেই এ কাজে সোনা এবং তামা, রূপা, নিকেল, প্যালাডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সংকর ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পৃথক করার প্রযুক্তি অজ্ঞাত থাকায় প্রাচীন যুগের সোনার অলঙ্কারসমূহে অসমিয়াম, ইরিডিয়াম, রুথনিয়াম প্রভৃতি প্লাটিনাম গ্রুপভুক্ত ধাতুসমূহের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। আধুনিককালে অবশ্য উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্যে প্লাটিনাম গ্রুপভুক্ত ধাতুসমূহ সোনা থেকে পৃথক করে ফেলা হয়। আর তাই কোন অলঙ্কার সত্যি সত্যিই প্রাচীনকালের কিনা তা সুনির্দিষ্টভাবে যাচাই করতে এসব অলঙ্কারে প্লাটিনাম গ্রুপভুক্ত এ ধাতুসমূহের উপস্থিতিও অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

অলঙ্কার তৈরিতে ১৮ ক্যারেট সোনার ব্যবহারই সবচাইতে ব্যাপক। ইউরোপীয় দেশসমূহে বিয়ের আংটি তৈরিতে সোনার সঙ্গে তামার সাথে সামান্য পরিমাণ রূপাও মিশ্রিত করা হয়। এতে সংকরটির রঙ খানিকটা হালকা হয়। অলঙ্কার নির্মাণে একসময়

প্লাটিনাম যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে অস্ত্রপ্রাচারের যন্ত্রপাতি নির্মাণে প্লাটিনাম ধাতুর চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার ফলে অলঙ্কার নির্মাণে ব্যবহারের জন্য এই ধাতুটির প্রাপ্যতা হ্রাস পায়। ফলে ৯ ক্যারট সোনায় যথেষ্ট পরিমাণ নিকেল বা প্যালাডিয়াম মিশ্রিত করে প্লাটিনামের মত সাদা একটি সংকর তৈরি করা হত। অলঙ্কার তৈরিতে সাদা সোনা নামে অভিহিত এই সংকরের ব্যবহার বেশ উল্লেখযোগ্য। ৯ ক্যারট সোনায় শুধু রূপা যুক্ত করা হলে সংকরটি সম্পূর্ণ সাদা রঙ বিশিষ্ট হয়, আবার শুধুমাত্র তামা যুক্ত করা হলে সংকরটি তামার মত লালচে রঙবিশিষ্ট হয়। এবং খানিকটা রূপাও যুক্ত করা হয়। আমাদের দেশে অলঙ্কার তৈরিতে 'রোল্ড গোল্ড' বহুল ব্যবহৃত। এই রোল্ড গোল্ড আসলে পিতল বা ইস্পাতের উপর ৯ ক্যারট সোনার আস্তর দিয়ে তৈরি একটি ধাতুসংকর।

শুধুমাত্র সোনার অলঙ্কার তৈরির পাশাপাশি অনেক সময় ব্রোঞ্জ, তামা, রূপা প্রভৃতি কম দামী ধাতুর উপর সোনার সূক্ষ্মপাত মুড়ে দেয়া হত। পিটিয়ে অতিসূক্ষ্ম পাত তৈরির প্রযুক্তি আয়ত্ত করার পর পিটিয়ে তৈরি করা অতি সূক্ষ্ম সোনার পাত আঠাজাতীয় পদার্থের সাহায্যে অন্য একটি ধাতুর তৈরি জিনিসের উপর লাগিয়ে দেয়ার প্রচলন হয়। অনেক সময় এমনকি কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এগুলির উপর সোনার পাত মুড়ে দেয়া হত। প্রায় ৫০০০ বছর আগে প্রাচীন মিশরের সম্রাট ফারাও ও তাদের সভাসদদের কাঠের তৈরি আসবাব এবং এমনকি শবাধার এভাবে সোনা দিয়ে মুড়ে দেয়ার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

একটি ধাতু সোনা দিয়ে মুড়ে দেবার জন্য অনেক সময় আবার ধাতুটির উপর সোনার একটি সূক্ষ্ম পাত বসিয়ে তাপ প্রয়োগ করা হত। এতে সম্প্রবেশনের মাধ্যমে উপরের আস্তরের সোনা ও নিচের ধাতুটির মধ্যে একটি শক্তিশালী বন্ধন তৈরি হত।

খৃস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে চীনে সোনার আস্তর প্রদানের এক যুগান্তকারী পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে এবং বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তড়িৎলেপন পদ্ধতি উদ্ভাবনের পূর্ব পর্যন্ত তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। চীনারা দেখান যে, সোনা ও পারদের এমালগাম রূপা বা তামার তৈরি বস্তুর একটি পরিচ্ছন্ন ত্বকের উপর ছড়িয়ে দিয়ে তাপ প্রয়োগ করা হলে পারদ বাষ্পীভূত হয়ে দূর হয় এবং বস্তুটির উপর সোনার একটি আস্তর পড়ে। আজও বিশ্বের বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত হাজার হাজার বস্তু এ-দ্ধতির ব্যাপক প্রচলনের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

তবে সোনার আস্তর প্রদানের এই কাজটি অনেক সময় মানুষের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেড়ে নিয়েছে অসংখ্য মূল্যবান জীবন। পিটার্সবার্গে অবস্থিত সেইন্ট আইজ্যাকের ক্যাথেড্রালের ২২ মিটার উঁচু তামার তৈরি ডোমটি সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ-জন্য তামার এই ডোমটি ভালভাবে পরিষ্কার করে পেস্টসদৃশ হলুদ রঙের এমালগাম দিয়ে এর উপর

একটি আস্তর দেয়া হয়। তারপর কাঠকয়লার আগুনে উত্তপ্ত করে পারদ বাষ্পীভূত করা হয় এবং সোনার আস্তরযুক্ত হয়ে ডোমটি সূর্যের চাইতেও চকচকে হয়ে ওঠে। এই আপাত-সহজ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকগণ পরে এক অজ্ঞাত ও অত্যন্ত কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান। তখন এই রোগটিকে রহস্যজনক মনে করা হলেও আধুনিক জ্ঞানের সাহায্যে আজ আমরা জানি যে, এই শ্রমিকগণ পারদের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। দেড়-শতাধিক বছর অমলিন অম্লান থেকে সেইন্ট আইজ্যাকের ক্যাথেড্রালের এই ডোমটি আমাদের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে এতদঞ্চলে উন্নততর একটি প্রযুক্তির মাধ্যমে কোন বস্তুর বহিরাবরণে বিশুদ্ধ সোনার অতি সূক্ষ্ম আস্তর তৈরির তড়িৎ-রাসায়নিক একটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অপরদিকে দক্ষিণ আমেরিকায় সোনা ও তামার সংকর দিয়ে তৈরি বস্তু বিভিন্ন ফল থেকে তৈরি কোমল এসিডে ডুবিয়ে উপরের স্তরের তামা দ্রবীভূত করে ফেলা হত। ফলে বস্তুটির উপরের ত্বকে বিশুদ্ধ সোনার একটি আস্তর তৈরি হত।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সোনার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সোনার অলঙ্কার ব্যবহারের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। তবে অত্যন্ত অল্পমূল্যে তৈরি পিতল বা রূপার অলঙ্কারের উপর সোনার একটি সূক্ষ্ম প্রলেপ প্রদান সম্ভব করে সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানীরা এই দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন মিটানোর একটি বিকল্প পন্থা উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী ভারতে এভাবে তৈরি অলঙ্কার বেশ জনপ্রিয়।

সোনার সাম্প্রতিক ব্যবহার

সোনার সাম্প্রতিক ব্যবহারগুলির মধ্যে (১) ক্ষয়ে বা ভেঙে যাওয়া দাঁত মেরামত, (২) মহাশূন্যযান, যোগাযোগ উপগ্রহ প্রভৃতির বিয়ারিং জাতীয় যন্ত্রাংশে পিচ্ছিলকারক এবং (৩) স্থায়িত্ব ও কার্যকরিতা বৃদ্ধির জন্য ইলেকট্রনিক বর্তনীর সংযোগ-বিন্দুর উপর সোনার একটি সূক্ষ্ম আস্তর প্রদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একই সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত সোনার তৈরি বস্তুসমূহের সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ সে যুগের সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অবস্থার একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের কিছু কিছু হারানো সূত্র উদ্ধারে প্রাচীন মুদ্রা ও অলঙ্কারের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের সফল ব্যবহার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। নিম্নে এ বিষয়গুলির উপর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

দাঁত মেরামত

ক্ষয়ে বা ভেঙে যাওয়া দাঁত মেরামত বা তুলে ফেলে সে স্থানে অন্য একটি দাঁত লাগানোর প্রচলন দীর্ঘ দিনের। প্রথম দিকে এ কাজে অন্য একজন মানুষের দাঁত বা হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি দাঁত ব্যবহার করা হত। পরবর্তীকালে মানুষ বা হাতির দাঁতের

পরিবর্তে চীনামাটির তৈরি দাঁতের ব্যবহার শুরু হয়। এই নকল দাঁত যাতে মাড়ির সঙ্গে শক্তিশালী একটি বন্ধন তৈরি করতে পারে সেজন্য অনেক সময় মাড়ির উপর সোনার একটি সূক্ষ্ম পাত স্থাপন করে তার উপর নকল দাঁতটি বসিয়ে দেয়া হত। এ জন্য প্রথমত প্লাস্টার অব প্যারিসের সাহায্যে মাড়ির সংশ্লিষ্ট অংশের একটি প্রতিকৃতি তৈরি করা হত। তারপর প্লাস্টার অফ প্যারিসের তৈরি এই প্রতিকৃতির উপর সোনার পাতটি মাড়ির উপরিভাগে বসিয়ে তার উপর চীনামাটির নকল দাঁতটি বসিয়ে দেয়া হত। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এ পদ্ধতির প্রচলন বেশ ব্যাপক ছিল।

যীশুখৃস্টের জন্মের ৪০০-৬০০ বছর আগে দাঁত যথাস্থানে রাখার জন্য সোনার তৈরি তার দিয়ে বেঁধে রাখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। দাঁত বাঁধাতে সোনা ব্যবহারের শুরুতে বিশুদ্ধ সোনা ব্যবহার করা হত। পরবর্তীতে মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহৃত ৯০ শতাংশ সোনা ও ১০ শতাংশ তামার সংকর এ কাজে ব্যবহৃত হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সোনার চাইতে প্লাটিনামের মূল্য কম থাকায় অর্থনৈতিক কারণে খানিকটা সোনার বদলে প্লাটিনাম ব্যবহার করে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া যায়। ফলে ১৯২০ সালের দিকে প্লাটিনামের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে সোনার চাইতে বেশি হলেও পরীক্ষিত উন্নততর গুণাবলী, বিশেষত দীর্ঘতর স্থায়িত্ব, নমনীয়তা ও শক্তির জন্য সোনার সাথে প্লাটিনামের ব্যবহার অব্যাহত থাকে।

আজকাল একটি শক্ত দাঁতের মধ্যে সরল আকৃতির একটি গর্ত তৈরি হলে অনেক সময় বিশুদ্ধ সোনার সাহায্যে তা পূরণ করা হয়। এজন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ (৯৯.৯৯%) সোনার অতি সূক্ষ্ম পাত থেকে গোলাকার একটি খণ্ড তৈরি করে হাতুড়ির সাহায্যে পিটিয়ে দাঁতের গর্তটি বন্ধ করে দেয়া হয়। বিশুদ্ধ সোনা অত্যন্ত নমনীয় হওয়ায় প্রযুক্ত বলের সাহায্যে দাঁতের গর্তটি পরিপূর্ণভাবে বন্ধ করে বেশ শক্ত এবং স্থায়ী বন্ধন তৈরি সম্ভব। এভাবেই দীর্ঘস্থায়ী একটি সমাধান সম্ভব হয়। তবে এ পদ্ধতিতে প্রচুর সময় দরকার হয় এবং যথেষ্ট শক্ত একটি দাঁতে সরল আকৃতির কোন গর্ত তৈরি হলেই কেবল এ পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব।

অপরদিকে ঘর্ষণ ও চাপের সন্মুখীন হয় এমন একটি দাঁত বাঁধাতে ব্যবহৃত সংকরের আকৃতি পরিবর্তন ও ক্ষয়রোধ ক্ষমতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত দাঁতের অংশবিশেষ বাঁধাতে অথবা তুলে ফেলা দাঁতের স্থানে তৈরি একটি দাঁত বসানোর সময় উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে বিশেষত দুটি দাঁতের মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান যথাযথভাবে পূরণ করতে জটিল ও সূক্ষ্ম ঢালাইপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিমাপ বজায় রাখতে হয় বলে ঢালাইয়ের এই কাজটি বেশ জটিল। প্রথমত জমাট বাঁধার পর তাপমাত্রা হ্রাস পাবার সাথে সাথে ঢালাইকৃত দাঁতটির আকৃতির খানিকটা সংকোচন ঘটে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ঢালাইয়ের পূর্বে তাপ প্রয়োগ করে ছাঁচটিকে উত্তপ্ত ও এমনভাবে প্রসারিত করে নেয়া হয়, যাতে জমাট বাঁধার

পর ধাতুটির সংকোচন ঘটলেও যথাযথ পরিমাপের দাঁত তৈরি করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যবহৃত গলিত ধাতুটির তরলতা এমন হওয়া উচিৎ যাতে তা ছাঁচটির সকল অংশই সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

মানুষের দাঁত বাঁধানোর এই কাজে কম খরচে এবং সহজেই তৈরি করা সম্ভব অথচ টেকসই, শক্ত, রং মলিন হয় না এবং রাসায়নিক ও ঘর্ষণজনিত ক্ষয়রোধে সক্ষম একটি ধাতুসংকরের জন্য মানুষের দীর্ঘদিনের নিরলস প্রয়াসের একটি পর্যায়ে প্রায় ৬০-৭০ বছর আগে এ কাজে সোনার সংকরের ব্যবহার শুরু হয়। দাঁত বাঁধানোর কাজে সচরাচর ব্যবহৃত সোনার সংকরগুলিতে অন্ততপক্ষে ৭৫ শতাংশ সোনা, প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় ধাতু এবং অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ তামা, রূপা ও দস্তা থাকে।

উন্নততর গুণাবলীর জন্য প্রচলনের পর থেকেই দাঁত বাঁধানোর কাজে সোনা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর তাই ব্যবহৃত সোনা-সংকরের গুণাবলীর অনুরূপ গুণাবলী বিশিষ্ট সংকর উদ্ভাবনের প্রয়াস শুরু হয় এবং সোনার উচ্চমূল্য নতুন সংকর উদ্ভাবনের এই প্রয়াসে ইন্ধন যোগাতে থাকে। মানুষের নিরলস প্রচেষ্টায় সাম্প্রতিককালে এ কাজে বেশ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মূলত অর্থনৈতিক কারণে বিকল্প সংকরগুলি ইতোমধ্যে বেশ কিছুটা জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছে। তবুও নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, পরীক্ষিত উন্নততর গুণাবলীর জন্যই অন্তত আরও কিছুদিন দাঁত বাঁধানোর কাজে মানুষকে মূলত সোনাভিত্তিক সংকরগুলির উপরই নির্ভর করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, শুধু দাঁত মেরামতই নয়, এক সময় সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও সুস্থ সবল দাঁতে সোনার কারুকাজ করা হত। প্রাচীনকালে চীনের মহিলাদের হাসি আরও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে সবল দাঁতে ছিদ্র করে সোনার কারুকাজ করার প্রথা বেশ জনপ্রিয় ছিল।

পিচ্ছিলকারক হিসাবে

ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে দুটি ধাতুখণ্ডের বহিরাবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অনেক সময় ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পৃথক হয়ে পড়া ধাতুকণা গলিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। তাপমাত্রা হ্রাস পেলে গলিত এই ধাতু জমাট বাঁধে, ফলে ঘূর্ণায়মান দুটি ধাতুখণ্ডের মধ্যবর্তী অংশে পিচ্ছিলকারক পদার্থ ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। মহাশূন্যযান, যোগাযোগ উপগ্রহ প্রভৃতির উচ্চ-তাপমাত্রা, বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ এবং বিকিরণ পরিবেশে ব্যবহৃত পিচ্ছিলকারক পদার্থগুলি দীর্ঘ সময় ব্যবহার উপযোগী এবং অত্যন্ত উন্নত গুণাবলী বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পিচ্ছিলকারক হিসাবে সচরাচর ব্যবহৃত গ্রীজ ও তেল জাতীয় পদার্থগুলি উচ্চতর তাপমাত্রায় সহজেই বাষ্পীভূত হয় এবং বিকিরণের ফলে বিনষ্ট হয়। আবার সীসা, রূপা, টিন প্রভৃতি ধাতুর সূক্ষ্ম আস্তর পিচ্ছিলকারক হিসাবে বেশ কার্যকর হলেও এগুলি সহজেই জারিত হয় এবং অল্প তাপমাত্রাতেই গলে যায়। ফলে এগুলি মহাশূন্যযান, যোগাযোগ উপগ্রহ প্রভৃতিতে ব্যবহার উপযোগী নয়।

পক্ষান্তরে সোনা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় একটি ধাতু এবং তুলনামূলকভাবে এর গলনাঙ্ক, সর্বোপরি উচ্চ-বিকিরণ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য মহাশূন্যযান ও যোগাযোগ উপগ্রহের বিয়ারিং, গিয়ার প্রভৃতিতে পিচ্ছিলকারক হিসাবে সোনার সূক্ষ্ম আস্তরের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একটি বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে উচ্চবিভব বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে সোনা বাষ্পীভূত করে অন্য একটি ধাতুর উপর সোনার একটি সূক্ষ্ম আস্তর তৈরির পদ্ধতি এক্ষেত্রে সবচাইতে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ধাতু ছাড়াও অন্যান্য পদার্থ যেমন কাঠ, কাগজ প্রভৃতিতে সোনার আস্তর প্রদান সম্ভব।

ইলেকট্রনের বর্তনী তৈরিতে

ক্ষারীয় ধাতুসমূহ সহজে জারিত অথবা রাসায়নিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ-জন্যই ইলেকট্রনিক বর্তনী বিশেষত স্বল্প-বৈদ্যুতিক বিভবচালিত এবং স্বল্প-বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এমন বর্তনীর সংযোগ বিন্দুসমূহ নির্মাণে ক্ষারীয় ধাতু ব্যবহার করা হলে জারণের ফলে রোধশক্তি বৃদ্ধি এবং ফলে বর্তনীর কার্যকরিতা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে। অতুলনীয় নিষ্ক্রিয়তা ও স্বল্প-রোধনমানের জন্য এসব বর্তনীর সংযোগ বিন্দুসমূহের উপর সোনার সূক্ষ্ম আস্তর প্রদান করা হলে জারণ প্রতিহত হয়, বর্তনীর রোধনমান অপরিবর্তিত থাকে এবং ফলে বর্তনীর স্থায়িত্ব ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে ০৫ থেকে ৫ মাইক্রোমিটার পুরু সোনার একটি আস্তর এ-জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সোনার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে শুধুমাত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশে সোনার আস্তর প্রদানের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। একই সঙ্গে আধা নিষ্ক্রিয় ধাতুর তৈরি সংযোগের উপর সোনার আরো সূক্ষ্ম (মাত্র ০০৫-০২৫ মাইক্রোমিটার পুরু) একটি আস্তর প্রদান করে ক্ষারীয় ধাতুর উপর প্রদত্ত সোনার পুরু আস্তরের অনুরূপ সন্তোষজনক ফললাভ সম্ভব হয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ইলেকট্রনিক বর্তনীর সংযোগ বিন্দুতে আস্তর প্রদানের জন্য তড়িৎলেপন পদ্ধতিই সবচাইতে কার্যকর।

ইতিহাস চর্চায়

প্রাচীনকালের স্বর্ণালংকার ও প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাসের কিছু কিছু হারানোর সূত্র পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। পরবর্তীকালে 'আপেক্ষিক ঘনত্ব পরিমাণ' পদ্ধতি ব্যবহার করে বিনষ্ট না করেই প্রাচীন মুদ্রা ও অলংকারের বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। আপেক্ষিক ঘনত্ব পরিমাণ পরীক্ষার ফলে বিপুল সংখ্যক মুদ্রা ও অলংকার পরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে অপেক্ষকৃত বৃহদাকার এবং

ঢালাই করে তৈরি প্রস্তরখচিত অলংকার ও অন্যান্য দ্রব্য এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

১৯৬০-এর দশকে এ কাজে রঞ্জনরশ্মি ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে অতি ক্ষুদ্র স্থানের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। সুস্পষ্ট কার্যকরিতার জন্য উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়েই এ পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয় এবং ফলস্বরূপ অতি-অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ উপাত্ত সংগৃহীত হয়। দেখা যায় যে, ইসলামের প্রসার এবং বারবারিয়ানদের ইউরোপে আক্রমণের ফলে ৭ম শতকে ইউরোপে ব্যাপকভাবে সোনার সরবরাহ হ্রাস পায় এবং মুদ্রা তৈরিতে অধিকতর পরিমাণ খাঁদ মিশ্রিত হতে থাকে। এ তথ্য ব্যবহার করেই ঐতিহাসিকগণ ঐতিহাসিক কিছু কিছু ঘটনার সময়কাল নির্ধারণে সক্ষম হন। যেমন ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে সালফকের সাটন হূ এলাকায় এংলো-সাক্সন জাহাজে আবিষ্কৃত কবরটি কার তা নিরুপণে সে কবরে প্রাপ্ত মুদ্রা ব্যবহার করা হয়েছিল। শুধুমাত্র বাইজাইনটাইন সম্রাটের মোহরাংকিত একটি রূপার তৈরি পাত্র এবং সাইল ও পল নামাংকিত দুটি চামচ ছাড়া সময় বা নাম লেখা কোনো বস্তু এই কবরটিতে পাওয়া যায় নি। কবরে প্রাপ্ত এই জিনিসগুলি থেকে অনুমান করা হয় যে, ঐ রাজা এই এলাকায় খৃস্টধর্মের প্রসারের সময় রাজত্ব করেছেন। তবে সে সময়কারের বেশ কয়েকজন সম্রাটের মধ্যে ঐ কবরে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে ফ্রান্সে তৈরি ৩৭টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। এসব মুদ্রার রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এগুলিতে খাঁদের পরিমাণ বিভিন্ন রকম। সময়ের সাথে স্বর্ণমুদ্রায় খাঁদের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এই তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগণ একমত হন যে, কবরে প্রাপ্ত সবচাইতে বেশি খাঁদ মিশ্রিত মুদ্রাটি যখন তৈরি হয় তার অব্যবহিত পরেই এ কবরটি দেয়া হয়। এ থেকে কবরটি ঠিক কোন সম্রাটের তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

একইভাবে প্রাচীন ইথিওপীয় সম্রাটের শাসনামলে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার কাজেও প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করা হয়। ইথিওপিয়ার প্রাচীন সম্রাটদের শাসনামলে স্থাপত্য কীর্তির যে সামান্য ধ্বংসাবশেষ আজো বিরাজমান তা থেকে জানা যায় যে, হাতির দাঁত এবং দাসব্যবসার মাধ্যমে সে আমলে ইথিওপিয়ায় প্রভূত আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। এ-সময়কালে প্রচলিত মুদ্রা থেকে আরো জানা যায় যে, সে-সময় আরো বিশজন সম্রাট রাজত্ব করেছেন। তবে রোমান ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সাথে তাঁদের ব্যবসার সূত্রধরে এদের মধ্যে মাত্র ২/৩ জনের শাসনামল সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হলেও অবশিষ্টদের শাসনামলের ক্রম সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ একমত হতে পারেন নি। অতিসম্প্রতি বিভিন্ন সম্রাটের শাসন আমলে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার বিশুদ্ধতা

পরীক্ষা এবং স্বর্ণমুদ্রায় ক্রমাগতভাবে অধিকতর পরিমাণ খাদ মিশানো হয়েছে— এই অনুমানের ভিত্তিতে ইথিওপীয় সম্রাটদের শাসনামলের ক্রম সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে : বিরাজমান ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ এ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আধুনিককালের ইতিহাসবিদগণ এ বিন্যাসের সাথে একমত পোষণ করেন।

উপসংহার

১৯৭০এর দশকের শুরুতেও সোনা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য অপ্রতুল এবং ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। বিগত ২/৩ দশকে সোনা ব্যবহারের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ায় এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। একইসাথে সোনা সংক্রান্ত সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং স্বর্ণ-ইনস্টিটিউট, বিশ্বস্বর্ণ-কাউন্সিল প্রভৃতি গবেষণা সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সোনার সনাতন ব্যবহার আরো সুষ্ঠু ও ব্যাপক করার পাশাপাশি এর নতুন নতুন ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণার কাজ চলছে, নিয়মিতভাবে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এসব গবেষণার ফল আলোচিত হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রয়াসের ফলে আমরা আজ এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয়েছি যখন নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, শুধুমাত্র অলংকার আর মুদ্রা তৈরিতে স্বর্ণ ব্যবহারের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রে সোনার ব্যাপক ব্যবহার এখন শুধুমাত্র সময়ের প্রশ্ন।

[*প্রফেসর, ধাতবকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।*]



সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ুব

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

১

'ভাষা শেখার তিন পর্ব এবং প্রসঙ্গত' শীর্ষক প্রবন্ধে আবু সয়ীদ বলেছিলেন, নিজের সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমার বলা শেষ হয়ে গেলেও শেষ হয় না আধুনিক কবিতা বিষয়ে'। এই স্থানে একটু সংযোজন প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আইয়ুব যা বলেছেন, তাতে শেষ কথা বলে কিছু ছিল না। তাঁর প্রতিটি মন্তব্য আমাদের জন্য একটি দরোজা খুলে দেয়, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভুবনের একটির পর একটি দিগন্ত উন্মোচিত করে। রবীন্দ্র বিষয়ে তাঁর বলা শেষ হয়ে যায় নি, এমন অনেক কথা আছে যা নতুন করে শুরু হয় শেষ থেকে; মহৎ সমালোচনার এ মাপকাঠি আপনা থেকে নির্ণীত হয় তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনায়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং জরুরি হয়ে রইবেন যতদিন রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং আধুনিক কবিতা বিষয়ে আমাদের উৎসাহ জাগ্রত থাকবে। এ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের এ-দুই মহত্তম সম্পদ যে আমাদের অর্জনের ভাণ্ডারে জমা থাকবে চিরকাল, এমন আশাবাদ সহজে আসে শতাব্দী শেষের মানুষের; আইয়ুবকে ঐ- মানুষ মিলিয়ে পড়বে রবীন্দ্রনাথের এবং আধুনিক কবিতার সঙ্গে। তিনি অনন্ত পাঠযোগ্য তাঁর প্রচণ্ড মেধা প্রজ্ঞার উপস্থিতি সত্ত্বেও, হয়তো সে কারণেই; তাঁর অনুকরণীয় ভাষা এবং শৈলী দূরত্ব রচনা করে না, বরং পাঠককে অনুপ্রাণিত করে সপ্রাণ অংশগ্রহণে। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর অবদান বিষয়ে যে-কোনো চিন্তাভাবনায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ত্রিবিধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জাগে। আমরা দেখি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখালেখি এক ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরে আমাদের কাছে, যিনি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় 'কবি অচির মুহূর্তের প্রত্যুষেও অবিস্মৃত স্বপ্নের, জন্মান্তরের স্মৃতির', কিন্তু ততটা দূরের নন যতটা আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেই, ততটা দুর্নিরীক্ষ্য নন যতটা প্রথাগত সমালোচনা তাঁকে প্রতীয়মান করে।

রবীন্দ্র-সমালোচনায় আইয়ুবের আগে যে ধারাটি প্রধান ছিল, যা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনায় গুরুত্ব পায়, তাতে রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্বাপর আলোচনা হয়েছে তাঁর দর্শন, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের আলোকে, সেখানে ইতিহাস বজায় রেখেছে তার আনুপাতিকতা,

চতুর্থ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯১

গ্যাট-ডাঙ্কেল চুক্তি ও বাংলাদেশ

গোলাম মহিউদ্দিন

ভূমিকা

নবরূপে গ্যাট সারাবিশ্বময় আলোচিত হচ্ছে। অনেক দেশ এর উষালগ্নেই শঙ্কিত, অনেকেই আনন্দিত। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩ জেনেভায় যখন এই গ্যাট-ডাঙ্কেল চুক্তি সই হচ্ছিল তখন বিশ্ববাণিজ্যের অন্যতম পুরোধা দেশ জাপানের এক কৃষক হলের বাইরে এর প্রতিবাদে নিজের শরীরে নিজেই ছুরিকাঘাত করে আত্মহত্যার প্রয়াস চালিয়েছিল। পরবর্তীকালে মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। একই রকম ঘটনা ঘটেছে ভারতে, সেখানে একজন বামপন্থী নেতা ভারতের এই চুক্তি সইয়ের প্রতিবাদে আত্মহত্যা করেছে। এই চুক্তি সইয়ের প্রতিবাদে ভারতে গত তিনমাসে বিশাল বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। ই.ই.সি কমিউনিটি ও ফ্রান্সের কৃষকরা তার প্রতিবাদ করেছে। ফ্রান্সের মত একটি উন্নত সভ্যদেশে রাস্তা অবরোধ করেছে, গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে যা ঐরকম সভ্যদেশে অকল্পনীয়। জাপান ও কোরিয়ার কৃষকরাও প্রতিবাদ করেছে। এই বিষয়টি নিয়ে প্রায় প্রতিটি দেশের সংসদেও তুমুল বাক বিতণ্ডা ও ওয়াকআউট হয়েছে। আর আমাদের দেশে এই ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের আন্দোলন, প্রতিবাদ (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কাস পার্টি ও আট বামদল ব্যতীত) নজরে আসে নি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে আমাদের দেশে কি তার কোন প্রভাব পড়বে না? কেনই বা আমাদের সরকার এই বিষয়টি সংসদে আলোচনায় না এনে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তার অনুমোদন দিয়ে দিলেন। জনতাকে এর সুফল-কুফল সম্বন্ধে কোন কিছু অবহিত করার প্রয়োজনটুকু অনুভব করলেন না। এই কি গণতান্ত্রিক রীতি। পত্রিকার খবর অনুযায়ী মন্ত্রীসভায় চুক্তিটি অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এটাও বলেছিলেন, "দাতাদেশ সাহায্য সংস্থার নিকট আমরা নির্ভরশীল, কাজেই চুক্তি সই ব্যতীত আর কোন উপায় আছে কি" আমাদের দেশের আমলা-মন্ত্রীদের মূল্যায়ন হলো বাজার অর্থনীতির যুগে এই চুক্তি সইয়ের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ ও স্বল্পউন্নত (Least developed) দেশ হিসেবে আমাদের অনেক কিছু Preferential treatment পাওয়া

৭ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৯৪

যাবে। দেশে অর্থনীতির কর্মকাণ্ডে জোয়ার আসবে, বিদেশী উদ্যোক্তা পাওয়া যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫ এপ্রিল মরোক্কোর রাজধানী ম্যারাকাশে আমাদের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের হয়ে চুক্তিটিতে মন্ত্রিপর্যায় সই করেছেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এবার একটু অতীতের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি যেমন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nation) গড়ে তুলেছিল, প্রায় ঠিক একই সময় ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে ব্রেটন উডস কনফারেন্সে তিনটি আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা স্থাপন করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। যেগুলি ছিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আই.এম.এফ. বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এবং আই.টি.ও. বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা। কিন্তু প্রথম দুটি প্রতিষ্ঠিত হলেও তৃতীয়টিতে মার্কিন পণ্যের প্রভাব যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপ রোধ করতে পারবে না বলে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলি ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। পরিণতিতে ঐ সংস্থার পরিবর্তে ১৯৪৭ সালে গড়ে তোলা হয় শুল্ক ও বাণিজ্যসংক্রান্ত সাধারণ চুক্তি নামক এক মঞ্চ, ইংরেজিতে এই সংস্থার নাম General Agreement on Trade and Tariff বা সংক্ষেপে GATT মাত্র ২৩টি দেশ তাতে স্বাক্ষর করেছিল। ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে গ্যাটের ৮ম সম্মেলনে ১১৪টি দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিল। আমেরিকা প্রথম থেকেই গ্যাট চালু রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। এই গ্যাটের সীমিত উদ্দেশ্য ছিল বহু পাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের আমদানি শুল্কের বৈষম্য দূর করে সমতা নিয়ে আসা।

গ্যাট এর চলতি পর্যায়ের ৮ম রাউন্ড আলোচনা উরুগুয়ের পুন্তা দেল এস্ততে ১৯৮৬ সালে শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ বছর আলাপ আলোচনার পর ১৯৯১ সালের ২০ ডিসেম্বরে গ্যাটের তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল ৪৩৬ পাতার একটি প্রস্তাব সদস্য দেশগুলোর নিকট পাঠান। এবং তাতে ১৯৯২ সালের ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে চুক্তি অনুমোদন ও ১৯৯৩ সালের ১৩ জানুয়ারির মধ্যে চুক্তিতে সই দিতে অনুরোধ জানান। গ্যাট চুক্তির শর্তাদির ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের আপত্তি ও ই.ই.সি.'র সাথে আমেরিকার টানা পোড়েন চলছিল বিধায় এই চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৯৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। চুক্তিটিতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় অর্থনৈতিক জোটের মধ্যে একটি রফা হলেও তৃতীয় দুনিয়ার ভাগ্যে তেমন কিছু জোটে নি। তবে এই ক্ষেত্রে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে উন্নয়নশীল দেশ, স্বল্পউন্নত দেশ ইত্যাদি গালভরা শব্দ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল বলে মনে হয় না।

নবরূপে গ্যাট আলোচনা

পূর্ববর্তী রাউন্ডগুলির আলোচনার সাথে বর্তমান আলোচনার গুণগত পার্থক্য রয়েছে। এই উরুগুয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্যাটের পরিধিতে

মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার (Trade related to intellectual Property right TRIPS), বিনিয়োগসংক্রান্ত পদক্ষেপ (Trade related to investment measure or TRIMS) এবং পরিসেবা (General agreement on Trade in service or GATS) এই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানায়। এই সব দাবি তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ আপত্তি প্রকাশ করা সত্ত্বেও ১৯৯১ সালে ডাঙ্কেল যে সাতদফা প্রস্তাব করে তাতে এই তিনটি দাবিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই পর্যায়ের আলোচনায় ভারতের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ উরুগুয়ে আলোচনায় মার্কিন প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, গ্যাটের সমালোচনা কেবল শুল্ক ক্ষেত্রে সীমিত না থেকে এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে যেগুলি এক একটি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির সাথে সম্পৃক্ত। কোন বহুপাক্ষিক (Multilateral) সংস্থা কর্তৃক ঐ সকল ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের অর্থ কার্যত একটি দেশের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা।

গ্যাটের উদ্দেশ্য

চুক্তিসইকারী দেশগুলি আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অভিযান নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রণীত :

A) i) raising standard of living

ii) ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand.

iii) expanding the production and trade in goods and services.

iv) allowing for optimum use of world resources in accordance with the objectives of sustainable development.

v) seeking both to protect and preserve the environment

B) there is need for positive efforts designed to ensure that developing countries and specially the least developed among them. secure a share in growth in international trade commensurate with the needs of the economic development. ইত্যাদি।

এই ক্ষেত্রে একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই চুক্তি সই করা হবে এবং The multilateral trade organigation (MTO) প্রতিষ্ঠা করা হবে। পরবর্তী এম.টি.ও নাম বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা WTO-তে পরিবর্তন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সদস্য দেশগুলি বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ, আলাপ- আলোচনাসহ সকল বিষয় পরিচালিত হবে। এম.টি.ও. প্রতি দুই বছরে মন্ত্রী পর্যায়ে একবার বৈঠকে বসবে এই MTO সচিবালয় পরিচালনা করবেন একজন মহাপরিচালক, যিনি মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি সদস্য দেশ MTO চালানোর জন্য চাঁদা পরিশোধ করবেন।

চুক্তির উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু বললেই মনে হবে যে, মাথা পিছু বাৎসরিক ২৫০ ডলার আয়ের দেশ ও ১২০০০ ডলার আয়ের দেশের মধ্যে কিভাবে ক্রয়-ক্ষমতা ও জীবনমান বাড়বে? চাকরিতে নিয়োগ কিভাবে নিশ্চিত হবে?

ডাঙ্কেল চুক্তির মূল বিষয়াবলি

ডাঙ্কেল প্রস্তাবের মূল ৭টি বিষয় হচ্ছে :

১) বাজারে প্রবেশের অধিকার ২) কৃষি ৩) বস্ত্র ৪) মেধা সম্পত্তির অধিকার (TRIPS) ৫) বিনিয়োগ পদক্ষেপ অধিকার (TRIPS) ৬) পরিসেবা (GATS) ৭) প্রতিষ্ঠান

প্রতিটি বিষয়ে চুক্তিতে developed country developing country শিরোনামে বিস্তারিতভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রতিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিভাবে মূল্য নির্ধারিত হবে, বেচাকেনা, গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক খরচ, নীতিনির্ধারণসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে কিভাবে স্বচ্ছতা থাকবে ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে কোন বিষয় ভর্তুকি বলে গণ্য হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ব্যয়-ভর্তুকি বহির্ভূত হবে। পরিবহণ খরচ (আমদানি রপ্তানি ক্ষেত্রে) চুক্তিতে রয়েছে ভর্তুকি সীমানা, শস্য বীমা, আমদানী লাইসেন্স, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি কর্মসূচি, মূল্য নির্ধারণ, আমদানি শুল্কের পরিধি ও শতাংশ, মান নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, ভর্তুকি আওতাভুক্ত ও বহির্ভূত সীমানাসমূহ। এই চুক্তিটি ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল এবং স্বল্পউন্নত দেশ হিসেবে ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে অনেকে মনে করলেও, দেশের বিশেষজ্ঞগন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে মনে করেন। এই ক্ষেত্রে নিম্নে চুক্তির কিছু পক্ষ বিপক্ষের যুক্তি দেওয়া হল।

১. প্রথমে বাজারে প্রবেশের অধিকার মারফত সকল দেশের আমদানি শুল্কের পণ্য অনুযায়ী হার কমিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের ১০০% বা ১২৫% বা ৮০% থেকে ৪০% এ নামিয়ে আনতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে তাতে কোন শুল্ক থাকবেই না। বিদেশী পণ্যের জন্যই একটি নির্দিষ্ট হার পর্যন্ত দেশীয় বাজার উন্মুক্ত করতে হবে। এখানে অবশ্য একথাও বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের মত যে সকল দেশ বাণিজ্য ঘাটতি বা বিদেশী মুদ্রার ঘাটতিতে ভুগছে তাদের ছাড় দেওয়া যেতে পারে। এখানে ছাড়ের প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেখা যায় যে বিদেশী ঋণের সাথে বিদেশী পণ্য আমদানির দায়ও আমাদেরকে বহন করতে হয়।

এখানে শুধু আমাদের দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্য এই ক্ষেত্রে বিদেশী পণ্যের সাথে গুণে, মানে, স্থায়িত্বে ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে কি?

২. কৃষিক্ষেত্রে কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদের ভর্তুকি সর্বাধিক ১০% এর বেশি হবে না। একই সাথে উন্নত দেশগুলিকেও ভর্তুকি কমাতে বাধ্য হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে যাবে তাতে রপ্তানির দেশগুলি কিছুটা লাভবান হলেও কৃষির ভর্তুকি কমানোর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। আমাদের দেশের কৃষকরা যেখানে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না, তারা মধ্য ব্যবসায়ী, আড়তদার মহাজনদের নিকট অনেকটা জিম্মি যেখানে আমাদের দেশে কৃষি ঋণ সময় সময় মওকুফ করতে হয়: সেই ক্ষেত্রে এই ভর্তুকী উঠানো আমাদের কৃষিতে প্রভাব ফেলতে পারে। আমাদের দেশে চিনির উৎপাদন খরচ প্রতি কেজি ২৫-২৬ টাকা, আর পার্শ্ববর্তী দেশে ১২-১৪ টাকা, আমদানিকৃত চিনি C&F দর ১০-১২ টাকায় হলে আমাদের চিনি শিল্পকে জাপানের কৃষির অনুরূপ ভাগ্যবরণ করতে হবে। জাপান সরকার এইক্ষেত্রে কৃষকদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকদেরকে বিকল্প শিল্প উৎপাদন বা শিল্প ব্যবসায় আত্মীকরণ না করা পর্যন্ত তাদের ক্ষতির টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধের ঘোষণা দিয়েছে। আমাদের সরকার কি কৃষি পণ্যের বাজার উন্মুক্ত করার জন্য ডিম, চিনি, মাছ, মাংস, চাল, গম, পেঁয়াজ, ডাল, দুধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন? না কি এগুলো বন্ধ করে দিবেন?

৩. বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশের কাপড়ের অবাধ অনুপ্রবেশ আটকানোর জন্য '৭০ -এর দশকে মালটি ফাইবার এগ্রিমেন্ট এর আওতায় রপ্তানিকারক দেশের জন্য কাপড়ের কোটা বেঁধে দিয়েছিল। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনটি ধাপে এই কাপড় কোটা তুলে দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতায় Back to Back L/C এর মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামাল এর ৭৬% খরচসহ বর্তমানের মোট উৎপাদন ব্যয় ৯৬% মিটিয়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় আমাদের বস্ত্র শিল্প বাজারে মান সম্পন্ন কাপড় রপ্তানী করতে পারবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বস্ত্র আলোচনায় পশমের জন্য কোন বিধি নিষেধ নেই, যেহেতু উন্নত দেশগুলি পশম রপ্তানী করে থাকে।

আমাদের দেশে রফতানীযোগ্য বস্ত্র ক্ষেত্রে মাত্র ২% কাপড়ই হচ্ছে দেশীয় কাঁচা মালের। এই অবস্থায় ৯৮% আমদানীনির্ভর কাঁচামালের উপর নির্ভর করে বিশ্ববাজারে কতটুকু টিকে থাকা যাবে? আমাদের সরকার স্বনির্ভর বস্ত্রখাত গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানেও সিংহভাগ তুলা আমদানির মাধ্যমেই আসবে। বস্ত্রখাতের সরকারি কলগুলি ইতোমধ্যেই বেসরকারি করা হয়েছে। যার অধিকাংশই এখন বন্ধ। নতুন বস্ত্রকলও আসছে। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত কাপড়ের কলগুলি BMRE হলে তাদের বর্তমান উৎপাদিকায় টিকে থাকতে পারবে না। Capital investment এর ক্ষেত্রে এখানে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা ও নীতি নেওয়া প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রযুক্তির। উন্নততর প্রযুক্তিতেই মান সম্পন্ন কমমূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে।

উন্নত বিশ্ব উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার করে প্রতিদিনই তাদের পণ্যের দাম কমিয়ে দিচ্ছে। প্রযুক্তি আহরণ ও আত্মীয়করণের ক্ষেত্রে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। এতে পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে উন্নত দেশগুলি তাদের পণ্যের Technological life cycle শেষ করতে করতেই নতুন প্রযুক্তিতে চলে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমদানি করা প্রযুক্তিকে আত্মীয় করতে করতেই উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের back dated হিসেবে ঘোষণা করতে হয়েছে। বিষয়টি খুব সহজ নয়। এখানে প্রয়োজন inhouse technology গড়ে তোলার জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের। তার জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। মেধাকে এখানে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. মেধাজাত সম্পত্তির অধিকারের (TRIPS) সিদ্ধান্ত সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। এর ফলে আমাদের দেশের পেটেন্ট আইনসহ আন্তর্জাতিক পেটেন্ট আইনের আমূল পরিবর্তন হবে। ১৯৭০ সাল থেকে প্রচলিত এই আইনের আমূল পরিবর্তন হবে। ১৯৭০ সাল থেকে এই আইনে কেবল নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রণালীকে পেটেন্ট দেওয়া হত, গ্যাটের বিধি অনুযায়ী এখন থেকে উৎপাদন প্রণালী ছাড়াও উৎপন্ন দ্রব্যের উপরও পেটেন্ট আইন কায়েম হবে।

ফলটা সহজেই অনুমেয়। উন্নত দেশগুলোর মত আমাদের দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা এতদিন পর্যন্ত উচ্চ ফলনশীল শস্যের গবেষণা করে এসেছেন এবং নতুন নতুন ফসল উদ্ভাবন করেছেন। যদিও উভয়েই একই শস্য আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু যেহেতু উভয়ের গবেষণা প্রণালী ভিন্ন সেজন্য বাংলাদেশের গবেষকগণ তাদের প্রণালীতে দেশীয় পেটেন্ট পেয়েছেন। ওষুধের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ইতঃপূর্বে ওষুধের chemical ফরমুলা অনুযায়ী ওষুধ প্রস্তুত করলে কোন প্রকার রয়েলটি দিতে হত না, তজ্জন্য ইতঃপূর্বে multinational ওষুধ কোম্পানিগুলোকে তাদের আবিষ্কৃত ওষুধ দেশে দেশে প্রস্তুত করে বাজারজাত করে মুনাফা কুড়াতে হত। এখন তার পেটেন্ট রাইট অনুযায়ী সে উৎপাদিত পণ্যের রয়েলটি পেতেই থাকবে। গবেষকদের মতে ২০০০ সাল নাগাদ ওষুধের দাম প্রায় ১০ থেকে ১৫ গুণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যেই আমাদের দেশের multinational ওষুধ কোম্পানিগুলি তাদের দেশীয় পার্টনারদের কাছে তাদের factory বিক্রি করে চলে গেছে। শস্যবীজের দাম ৫-৭% বৃদ্ধি পাবে। নতুন বিধি অনুযায়ী Patent -এর মেয়াদ ৫-৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ২০ বছর করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে কোন পেটেন্ট অধিকারী যদি কোন গবেষকের বিরুদ্ধে পেটেন্ট ভাঙগার অভিযোগ আনে, সেই গবেষককেই প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি আইন ভঙ্গ করেন নি। এটি বাংলাদেশের আইনী তত্ত্বের বিরোধী। এখানে অভিযোগকারীকে অভিযোগ প্রমাণ করতে হয়, অভিযুক্তকে নয়।

উপর্যুক্ত সমালোচনাগুলির জবাবে গ্যাটের বর্তমান মহাপরিচালক পিটার সাদারল্যান্ড খুব দুর্বলভাবে বলেছেন "জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট" গবেষণার ফলের উপর পেটেন্ট অধিকার সেভাবে প্রয়োগ করা হবে না, আর কৃষকরা শস্য "হস্তান্তর" করতে পারবে, বাণিজ্য না করলেই হল। এটা এসেছে এর উত্তরে— যে দেশে কৃষকরা উচ্চফলনশীল শস্যের বীজ গুদামজাত করে পরবর্তী বছর ব্যবহার করেন বা অন্য কৃষকের সাথে বেচাকেনা করেন। নতুন আইন অনুযায়ী রয়েলটি না দিয়ে বেচাকেনা নিষিদ্ধ। হস্তান্তর বাণিজ্য সীমানাটি বা কি, তা অবশ্য GATT ব্যাখ্যা করে নি।

৫. বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থার (TRIMS) মূলকথা হচ্ছে দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার পার্থক্য করা যাবে না। আগামী ৫ বছরে বিদেশী পুঁজি নিয়োগের উপর যাবতীয় বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে। বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বা পুঁজি বিনিয়োগের ফলস্বরূপ যে বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হবে তার উপরে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এইক্ষেত্রে আমরা বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করার জন্য ইতোমধ্যেই অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এইক্ষেত্রে দেশীয় উদ্যোক্তাদের অবস্থা কি হবে তাও ভাবা প্রয়োজন।

৬. পরিসেবা (GATS)

একইভাবে শিল্প ব্যাঙ্ক ও বীমাসহ বিভিন্ন পরিসেবামূলক ক্ষেত্রেও অবাধ বৈদেশিক অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা চুক্তি রয়েছে। নতুন বিধিতে শুধু দক্ষ কর্মীদেরকেই বিদেশে চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে আধাদক্ষের বা অদক্ষদের নয়। আমাদের দেশের হাজার হাজার অদক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিক যেখানে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশে চাকরি করছেন তাদের ভবিষ্যৎ কি? আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাগুলোকে দিয়ে গবেষণা করিয়ে সেই গবেষণাজাত কাজের উপর পেটেন্ট কায়েম করে বেশি দামে তা আমাদের নিকটই বিক্রি করা হবে। তাতে মেধা পাচার বাড়বে।

৭. এম.টি.ও/ডব্লিও.টি.ও.

পরিশেষে প্রতিষ্ঠানগত বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মূলত একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য কর্তৃপক্ষ গঠনের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এক দেশের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের কোন অভিযোগ অন্যদেশের থাকলে তা এই পক্ষের কাছেই দায়ের করা যাবে। এবং তারাই এই বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন। ডাঙ্কেল চুক্তির সমর্থক অনেকেই দাবি করছেন যে এর ফলে বাণিজ্যিক বিরোধের ক্ষেত্রে অতীতে USA যেমন একতরফাভাবে তাদের সুপার ৩০১ বা স্পেশাল ৩০১ ধারাগুলি জারি করে অন্য দেশগুলিকে তালিকাভুক্ত করতো তা বন্ধ হবে। এখন বহুপাক্ষিক কর্তৃপক্ষ সবকিছু বিবেচনা করে দেখবেন, এই যুক্তিটা আদৌ সঠিক নয়। প্রথমত মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক প্রাধান্যের ফলে বহুপাক্ষিক কর্তৃপক্ষতে তার ও তার সমর্থকদেরও প্রাধান্য থাকবে। মাত্র কিছুদিন পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ক্ষেত্রে সুপার ৩০১ স্পেশাল

ধারায় হুমকি দিয়েছিল। কিউবাতে কয়েক দশক ধরে তার বাণিজ্য অবরোধ, তার সদিচ্ছাটা প্রমাণ করে না। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ কিউবাতে পাট রপ্তানী করার 'অপরাধে' এখানে গমের জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল। অতীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা পুলিশি ভূমিকা দুনিয়ার জনগণ সুনজরে দেখিনি। বর্তমানে প্রায় সবদেশেই তার হস্তক্ষেপ চলবে বহুপাক্ষিক জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে। সোভিয়েত পতনের পর জাতিসংঘে তার হস্তক্ষেপ ও মোড়লী লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে অতি জাতিক অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার মার্কিন প্রস্তাবকেই নতুনভাবে সারা পৃথিবী ডাঙ্কেল চুক্তির মাধ্যমে মেনে নিচ্ছে। একথা আমাদের স্মরণ করা উচিত যে বহুপাক্ষিক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতির অর্থ এ নয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার একতরফা আক্রমণের অস্ত্রগুলি ত্যাগ করতে বাধ্য থাকবে।

৮. সংক্ষেপে এইগুলিই হল ডাঙ্কেল প্রস্তাবিত ও বর্তমানে প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত বাণিজ্য বিধিগুলির স্বরূপ। বাংলাদেশ তার বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্তরে দাঁড়িয়ে, তার বর্তমান উৎপাদিকা নিয়ে, তার বর্তমান অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। বরং স্রোত উল্টো দিকেই বইবে, অর্থাৎ বিদেশ থেকে বর্তমান প্রযুক্তিতে উৎপাদিত কমমূল্যের দ্রব্যসামগ্রী আসতেই থাকবে, স্থানীয় বাজার Capture করবে, এবং দেশের শিল্পগুলি রুগ্ণতার দিকে ধাবিত হবে। বাংলাদেশের লাভের মধ্যে শুধুমাত্র নতুন নুতন trading house, indenting house জন্মলাভ করবে, পত্রপত্রিকাগুলি বিদেশী পণ্যের গুণাগুণ সম্পন্ন বিজ্ঞাপনে ভরপুর থাকবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে ভরপুর থাকবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে সরকারের কোন নীতি নির্ধারণী ক্ষমতাই থাকবে না। সংক্ষেপে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বই বিপন্ন হবে।

অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ও শর্তপ্রয়োগে আমাদের নিকট বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই.এম.এফ.-এর তিন দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সার্বভৌমত্ব প্রশ্নে GATT -এর প্রথম ডি.জি. আর্থার ডাঙ্কেল এবং বর্তমান ডি.জি. সাদারল্যান্ড দুজনেই এইক্ষেত্রে একটি যুক্তি খাড়া করেছেন। তাদের মতে যখন দুটো স্বাধীন দেশ ব্যবসা বাণিজ্য বা রাজনৈতিক সমঝোতার কোন একটা ক্ষেত্রে কোন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখনই কি তার সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করে না — কি আশ্চর্য যুক্তি!

৯. গ্যাট আসার পূর্বেও প্রভাবশালী দেশসমূহ অন্য দুর্বল দেশগুলির উপর তাদের পণ্য বাজারজাত করার জন্য জোরজবরদস্তি করার উদাহরণ রয়েছে, ১৮৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে নৌশক্তির ভয় দেখিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ তুলে দিতে বাধ্য করেছিল। তখন জাপান ছিল অনুন্নত কৃষিনির্ভর দেশ। শুধু তাই নয় যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে তাদের আমদানি শুল্কের সীমা শতকরা পাঁচভাগে সীমিত রাখতে বাধ্য করেছিল এবং সেই সময়

যুক্তরাষ্ট্রে নিজস্ব আমদানি তালিকায় ৫০০% পর্যন্ত আমদানি শুল্কের হার ছিল। এর ফলে জাপানের বাজারে বিদেশী পণ্য এমনভাবে আসে যে, জাপানের নিজস্ব কাপড়, কাগজ ও চিনির মত ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বিনষ্ট হয়। জাপানের ঐ উন্মুক্তদার অবাধ বাণিজ্যের ফল ভাল হয় নি। তার মুদ্রাব্যবস্থা বিনষ্ট হয়েছিল। তার কৃষি ব্যবস্থাতেও এসবের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। সেকারণে পরবর্তী জাপান তার নিজস্ব শিল্প বিকাশের জন্য জাতীয়তাবাদী ধারায় উচ্চ শুল্কহার আরোপ করে, জাপান আজও আমদানি ক্ষেত্রে তার উচ্চ শুল্কহার বজায় রেখেছে। বিদেশী পণ্যের তার বাজারে প্রবেশের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের বিকাশের মাধ্যমেই তার বর্তমানের বেসরকারি শিল্পখাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ক্ষুদ্রদেশ। তাদের উন্নয়ন দিয়ে তারা আজ এশিয়ার ব্যাঘ্র নামে পরিচিত। তারা বিশ্বকে মাত্র কয়েক দশকে হতবাক করে দিয়েছে। জাপানের মত তাদের কোন নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। তারা জাপানের মত মার্কেনটাইল অর্থনীতি অনুসরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের নীতি যত পার শিল্পায়িত দ্রব্য রপ্তানী কর, আর আমদানিকে তেমনিভাবে সীমিত কর

তাইওয়ান ১৯৪৯ সালে গ্যাট থেকে সরে আসে এবং এদিকে সে স্পষ্টভাবে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে সে তার দেশীয় অর্থনীতিকে উন্মুক্ত রাখছে না, এবং সে জন্য সে তার শিল্পায়নের উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে বিধিনিষেধ অতীব প্রয়োজনীয়। আজও তাইওয়ানের সরকার সরাসরি একচেটিয়াভাবে ব্যাঙ্ক, জাহাজ নির্মাণ, ইস্পাত, সার ইত্যাদি উৎপাদনে সম্পৃক্ত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সাথে মূল্য নির্ধারণী কার্টেল হিসেবে যুক্ত। বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত, আমদানি শুল্কও গড়ে প্রায় ৬০% যা থেকে সরকারি আয়ের এক-পঞ্চমাংশ আসে। আজও তাইওয়ানের সরকারি আয়ের ৭৯% আসে সরকারি শিল্পকর্পোরেশন থেকে।

দক্ষিণ কোরিয়া মাত্র ৬০-এর দশক থেকে তাদের শিল্পায়ন শুরু করে। কোরীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিচার করতে গিয়ে দেখা গেছে, কোরিয়ার উন্নয়ন মুক্ত বাজার অর্থনীতিও ধনতন্ত্রের সাফল্য নয়। সেখানে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিচালনা, সরকারি নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারি মালিকানাধীন প্রধান প্রধান শিল্পগুলো, সরকার নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি খাতের জন্য ঋণ ও উৎসাহ ব্যাঞ্জক ব্যবস্থাই এসবের সাফল্যের কারণ। ১৯৬৮ সালে যখন কোরিয়া একটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা স্থাপন করতে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তখন বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সমস্ত সহযোগী সংস্থা তার বিরোধিতা করেছিল। এটাকে তারা অপ্রয়োজনীয়, ঝুঁকিপূর্ণ ও বাহুল্য ব্যয় বলে বিবেচিত করেছিল। কিন্তু কোরিয়ার সরকার সরকারি খাতে পোহাং স্টীল মিল স্থাপন করে, যা আজ পৃথিবীর পঞ্চম বৃহৎ এবং তা জাপান ও আমেরিকার ইস্পাত শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাচ্ছে। কোরিয়াতে মূল মেশিনারী শিল্পগুলো সরকারি বা বেসরকারি যৌথ

উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এই মৌলভিত সৃষ্টিকারী উদ্যোগই দক্ষিণ কোরিয়ার সফল শিল্প বিপ্লব সম্ভবপর করে তুলেছে। এরকম অনেক দেশের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আজ আমরা বিদেশী পুঁজির আশায় আমাদের নাজুক অর্থ, অর্থসংস্থা, শিল্প, বাণিজ্য সবই বিদেশের কাছে উন্মুক্ত করেছি নিঃশর্তভাবে। আমাদের অর্থদানকারী সাহায্য সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক ও তার সহযোগীরা আমাদের সকল ব্যাঙ্ক, শিল্প কারখানা বেসরকারিকরণ, সোনালি করমর্দন, কাঠামোগত সংস্কার ইত্যাদি দাওয়াই দিয়ে আমাদেরকে গ্যাটের প্রাথমিক শর্ত মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ধাবিত করছেন বেসরকারি খাতে ব্যাংকের সর্বশেষ অর্থকেলেঙ্কারী শিল্প স্থাপনের জন্য ঋণ নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে কাগজে শিল্প স্থাপন, চর্তুদিকে শুধু রুগ্ণ শিল্প, শিল্প উৎপাদন বন্ধ, শিল্প বন্ধ ইত্যাদির অশনী-সংকেত শোনা যাচ্ছে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন — যে-শিল্প যেই উদ্দেশ্যে যে-ক্ষমতা (Capacity) নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সে-শিল্প ঐ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন না করে, তার capacity utilization নিশ্চিত না করলে তার উৎপাদন বাড়াতে না পারলে, বন্ধ করে দিয়ে বা পানির দরে বিরাষ্ট্রীয়করণ করলে কোন ফল পাওয়া যাবে না, তাতে রুগ্ন শিল্পের liability বাড়তেই থাকবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের জাতীয় মেধাই আমাদের উচ্চফলনশীল কৃষি পণ্য উপহার দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের মেধাকে একত্র করে আমাদের গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে কঠোর পরিশ্রমে ব্রতী হয়ে আমাদের কলকারখানা লাভজনকভাবে চালানোর পথ ও পদ্ধতি বের করতে হবে। বন্ধ করে বা বিক্রি করে কোন সমাধান আসবে না তাই তাতে অর্থনীতির নিয়ম শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমলানির্ভর রাষ্ট্রীয় নীতিতে মেধাকে সম্পৃক্ত করে এগুতে হবে গ্যাট বা মুক্তবাজার অর্থনীতিতে তা প্রাথমিকভাবে সম্ভবপর হবে না।

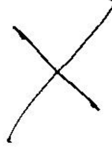
উপসংহার

খোদ আমেরিকার ভোক্তাগণ GATT অন্তর্ভুক্তিতে বছরে ৩০ বিলিয়ন ডলার save করতে পারবে বলে American Research group এর গবেষণায় দেখা গেছে. তাদের মতে The Amercian Consumer will feel biggest impact in the clothing area will drop by $ 15 billion annually; and the textile process will decline by $2 billion annually with the elimination of quotas and reduction of tariffs তাহলে প্রশ্ন সেখানে ভোক্তাগণ বছরে ৩০ বিলিয়ন ডলার সঞ্চয় করলে রপ্তানিকারক দেশগুলোতে ৩০ বিলিয়ন ডলার পূর্বের থেকে হারাতে হবে। এক্ষেত্রে কে লাভবান তা চিন্তা করা প্রয়োজন। একই গবেষণায় আরও দেখা গেছে খোদ আমেরিকার ২১টি Protected industry-এর ১,৯০,০০০ blue collar job সঙ্কুচিত হবে, তার মধ্যে ৯০% হচ্ছে টেক্সটাইল শিল্প। অর্থাৎ যে ডাঙ্কেল চুক্তি standard of living বাড়াতে নিশ্চিত করতেও চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ করা হচ্ছে তার ফলে আমেরিকায়ই

১,৯০,০০০ শ্রমিক বেকার হবে। তাহলে তৃতীয় দুনিয়ার আমাদের অবস্থা কি হবে? আমাদের impact বের করার জন্য একটি গবেষণা প্রকল্প কি সরকার হাতে নিয়েছেন? না কি কোন study ছাড়াই অনুমোদন দিয়েছেন।

সমাজতান্ত্রিক চীন গ্যাটকে জানিয়ে দিয়েছে যে পারস্পরিকতায় তারা যতটা ছাড়বে চীনও ততটা ছাড়বে নীতির ভিত্তিতে গ্যাটে অন্তর্ভুক্ত হতে সে রাজী আছে। ১৯৯৫ সালের মধ্যে এ বিষয়ে সে একমত না হলে চীন গ্যাটে ঢুকবে না বলেও ঘোষণা দিয়েছে। এই গ্যাট চুক্তি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে চুক্তি। আমাদের সবকিছু চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পথ ও পদ্ধতি বের করতে হবে এবং দেশ ও জাতির স্বার্থে এগুতে হবে। প্রয়োজনে আমাদের বিকল্প পথ নিতে হবে। আমাদের প্রয়োজন স্বনির্ভর অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়া। সরকারি অর্থের অপচয়, অপব্যবহার ও দুর্নীতি রোধের প্রয়োজন কঠোর পরিশ্রমের।

সহযোগী অধ্যাপক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।



বিদ্বজ্জনের দৃষ্টিতে শিক্ষক আন্দোলন

কাজী তামান্না

কে বলে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। অন্যদেশে হতে পারে। কিন্তু গত পয়লা মে-র দৈনিক খবরের কাগজ পড়ে এবং দেখে আমার মনে হয়েছে এই সোনার বাংলায় জাতির মেরুদণ্ড হল পুলিশ বাহিনীর লাঠি। এই লাঠি শিক্ষার আলোবহনকারী শিক্ষকদের প্রহার করে দেশের এবং জাতির মেরুদণ্ড সোজা রাখার মহান দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবে ও যত্নের সাথে পালন করেছে। গত ৩০শে এপ্রিল ধর্মঘটী বেসরকারি কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ঢাকার ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে বাহদুর শাহ পার্কে সমবেত হন। সেখান থেকে তারা ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ কোনো রকম সতর্কবাণী উচ্চারণ না করে সমবেত শিক্ষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ, বুটের আঘাত ও মারপিট শুরু করে দেয়। তাতে শিক্ষক শিক্ষিকাসহ লিয়াজোঁ কমিটির বাইশ জন নেতা আহত হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠন এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক সমিতি খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়েও নিন্দা জ্ঞাপন করে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করেছে। কিন্তু ব্যাপক শিক্ষিতসমাজ ও সমাজসচেতন বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়ে তাঁদের কিছু করণীয় আছে বলে মনে করেননি। হয়তো তাদের মনের ভাব এটা নিছকই বেসরকারি শিক্ষকদের ব্যাপার। সুতরাং, এ বিষয়ে নাক না গলানোই সমীচীন। কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজ কি বিস্মৃত হয়েছেন? বর্তমানে তাদের অবস্থান যেখানেই থাকুক না কেনো, তারা কোনো এক সময় তো শিক্ষালয়ে শিক্ষকদেরই শিক্ষার্থী ছিলেন। শিক্ষক হলেন গুরু। একমাত্র শিক্ষকই পিতামাতার স্থান নিতে পারেন। অথচ তাহাতে অপমানে আমরা যদি অপমানিত না হই এবং তার প্রতিবাদ না করি, তবে জাতির মেরুদণ্ড সোজা রাখা যে কোনোভাবেই সম্ভব নয় সেটা কি আমরা ভুলতে বসেছি? ভয় হয় জাতির মেরুদণ্ড যেভাবে কাত হয়ে পড়েছে, কোনোদিন না হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। আমাদের দেশে যে কোন পেশাজীবী দাবিদাওয়া পেশ করলে সরকার কখনোই তাদের ডেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে তা

৭ম বর্ষ : ৬ষ্ট সংখ্যা, জুন ১৯৯৪

সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব : আধুনিক মতবাদ

শিশির কুমার ভট্টাচার্য

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে গ্রহের সৃষ্টি কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নক্ষত্রের জন্মের সঙ্গেই গ্রহের জন্ম সম্পর্কিত। বস্তুত, সূর্যের অনুরূপ ভরবিশিষ্ট যেকোনো নক্ষত্রের জন্মের অনিবার্য ফল গ্রহের জন্ম। অবশ্য মহাকাশে সূর্য ছাড়া অন্য কোনো নক্ষত্রের গ্রহ আছে কিনা তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। কেন না গ্রহের নিজস্ব আলো না থাকায় সহজে টেলিস্কোপে তা ধরা পড়ে না। তবে গ্রহের মহাকর্ষ প্রভাবে মূল নক্ষত্রের স্বাভাবিক গতিপথে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্র বার্নার্ডের গতিবিধি কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। তাই অনেকে মনে করেন, বার্নার্ডের হয়তো গ্রহসঙ্গী রয়েছে। তবে তা এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নি। যদি অন্য কোনো গ্রহ জগতের সন্ধান মিলত তাহলে আমাদের সৌরজগতের সঙ্গে ঐ গ্রহজগতের তুলনা করে গ্রহের সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন সহজসাধ্য হত। কিন্তু তা যখন নেই তখন আমাদের এই সৌরজগতের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করেই গ্রহ সৃষ্টির মূলসূত্র খুঁজে পেতে হবে।

আধুনিক গ্রহবিজ্ঞানীদের পথপ্রদর্শক ছিলেন ইমান্যুয়েল কান্ট। কান্ট (১৭৫৫) মনে করতেন যে, মহাবিশ্ব প্রথমে গ্যাসে ভরপুর ছিল। এই গ্যাসের ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়, কোথাও বিশি কোথাও কম। বেশি ঘনত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ ঘনীভবনের ফলে এক একটি মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের সৃষ্টি করে এবং আরো বস্তু আহরণ করে সংকুচিত ও উত্তপ্ত হয়ে এক একটি নক্ষত্রে পরিণত হয়। তবে ঘূর্ণনের ফলে ঘনীভূত বস্তু চ্যাপ্টা আকৃতি ধারণ করে। কান্ট বলেন, এই চাকতির কেন্দ্রে সূর্য এবং বহিরাবরণে দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘনীভবনের ফলে গ্রহের সৃষ্টি হয়। কান্ট তাঁর মতবাদের কোনো সংখ্যাবাচক বিশ্লেষণ না করলেও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অনেক। আধুনিক কালের অনেক বিজ্ঞানীই কান্টীয় মতবাদকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে গ্রহের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কান্টীয় অনুসারীদের অবশ্য প্রধানত দুটি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়: (১) সৌরকেন্দ্রিক সৌর-নীহারিকার সৃষ্টি এবং (২) সৌর-নীহারিকা থেকে গ্রহের সৃষ্টি।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, আন্তঃনাক্ষত্রিক জগৎ ফাঁকা বা শূন্য নয় বরং এক প্রকার হালকা গ্যাসে ভরপুর। এই গ্যাসের প্রধান উপাদান

৭ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

হাইড্রোজেন। এছাড়া কিছু হিলিয়াম এবং সামান্য জটিল ভারী অনুকণাও রয়েছে। গ্যাসের গড় ঘনত্ব প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে একটি হাইড্রোজেন অণু। তবে কোথাও কোথাও এই গ্যাস অপেক্ষাকৃত ঘন হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এই গ্যাসমেঘ সাধারণত দু-প্রকার। আণবিক হাইড্রোজেন গ্যাসমেঘ এবং পারমাণবিক হাইড্রোজেন গ্যাসমেঘ। বিজ্ঞানীরা আজ সকলেই একমত যে, এই আণবিক হাইড্রোজেন গ্যাসমেঘ থেকেই নক্ষত্রের সৃষ্টি। মহাকাশে বিজ্ঞানীরা বহু অতিকায় আধুনিক গ্যাসমেঘের সন্ধান পেয়েছেন। এক একটি গ্যাসমেঘের ভর সাধারণত কয়েকশ থেকে কয়েক লক্ষ সৌর ভরে সমান। মাধ্যাকর্ষণজনিত অস্থিতিশীলতার কারণে এক-একখানি গ্যাসমেঘ পর্যায়ক্রমে সংকোচন ও বিভাজন প্রক্রিয়ায় কতগুলি স্থিতিশীল গ্যাসগোলকের সৃষ্টি করে। কেননা সংকোচনের ফলে ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকলে একটা পর্যায় আসে যখন আর বিভাজন সম্ভব হয় না। তখন প্রতিটি গ্যাসগোলক আপন ভর অক্ষুণ্ন রেখে সরাসরি সংকোচনের মাধ্যমে উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্য এভাবেই একটি নক্ষত্র হিসেবে জন্মলাভ করেছে। তবে সংকোচনশীল গ্যাসগোলকের বিবর্তন পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, গোলকের কেন্দ্রভাগ বেশি ঘনত্বের কারণে যত দ্রুত সংকুচিত হয় তার চেয়ে অনেক ধীর গতিতে সংকুচিত হতে থাকে বহির্ভাগ। ফলে কেন্দ্রভাগ যতক্ষণে সংকুচিত হয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয় বহির্ভাগ তখনো সংকোচনশীল অবস্থায় থেকে কেন্দ্রের চারপাশে একটি পাতলা গ্যাসীয় আবরণের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণনের ফলে এই পাতলা গ্যাসীয় আবরণের উপর তিন প্রকার বল কাজ করে: অপকেন্দ্র বল, মাধ্যাকর্ষণ বল এবং গ্যাসের চাপশক্তিজনিত বল। এই তিনের যৌথ প্রভাবে গ্যাসীয় আবরণটির দুইপাশ চাপা হয়ে একটি চাকতির আকার ধারণ করে। বিজ্ঞানীরা বলেন, এভাবেই একখানি গ্যাসখণ্ডের কেন্দ্রে সূর্য এবং বহির্ভাগ চ্যাপ্টা আকৃতির সৌর-নীহারিকা বা সোলার নেবুলার জন্ম হয়। তবে সৌর-নীহারিকা থেকে গ্রহের জন্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুটি ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। গ্রহাণুমতবাদ এবং প্রোটোগ্রহমতবাদ।

গ্রহাণুমতবাদের প্রবক্তারা বলেন যে, সৌর-নীহারিকার ভারী বস্তুকণাসমূহের উপর গ্যাসের শক্তিজনিত বল ততটা ক্রিয়াশীল নয়; ফলে ভারী কণাসমূহের গতিপথ নির্ধারিত হয়ে থাকে মাধ্যাকর্ষণ বল এবং ঘূর্ণনজনিত অপকেন্দ্র বল দ্বারা। শাজম্যান (১৯৭১) সৌর-নীহারিকার মাধ্যাকর্ষণ বিভব (প্রকৃত পক্ষে গ্যাসীয় চাকতির মাধ্যাকর্ষণ বিভব) বিবেচনা করে ভারী কণাসমূহের গতির গাণিতিক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, কণাসমূহ সূর্যের উপরে না পড়ে বরং নীহারিকার ঘূর্ণন বলে জমা হয়ে একটি ধুলির আস্তরণ সৃষ্টি করে। এই কণাসমূহ ঘূর্ণন তলে জমা হওয়ার সময় পরস্পর সংঘর্ষের ফলে কোল্ড ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ায় জোড়া লেগে লেগে ক্রমে বৃহদাকার গ্রহাণুতে পরিণত হয়। মাধ্যাকর্ষণজনিত অস্থিতিশীলতার কারণে ধুলির আস্তরণে ভাঙন ধরলে এই সব গ্রহাণু সম্মিলিত হয়ে গ্রহের সৃষ্টি করে। সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে অত্যধিক তাপের

কারণে গ্যাস এবং অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থ উবে গিয়ে শুধু গ্রহাণু সমন্বয়ে কঠিন পদার্থের গ্রহের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে দূরবর্তী অঞ্চলে গ্রহাণু এবং গ্যাসের সমন্বয়ে গ্যাসীয় গ্রহের জন্ম হয়। এভাবেই গ্রহাণুমতবাদ সৌর-গ্রহের রাসায়নিক ভিন্নতার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দানে সক্ষম। সৌর-জগতের উল্কাপিণ্ড, গ্রহাণুপুঞ্জ ইত্যাদির উপস্থিতি গ্রহাণুমতবাদের পক্ষে জোরালো যুক্তি। গ্রহ ও উল্কাপিণ্ডের রাসায়নিক গঠনও গ্রহাণু মতবাদে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে গ্রহের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন গ্রহের ভর, সংখ্যা, কৌণিক ও কাক্ষিক ভরবেগ, কক্ষতলের ভিন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই মতবাদে মেলে নি গ্রহাণুর গতিবিধি ও গ্রহাণু সমন্বয়ে গ্রহের সৃষ্টি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হ্যারিস(১৯৭৮) ও গ্রিনবার্গ(১৯৭৮)। আলোচনার তাত্ত্বিক ফল মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও বাস্তবের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই আলোচনা গ্রহ সম্পর্কিত হলেও একে গ্রহবিজ্ঞান না বলে বরং গ্রহাণুবিজ্ঞান বলাই অধিকতর শ্রেয়। প্রোটোগ্রহ মতবাদের প্রবক্তারা বলেন যে, ভারী কণাসমূহের তলানি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই সৌর-নীহারিকা তার স্থিতিশীলতা হারিয়ে ফেলে সমান ভর বিশিষ্ট কণাগুলি অতিকায় গ্যাসগোলকে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই গ্যাস গোলকসমূহের সংকোচন এবং বিবর্তনের ফলেই বর্তমান গ্রহজগতের সৃষ্টি। সমান ভরের অনরূপ এই অতিকায় গ্যাসসমূহকে বলা হয় প্রোটোগ্রহ। এখানে প্রশ্ন হল, সমান ভরবিশিষ্ট এক গুচ্ছ অভিন্ন প্রোটোগ্রহ থেকে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্নধর্মী বাস্তব সৌর-জন্মলাভ সম্ভব কিনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়ম ও তাঁর সহযোগী গবেষকগণ। অবশ্য প্রোটোগ্রহের জন্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সকলে একমত নন। উলফসন (১৯৬০), ম্যাকরে (১৯৬০), ক্যামেরন (১৯৭৮) প্রত্যেকে নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রোটোগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। তবে আধুনিক 'ধারণায় সৌর-নীহারিকাই প্রোটোগ্রহের জন্মক্ষেত্র। প্রোটোগ্রহ এবং প্রোটোসূর্য একই আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু থেকে জাত। এদের উপাদানও মূলত একই। অর্থাৎ, প্রোটোগ্রহের ভরের তিয়াত্তর শতাংশ হাইড্রোজেন (H), পঁচিশ শতাংশ (He) এবং দুই শতাংশ বিভিন্ন ভারী বস্তুকণা। সুতরাং, প্রোটোগ্রহের ভর বৃহস্পতির ভরের সমান হলে তাতে ভারী বস্তুকণার পরিমাণ হতে হবে পৃথিবীর ভরের অনুরূপ বা কিছু বেশি। তাই গ্যাসীয় প্রোটোগ্রহ থেকে পৃথিবীর সদৃশ কঠিন পদার্থের গ্রহ জন্মাতে হলে প্রোটোগ্রহের ভারী কণাসমূহকে অবশ্যই কেন্দ্রে জমায়েত হয়ে কঠিন বস্তুপিণ্ডে পরিণত হবে এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্র বস্তুকে গ্যাসীয় আবরণমুক্ত হতে হবে। ম্যাকরে ও উইলিয়মস দেখিয়েছেন যে ভারী কণাসমূহের সাধারণভাবে তলানি প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রে জমায়েত হতে অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ সময় লাগে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সময় স্কেলেও সব গ্রহণযোগ্য নয়। তার কেন্দ্রমুখী কণাসমূহ যদি পরস্পর সংঘর্ষের ফলে জোড়া লেগে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয় তাহলে মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই তলানি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে কেন্দ্রে একটি কঠিন বস্তুপিণ্ড সৃষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন চলমান কণার পরস্পর জোড়া লাগার এই প্রক্রিয়াকে

কোল্ড-ওয়েল্ডিং বলা হয়। ম্যাকরের এই কোল্ড-ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ার ধারণা ছিল নেহায়েত একটি কল্পনা। কিন্তু পরবর্তীকালে পরীক্ষাগারে ঐ ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রোটোগ্রহের গ্যাসীয় আবরণের স্থিতিশীলতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন উইলিয়মস ও তাঁর সহকর্মীরা (১৯৭১-৮০)। প্রোটোগ্রহের আয়তন ঘনত্ব ইত্যাদি পর্যালোচনা করে তাঁরা বলেন যে, সূর্যের প্রবল আকর্ষণের কারণে সূর্য থেকে ন্যূনতম ৪.৩৫ × ১০[illegible] কি.মি. দূরত্বের মধ্যে কোনো প্রোটোগ্রহের জন্ম সম্ভব নয়। তবে এই দূরত্বের বাইরে সৃষ্ট নিকটতম কোনো কোনো প্রোটোগ্রহ ক্রমাগত মহাকর্ষ টানে সূর্যের কাছাকাছি চলে আসতে পারে। সে অবস্থায় সূর্যের টান, তাপ এবং সৌর বায়ুর (Solar Wind) সম্মিলিত প্রকোপে একটি প্রোটোগ্রহের পক্ষে তার গ্যাসীয় আবরণ ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা গ্যাসকণাসমূহে তখন এতই শক্তির সঞ্চার হয় যে, তারা সহজেই প্রোটোগ্রহের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব প্রোটোগ্রহ এভাবে গ্যাসমুক্ত হয়ে কেন্দ্রে জমায়েত ভারী বস্তুকণার সমন্বয়ে কঠিন পদার্থের গ্রহ সৃষ্টি করে। অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী অঞ্চলে সূর্যের প্রভাব কম। এই অঞ্চলের প্রোটোগ্রহরা তাই সমগ্র ভর অক্ষুণ্ণ রেখে সরাসরি সংকোচনের ফলে গ্যাসীয় গ্রহে পরিণত হয়। যেমন, বৃহস্পতি ও শনি। আরো দূরবর্তী অঞ্চলে অর্থাৎ, সৌরজগতের প্রায় প্রান্তদেশে তাপমাত্রা খুবই কম। এতদঞ্চলের প্রোটোগ্রহের এমোনিয়াম (NH_4) এবং মিথেন (CH_4) জাতীয় CNO যৌগসমূহও জমাট বেঁধে তলানি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। তাতে যে অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় হয় তার দ্বারা H ও He বাষ্পীভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উইলিয়মস বলেন, এই কারণেই বহির্ভাগের গ্রহে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের উপস্থিতি খুব কম। গ্রহাণুপুঞ্জের উৎপত্তি সম্বন্ধে ম্যাকরে বলেন যে, বৃহস্পতি এবং মঙ্গলের মধ্যেও একটি প্রোটোগ্রহ ছিল। কিন্তু তলানি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই প্রোটোগ্রহটি সূর্য ও বৃহস্পতির টানাপোড়েনে ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। এই সব খণ্ডিত অংশ সমবেতভাবে কালক্রমে গ্রহাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। এছাড়া ম্যাকরে প্রোটোগ্রহের বিবর্তন, উপগ্রহের সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। গ্রহের কৌণিক ভরবেগের বিষয়টি প্রবন্ধকার নিজেই পরীক্ষা করে দেখেছেন। প্রোটোগ্রহের ভর ক্ষুণ্ণ হলে তার সঙ্গে কিছুটা কৌণিক ভরবেগও ক্ষুণ্ণ হয়। তাতে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সকল প্রোটোগ্রহের ভরের মতো কৌণিক ভর বেগও যদি সমান হয় তাহলে ভর-ক্ষুণ্ণির তারতম্যের কারণে গ্রহের কৌণিক ভরবেগে যে তারতম্য ঘটবে তা পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। এভাবে দেখা যায় যে, প্রোটোগ্রহ মতবাদ সৌরজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকাংশই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। তবে সৌরজগতের সৃষ্টিরহস্যের সমাধান করতে হলে এখনো অবশ্য অনেক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক সমস্যা এখনো রয়ে গেছে যার সন্তোষজনক কোনো সংখ্যাবাচক সমাধান এখনো মেলেনি। যেমন, সূর্যের ঘূর্ণন-অক্ষ গ্রহদের গড় ঘূর্ণন-অক্ষের সঙ্গে ৭ ডিগ্রি কোণে অবস্থিত। কিন্তু প্রোটোগ্রহের

সঙ্গে ঘূর্ণায়মান সৌর-নীহারিকা থেকেই যদি প্রোটোগ্রহের জন্ম হয় তাহলে সূর্য ও গ্রহের ঘূর্ণন-অক্ষ পরস্পর সমান্তরাল হওয়ারই কথা। একই কারণে গ্রহের কক্ষপথসমূহ সমতলীয় হওয়াও প্রত্যাশিত। অথচ এই সব কক্ষতলগুলির মধ্যে ১ ডিগ্রী থেকে ৭ ডিগ্রী পর্যন্ত কোণিক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া গ্রহদের দূরত্ব সম্পর্কিত টাইশাস বোর্ড সূত্রের কোনো ব্যাখ্যাই কোনো মতবাদে মেলে নি। উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি এবং উল্কাপিণ্ড থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তসমূহ প্রোটোগ্রহ মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে কোনো অগ্রগতিই পরিলক্ষিত হয় নি। উপগ্রহ সৃষ্টির বিষয়টিও সকল মতবাদেই উপেক্ষিত। বিভিন্ন মতবাদের প্রবক্তারা ধরেই নিয়েছেন যে, গ্রহসৃষ্টির প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই উপগ্রহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সর্বোপরি প্রোটোগ্রহের সৃষ্টি। গ্যাস-গতিবিদ্যার সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে যে, সৌর-নীহারিকা অস্থিতিশীলতার কারণে ভেঙে গিয়ে যথার্থই এক প্রস্ত গ্যাসগোলক তথা প্রোটোগ্রহ সৃষ্টি করে। শুধু যুক্তি দিয়ে একথা বললে চলবে না যে প্রোটোগ্রহ সৃষ্টি সৌর-নীহারিকার অস্থিতিশীলতার অবশ্যম্ভাবী ফল। সংখ্যাবাচক বিশ্লেষণে প্রোটোগ্রহের ভর, সংখ্যা ইত্যাদিও যথাযথ নিরূপণ করা প্রয়োজন. যতদিন এই সব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না মিলবে ততদিন নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে প্রোটোগ্রহ মতবাদই সৌরজগৎ সৃষ্টির সঠিক মতবাদ। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৌরজগৎ সৃষ্টির দুটি প্রধান মতবাদ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। উভয় মতবাদের পক্ষেই জোরাল যুক্তি আছে। তবে প্রোটোগ্রহ মতবাদ গ্রহাণু মতবাদ থেকে এক ধাপ এগিয়ে। কেননা প্রোটোগ্রহ মতবাদ গ্রহাণুমতবাদের থেকে সৌরজগতের অধিকতর বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দানে সক্ষম। নভোমণ্ডলের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা বিচার করলেও প্রোটোগ্রহ মতবাদই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কেননা গ্রহ ও নক্ষত্র একই আন্তঃনাক্ষত্রিক উপাদান থেকে তৈরি। প্রোটোনক্ষত্র এবং প্রোটোগ্রহের মৌলিক পার্থক্য তাদের ভরে। প্রোটোনক্ষত্রের ভর অধিক বলে সংকোচনজনিত অত্যধিক চাপে উত্তপ্ত হয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে প্রোটোগ্রহের ভর কম হওয়ায় সংকোচনের ফলে এর অভ্যন্তর ভাগ তত উত্তপ্ত হতে পারে না, ফলে নিষ্প্রভ গ্রহে পরিণত হয়।

[অধ্যাপক, *গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*]

গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : মহৎ মানবিকতার রূপকার

মৃদুলা ভট্টাচার্য

'পথের পাঁচালী'র অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপ্যাধ্যায় আজ থেকে একশ বছর আগে কাঁচড়াপাড়ার সন্নিকটে ঘোষপাড়া-মুরারতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ২৮ ভাদ্র ১৩০১ (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতা করতেন। একজন সংস্কৃত পণ্ডিত হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ৫ ভাইবোনের মধ্যে বিভূতিভূষণ ছিলেন সবার বড়ো। মা মৃণালিনী বড়ো কষ্ট করে স্বামী সন্তানদের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দিতেন। মহানন্দ ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। তিনি কথকতা করতেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, স্ত্রী মৃণালিনী দেবী সংসার তরণীকে একাই টেনে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। 'পথের পাঁচালী'র হরিহর এবং সর্বজয়া চরিত্রে লেখকের মা-বাবার আদল সহজেই চেনা যায়। শৈশব থেকে অভাব অনটন আর দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হলেও বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যকে কখনো অভিসম্পাত করেন নি, বরং একে পরম সম্পদ বলে গণ্য করে বলেছেন : sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না। "Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ।" এছাড়া বিভূতিভূষণ শৈশব থেকেই গ্রামবাংলার সবুজ, শ্যামল প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের অন্যতম উপাদান প্রকৃতি প্রেম। প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর একটা পূর্ণ আর সমগ্র অনুভূতি। ভালোমন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, আলো-অন্ধকার, রমণীয়তা-ভীষণতা সবকিছু নিয়ে আমাদের মহীয়সী পৃথিবী আর ধরিত্রী মাতার কোলে যে গাছপালা, বন-অরণ্য, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র আর বনবাসী মানুষ রয়েছে সে সমস্তের প্রতি তাঁর মনে এক সদাজাগ্রত অনুভূতি আর আনন্দ, এক অপরূপ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া পাঠক অনুভব করে। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও তাঁর ছোটগল্পে রয়েছে অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর। প্রায় দুশ ২৫টি গল্প তিনি লিখেছেন। এর সবই যে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু অসার্থকতার মাপকাঠি দিয়ে কোনো শিল্পীকে সমগ্রভাবে বিচার করা অসম্ভব, অনুচিতও বটে। বিভূতিভূষণ সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্প অনেক রচনা করেছেন। তাদের সংখ্যা দেড়-শর চেয়ে কিছু বেশি বৈ কম হবে না। বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র গ্রন্থের ভূমিকায় সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গল্পকার বিভূতিভূষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

৫ম বর্ষ : ১০ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৫

রবীন্দ্রভাবনায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান

আবদুল্লাহ আল-মুতী

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের ভাবনার জগতে শিক্ষা একটি বড় জায়গা দখল করে ছিল। তাঁর নিজের শৈশবের শিক্ষা জীবন তেমন সুখকর হয় নি বলেই হয়তো তিনি শিক্ষা নিয়ে এত ভেবেছেন। ভেবে ভেবে এবং এবিষয় নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করে তিনি যে শুধু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের নানা নতুন নতুন ধ্যান - ধারণার সঙ্গে গভীর পরিচয় অর্জন করেছিলেন তাই নয়, শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বিশাল পরীক্ষাশালায় শিশু-কিশোর-তরুণদের এক নতুন জাতীয় শিক্ষাধারায় দীক্ষিত করে তোলার কর্মোদ্যোগও শুরু করেছিলেন।

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রভাবনা তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ, চিঠি, ভ্রমণকাহিনীতে বিধৃত হয়ে আছে। দেশের শিক্ষাসমস্যার সমাধান যে কত জরুরি সে বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ পায় তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'র (১৩৩৮) এই উক্তি থেকে: "আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের বুকের উপর যত-কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার একটিমাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌর্বল্য সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।.."

এই শিক্ষার অভাব মোচন করার জন্য যে ধরনের বিশাল উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন তা সে সময়ের পরাধীন ভারতবর্ষে বাস্তব কারণেই সম্ভবপর ছিল না। (আজও কি তা সম্ভব হয়েছে?)। কিন্তু প্রাচীনপন্থী টোল-মাদ্রাসার শিক্ষা আর উগ্র ইংরেজি-ঘেঁষা শিক্ষার বিকল্প হিসেবে একটি জাতীয় শিক্ষাধারা প্রবর্তনের যে আন্দোলন সে সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার এক সাহসী ও কর্মিষ্ঠ যোদ্ধা। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ, বক্তৃতা ইত্যাদি তার পরিচয় বহন করে।

শিক্ষাভাবনা

পরাধীন দেশে কেরানি তৈরির যে শিক্ষাব্যবস্থা উনিশ শতকে গড়ে উঠেছিল তার প্রধান ঝোঁক ছিল প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি নয়, তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়ার ওপর। এই উপলব্ধির সঙ্গে যোগ হয়েছিল রবীন্দ্রভাবনার একটি মূল দিক—

৮ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৯৫

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ স্থাপন। ছোটবেলার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা থেকেই হয়তো তাঁর মধ্যে এই প্রকৃতি প্রেমের দৃঢ় অধিষ্ঠান ঘটেছিল। কিংবা হয়তো তার উলটোটাই সত্যি: অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি গভীর অনুরাগ থেকেই তাঁর মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যান্ত্রিকতার প্রতি বিতৃষ্ণা গড়ে উঠেছিল।

প্রকৃতি ও মানুষের কাছ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার মূল্য পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি। আসলে মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে তার বিকাশের জন্য প্রকৃতির উদার প্রাঙ্গণই হল সবচেয়ে প্রশস্ত: তাই প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন যে শিক্ষার আয়োজন তা মূলত কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান। ....শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে।" (শিক্ষাসমস্যা, ১৩১৩)

এজন্যই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মেশামেশি এক আদর্শ শিক্ষাঙ্গন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়, "...আমি আকাশ আলোর অঙ্গশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে।" আবার আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, "মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীত গ্রীষ্মে কোন কালে আমাদের মুখ ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে।" (শিক্ষা, ১৩১৫)

অনেক রূপক রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন শিশু মনস্তত্ত্বের গভীর তত্ত্বকথা। তাঁর 'ডাকঘর' নাটকে অমল-এর চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শিশু মনের আকুলি বিকুলি। 'তোতাকাহিনী' রচনায় প্রকাশ পেয়েছে পুঁথিগত শিক্ষা কিভাবে আমাদের চিত্তবৃত্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয় তার ছবি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ শিশুশিক্ষার জন্য দু'খণ্ডে 'সহজ পাঠ' (১৯৩০) নামে যে বই লিখেছিলেন তারও বিষয়বস্তু প্রধানত শিশুদের চারপাশের পরিবেশ আর তাতে উপস্থাপনের ধাঁচটি মূলত মনস্তাত্ত্বিক।

বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিক্ষাভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই তিনি বলতে পেরেছেন : "তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" তাঁর সে বিশ্বসত্তা এই পৃথিবীর নানা ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ওঠে মানুষের জন্য এক

মহৎ জীবনের আদর্শ তুলে ধরে। শিক্ষাকে দেখেছেন তিনি তার ব্যাপকতম অর্থে। প্রকৃত শিক্ষা কেবল মেধার বিকাশ সাধন নয় হৃদয়ের বিকাশ সাধনও বটে। যা মানুষের সামগ্রিক সত্তার বিকাশ ঘটায় তাই হল সুশিক্ষা। আর এই সুশিক্ষার লক্ষণ হল: "তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তি দান করে।" তাঁর শিক্ষা হল এমন শিক্ষা যার প্রকৃত লক্ষ মানুষকে সত্যের সন্ধান দেওয়া: "আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।" (পল্লীপ্রকৃতি) তাঁর এসব মতামতের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সেরা শিক্ষাতত্ত্ববিদ রুশো, হোয়াইটহেড, বার্ট্রান্ড রাসেল, জন ডিউই প্রমুখের মতামতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই যে মানুষকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করা, মুক্ত মনের অধিকারী করে তোলা, সত্যসন্ধানী করা — মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গিই রবীন্দ্রনাথের মনে বিজ্ঞানচর্চার প্রতি একটা গভীর আগ্রহের জন্ম দিয়েছিল। তিনি যে শুধু নিজে বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন তাই নয়, সারাদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে যাতে বিজ্ঞানের চর্চা প্রসারিত হয় সেজন্য শক্ত হাতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সর্বসাধারণের বোধ্য ভাষায় লেখার কাজে কলম ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনার ক্ষেত্রে তাই নানা মাত্রা দেখতে পাওয়া যায় :

ক. শিশুদের শিক্ষা যাতে বিজ্ঞানভিত্তিক হয় সেজন্য তাদের জন্য বইতে প্রকৃতিবিষয়ক ও বিজ্ঞাননির্ভর রচনা অন্তর্ভুক্ত করা;

খ. তাঁর সমগ্র কাব্য, গল্প-উপন্যাস ও অন্যান্য রচনায় প্রকৃতি বর্ণনা ও মানবচরিত্র বিশ্লেষণে গভীর প্রকৃতি প্রেমের প্রকাশ;

গ. তাঁর নিজের বিজ্ঞানবিষয়ক জনপ্রিয় রচনা এবং তার জন্য বিজ্ঞানের পরিভাষা নির্মাণ;

ঘ. বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে শুধু তত্ত্বগত চর্চা নয়, গ্রামীণ জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবার চেষ্টায় কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রবর্তন;

ঙ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ যে মানব সভ্যতার জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে, এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা এবং নানা রচনায় তাঁর প্রকাশ।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার শুরু

রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের সূত্রপাত হয়। এ বিষয়ে তিনি 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন: "যখন আমার বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না। তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ।..." তেমনি তাঁর মনে বিজ্ঞানচেতনার সূত্রপাতও ঘটেছিল শৈশবেই তাঁর প্রকৃতিপ্রেমিক বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে। ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর জন্য নর্মাল স্কুলের শিক্ষা ছাড়াও গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল;

সে শিক্ষার বিস্তারও ছিল বেশ ব্যাপক। গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার সঙ্গে চারুপাঠ আর মেঘনাদবধ কাব্য সেখানে সহাবস্থান করত। কুস্তি, জিমনাস্টিক্স, ড্রইং, গান শেখা আর ইংরেজিও বাদ যেত না। তাঁর বয়স যখনমাত্র ন'দশ বছর তখনই মানবদেহের অঙ্গসংস্থান ও অস্থিবিদ্যা শেখার জন্য তাঁকে মেডিক্যাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ কক্ষেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শৈশবে আমের আঁটি ও আতা-বীচি নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন তা বৃদ্ধ বয়সে কৃষি সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে পরিণতি লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে দুনিয়া জোড়া বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ইউরোপে বিজ্ঞানের যে বিপুল বিকাশ আর শিল্প-বিপ্লব ঘটেছিল তার ঢেউ এসে পৌঁছেছিল পরাধীন ভারতেও। উনিশ শতকের শুরুতেই স্টীম এঞ্জিনের ব্যাপক ব্যবহার যন্ত্রসভ্যতার দ্রুত বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছে, মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রেও এনেছে বিপুল আলোড়ন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক আগে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, প্রায় একই সময়ে রসায়নবিদ্যার ব্যাপক বিকাশ, বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার, জীবাণুতত্ত্ব প্রভৃতি মানুষের জীবনযাত্রায় রূপান্তর ঘটাতে শুরু করেছে। মাত্র সতের বছর বয়সে ইউরোপ বাসের সময়ে বিজ্ঞানের এই অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাঁর আরো গভীর পরিচয় ঘটে।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনাও কিছুটা আরম্ভ হয়েছে। নব্য ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমেই বিজ্ঞানমুখী হয়ে উঠেছে। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ লেখক-লেখিকা সহজ বাংলায় সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা লিখতে আরম্ভ করেছেন। এসব রচনা রবীন্দ্রনাথকে শৈশবকালেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

জ্যোতির্বিদ্যায় ছেলেবেলাতেই রবীন্দ্রনাথের মনে যে আকর্ষণ গড়ে ওঠে তার মূলে ছিল তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব। তাঁর যখন মাত্র বার বছর বয়স তখন হিমালয়ের ড্যালহৌসি পাহাড়ে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাবার সময় সন্ধ্যাবেলা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, জ্যোতির্বিদ্যার নানা বিষয় বর্ণনা করতেন। তাঁর কাছে জ্যোতির্বিদ্যার নানা কাহিনী শুনে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে এ বিষয়ে অনুরাগ গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে তিনি পরে লিখেছেন: "তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।" "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামে তাঁর এই রচনা ১৮৭৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৮৫)। এই পত্রিকায় ছোটদের

উপযোগী করে নিয়মিত জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে সুখপাঠ্য রচনা লেখার ভার পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের ওপরে। সে পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি এসব নিয়ে লিখতেন। কিছুদিন পরে ১৮৯১ সালে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তাতেও রবীন্দ্রনাথ প্রাণিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

বিজ্ঞানের প্রতি এমন আগ্রহ ছিল বলেই পরিণত বয়সে ১৯২৬ সালে ইউরোপ সফরের সময় রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে তাঁর কাছে তরুণ বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে জানতে পারেন। দেশে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরপর ১৯৩০ সালে জার্মানিতে আরো একবার আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

এ সময়ে, অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম ভাগে, বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বিপুল আলোড়ন চলছে। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রচার করে সনাতন বিজ্ঞানের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন। বেতারযন্ত্র, আকাশ বিজয়, তেজস্ক্রিয় পরমাণুর গড়ন, ইলেকট্রন-প্রোটন দু-ধরনের তড়িৎকণা, কোয়ান্টামবাদ, জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য, জীবাণুতত্ত্ব, বংশগতিবিদ্যা, প্যাভলভের গ্রন্থিক্ষরণতত্ত্ব এমনি সব নানা বৈজ্ঞানিক ধারণা চারদিকে প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এ সবই রবীন্দ্রনাথের মনেও বিরাটভাবে দোলা দিয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সেও এসব বিষয় নিয়ে গভীর কৌতূহলবশে তিনি পড়াশোনা করেছেন প্রচুর। যেখানে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাছে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছেন।

সাহিত্যচর্চায় প্রভাব

বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই সহজাত অনুরাগ তাঁর সাহিত্যচর্চায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তাঁর কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও নাটকে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ চেতনার ছাপ সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের রচনা 'প্রভাত-সঙ্গীত' (১৯৮১)-এ সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় প্রসঙ্গে তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্বকে যেমন কাব্যরূপ দিয়েছেন, তেমনি তার অনেক পরে 'সোনার তরী'র (১৯২৩) নানা কবিতায় (বসুন্ধরা, সমুদ্রের প্রতি প্রভৃতি) ফুটে উঠেছে সমকালীন বিজ্ঞানের গতিময়তার সুর। অভিব্যক্তিবাদের ধারণা যে রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তার চিহ্ন তাঁর কাব্যসাধনার সর্বাঙ্গে ছড়ানো। আজকের জীবলোকের জন্ম হয়েছে আদি জীবরূপ থেকে, তখন আমাদের জীবনসত্তা হয়তো লুকানো ছিল বৃক্ষরাজির মর্মরধ্বনির রূপ নিয়ে এই ধারণা এভাবে রূপ পেয়েছে তাঁর 'বসুন্ধরা' কবিতায় :

"মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়।"

আবার 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় আদি প্রাণসত্তার উদ্ভবের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এভাবে:

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ
ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। ......"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে যে নিখিল চরাচরে ব্যাপ্ত বিশ্বমানবতার জয়গান গেয়েছেন, সমুদ্রের অবিরাম কলধ্বনির মধ্যেও সেই একই ঐকতানের সুর তাঁর কানে বেজেছে। বিশ্বভুবনের প্রতিটি কণিকার সঙ্গে তিনি বোধ করেছেন আত্মীয়তার বন্ধন। 'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্যে তিনি তাই বলেছেন:

"বলি হে সবিতা
তোমার তেজোময় অঙ্গেয় সূক্ষ্ম
অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু-পরমাণু।"

'নৈবেদ্য' (১৯০১) গ্রন্থের 'স্তব্ধতা' কবিতাতেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সেই একই বিশ্বানুভূতি :

"শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে
লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণু-পরমাণুদের নৃত্য-কলরোল
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।"

আগেই বলা হয়েছে, বিশ শতকের শুরুতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষের জীবনে এবং চিন্তার জগতে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্যে রমাঁ, রলাঁ, বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ দার্শনিক লেখক এই আলোড়নের ফসল। বস্তুজগতে পরমাণুর নিরন্তর গতি,

অবিরাম প্রবাহ আর স্পন্দন মানুষের চিন্তার জগতেও নিয়ে এল এক প্রবল ছন্দোময়তার রেশ। তারই প্রতিফলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের 'বলাকা' (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্যে।

যেখানে কবি নিতান্ত প্রকৃতিপ্রেমিক, সেখানেও তিনি প্রকৃতির মধ্যে দেখেন বিশ্বসৃষ্টির নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। 'বনবাণী' গ্রন্থের 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় (১৯২৬) তিনি উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতের উদ্ভব আর ঐক্যের তত্ত্ব এবং এ দুয়েরই শক্তির উৎসরূপে সূর্যকিরণের ভূমিকা এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তুলে ধরেন আশ্চর্য কাব্যরূপ দিয়ে:

.... জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে সৃষ্টিযজ্ঞে সেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ: ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী, শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান করেছ জগৎজয়ী; দিলে তারে পরম সম্মান; হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী সে অগ্নিচ্ছটায় প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায় ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্ন বাধা। ...."

শুধু কাব্যচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের কাঠামোতেও অতি সহজে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে তাঁর শেষ বয়সের রচনা 'সে' (১৯৩৭) 'তিনসঙ্গী' (১৯৪০), 'গল্পসল্প' (১৯৪১) এসব বইতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ নানাভাবে আকর্ষণীয় রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। যেমন 'গল্পসল্প' বইয়ের প্রথম গল্পটির নাম "বিজ্ঞানী"। বিজ্ঞানী নীলমণি চটি হারায় কেন তার কারণ খুঁজে পান না, অথচ চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেন্ড দেরি হয় কেন তা তাঁর অঙ্কে ধরা পড়বেই। এ থেকে মনে হতে পারে এই লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তাঁর গিন্নী রেগে থাকবেন, কিন্তু না, তা নয়। কবি বলেছেন, "গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি — একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।"

'শেষের কবিতা'র (১৯২৯) অতি আধুনিক নায়ক অমিত একদিন গঙ্গার ধারে পিকনিকে লিলি গাঙ্গুলিকে বলে: "...কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়...।" আবার আরেক দিন সে লাবণ্যকে বলে: "... দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই, ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relative of Names প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি। ...সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি বলে কোনো পদার্থ নেই; ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।" এমন বিজ্ঞানঘনিষ্ঠ সংলাপ বাংলা সাহিত্যে আর কোন লেখকের লেখায় পাওয়া যাবে?

জনপ্রিয় বিজ্ঞান

পরিণত বয়সে এসেও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে পড়াশোনা করে গিয়েছেন। এরই পরিণামে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' নামে বিজ্ঞানবিষয়ক বই।

সমকালীন বিজ্ঞানের প্রধান কয়েকটি দিক নিয়ে পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন এই বইটি- পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোক; এ ছাড়া আছে উপসংহার। ১৩৪৪ সালে আলমোড়ার নিভৃত গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের সময় তিনি এটি রচনা করেন। বইটি সে বছরই আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে তিনি যে শুধু সমকালীন বিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে এই বর্ণনাকে আশ্চর্য সাহিত্যরসের সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছেন।

'বিশ্বপরিচয়' বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। তাতে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আচার্য বসুর অবদানের প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধই ফুটে উঠেছে। উৎসর্গ উপলক্ষে কৈফিয়তের আকারে রবীন্দ্রনাথ বইটির যে ভূমিকা লিখেছেন তাতে দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানবিস্তার ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার গুরুত্ব এবং বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি তাঁর মতামত সংক্ষেপে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর মনে যে একটা দর্শন সারা জীবনব্যাপী বিজ্ঞানপাঠের ও বিজ্ঞানচিন্তার ভেতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে তাও এতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পশ্চাৎপদতার পেছনে বিজ্ঞানচর্চার অভাব যে অনেক পরিমাণে দায়ী এই উপলব্ধি তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে :

> "বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়েপড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এ দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

'বিশ্বপরিচয়' লিখতে গিয়ে পরিণত বয়সে তাঁকে যথেষ্ট সময় ও শ্রম দিতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্বন্ধে বইপত্র যোগাড় করে পড়েছেন; যেখানে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে সেখানে বিজ্ঞানীদের সহায়তা নিয়েছেন ব্যাখ্যার জন্য। বৃদ্ধ বয়সে এই বই লেখায় হাত দেবার কারণ হিসেবে বলেছেন: "তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল।" (ভূমিকা, তৃতীয় সংস্করণ)

'বিশ্বপরিচয়' বইতে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান আলোচনায় সহজ পরিভাষাবর্জিত রচনাভঙ্গির একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন; কিন্তু অতি সহজ করবার চেষ্টায় মালমসলা খুব বেশি কমিয়ে ভাষার তরীকে হালকা করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি কেননা, তাঁর ভাষায়, "দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।" এ বিষয়ে তিনি এভাবে একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন :

> "যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজশূন্যে

করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাই শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর।"

একই বইতে একযোগে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, ভূবিদ্যা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রের অতি আধুনিক তত্ত্বের সমাহার ঘটানো যে মোটেই সহজ কাজ ছিল না তা বলা বাহুল্য বিশেষ করে বিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ যাঁর আদৌ ঘটে নি এমন ব্যাক্তির পক্ষে। আর তিনি যে কাজটি অতি দক্ষতার সঙ্গে করেছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন, "অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জিত বোধ করছি... ।"

রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের জন্য বিজ্ঞান আলোচনায় ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তা এ ধরনের: "ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে...অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না।" এই দুই শর্ত একই সঙ্গে পালন করা যে অতি দুঃসাধ্য তাতে সন্দেহ নেই।

স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহারের যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন তাতে তিনি নিজে দক্ষতা অর্জন করেছেন অতি সহজ সার্থকতায়। বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও সরস ও স্বচ্ছন্দ গতিময় ভাষা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র তিনি বলেছেন, "মানুষের বুদ্ধি সাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে, বিজ্ঞানে। ..... জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিস্কার হওয়া চাই, তাতে ঠিক কথাটার মানে ঠিক থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়।" ('বাংলাভাষা-পরিচয়', ১৯৩৮) যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত ভাষার আদর্শ গ্রহণ করলেও বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় পরিভাষার ব্যবহার একেবারে বাদ তিনি দিতে পারেন নি। তবে বলেছেন, "পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।" সহজ ভাষায় লিখতে গিয়ে অনেক সহজ সুন্দর পরিভাষা তাঁকে সৃষ্টি করতে হয়েছে, যেমন লাল-উজানি আলো (infra-red light) বেগনি-পারের আলো (ultra-violet light) কিরীটিকা (corona) যন্ত্রপেষণী (grinding mill) কণকার (granular), গ্রহিকা (asteriod), কেন্দ্রাতিগ (centrifugal), কেন্দ্রানুগ (centripetal), সম্মোহন (mesmerism) ইত্যাদি তাঁর তৈরি কোন কোন প্রতিশব্দ আজ আর প্রচলিত নয়, যেমন আঙ্গারিক গ্যাস (আজকের ব্যবহার কারবন ডাই-অক্সাইড), কুটিল রেখা (বক্ররেখা), বিপ্রকর্ষ (বিকর্ষণ) বা প্রলীন (দ্রবীভূত)। কিন্তু অনেক বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দকে তিনি সেকালেই সাহসের সঙ্গে বাংলায় গ্রহণ করেছেন, যেমন হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, প্রোটন, নিউট্রন, পজেটিভ, নেগেটিভ ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন, এদেশে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার উদ্বোধন ঘটাবার আহ্বান জানিয়েছেন তা নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার আয়োজনটা তিনি বেশ পাকাপোক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। বাগান তৈরি, বনায়ন এবং কৃষিতে তাঁর ছিল গভীর উৎসাহ। শ্রীনিকেতনে তিনি স্থাপন করেছিলেন পরীক্ষামূলক কৃষি খামার, একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কৃষিবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছিলেন সুদূর আমেরিকায়। এদেশের অগ্রগতিতে গ্রামের সাধারণ মানুষদের উন্নতির ভূমিকা যে কত গভীর এ সম্পর্কে তার অভিমত প্রকাশ পেয়েছে ১৯৪০ সালে শ্রীনিকেতনের এক বার্ষিক উৎসবে দেওয়া ভাষণে :

> "অশিক্ষিত পল্লীবাসীর সঙ্গে শিক্ষিত শহরবাসীর ভেদ দূর না করতে পারলে দেশ কখনো বড়ো হতে পারবে না। আজ বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সব শিক্ষার পথকে সহজ করে গ্রামে সর্বজনের সুগম করে দিতে পারাটাই সকলের চেয়ে বড়ো সেবা। যে শিক্ষা য়ুরোপ থেকে এসেছে আমাদের দেশে তাকে গ্রহণ করে, সকলের মাঝে ঢেলে দিতে হবে, কারণ শিক্ষার মধ্যে দেশ-বিদেশের ভেদ নেই।" (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৬)

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যেমন পুলকিত হয়েছেন এবং তার প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনকে আলোকিত করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন, তেমনি বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ এবং যন্ত্রের পীড়ন নিয়ে তিনি ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, আতঙ্কিত। বিজ্ঞানকে শোষণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখে তিনি পীড়িত বোধ করেছেন। 'কালান্তর' (১৯৩৭)-এ তিনি বলেছেন :

> "বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান দশজনের কাছে গিয়া পৌঁছায় সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয়, সেখানেই তার ভয়ঙ্কর পতন। ..."

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকেও ধ্বনিত হয়েছে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই বই লেখার আগে তিনি সাত মাস আমেরিকায় কাটিয়েছিলেন। আমেরিকা অবস্থানের বিষয় উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন: "অনবচ্ছিন্ন সাতমাস আমেরিকার ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলাম। ... সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না।" (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি, ১৯২৫) অনেক ক্ষেত্রেই তিনি আধুনিক সভ্যতায় যন্ত্রের ব্যবহারকে দেখেছেন অভিশাপ হিসেবে। আমেরিকা থেকে ফিরে লেখা

'রক্তকরবী'তে এই যন্ত্র সভ্যতার হৃদয়হীনতার ছবিই ফুটে উঠেছে। তা বলে কবি যে একেবারেই যন্ত্রের বিপক্ষে তা বলা যাবে না। কয়েক বছর পর সোভিয়েত দেশ ঘুরে এসে তিনিই আবার লিখলেন,

> "এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনের মত সে বিষয়ও উদ্‌গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কলতলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুড়ি মেরে আসছে। ... কিন্তু এজন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তি সম্পদকে দোষ দেবো না, দোষ দেব মানুষের রিপুকে ... যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে।"

বয়সের পরিণতির সময়েও রবীন্দ্রনাথ চিন্তার ক্ষেত্রে, রচনাশৈলীর দিক থেকে নানা নতুন পথের সন্ধান করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের শুধু ' রক্তকরবী' (১৯২৫) আর 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) দেয় নি, তাঁর সচেতন কৌতূহলদীপ্ত বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনেরও পরিচয় তুলে ধরেছে।

আজকের দিনে যখন বল্গাহীন ভোগের ফলে পৃথিবীর পরিবেশের সঙ্কট ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, মুক্তচিন্তার ধারাকে পরাস্ত করে পৃথিবীর দিকে দিকে অন্ধবিশ্বাস আর মৌলবাদের প্রভাব মানব সভ্যতার অগ্রগতির চাকাকে পেছনের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিঘনিষ্ঠ জীবনধারা আর শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন, তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠতা আর মুক্তচিন্তা একান্তই সমকালীন এবং প্রাসঙ্গিক মনে হয়। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে দেখা রবীন্দ্রনাথের সেসব স্বপ্নকে মনে হয় তা যেন আমাদেরও স্বপ্ন; এদেশে আগামী দিনের নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা আজও আমাদের অক্ষয় প্রেরণা।

লেখক : শিক্ষাবিদ, লেখক, সংগঠক, আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত
এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব।

২৮ এপ্রিল ১৯৯৫ শিক্ষাবার্তা-র উদ্যোগে আয়োজিত 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় পঠিত।

চীনের শিক্ষাব্যবস্থা যা দেখেছি

অনিল ভট্টাচার্য

কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বুঝতে হলে সে দেশের সমাজব্যবস্থা আর ঐতিহাসিক পটভূমিটি মনে রাখা দরকার। চীনের সভ্যতার ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের। তার সমগ্র ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ততম বিবরণের স্থানও এখানে অকুলান। সুতরাং ভূমিকায় কেবল সে দেশের কিছু বৈশিষ্ট্য ও ঘটনা, যা প্রাসঙ্গিক তারই উল্লেখ করছি। আধুনিক যুগের আগে চীনের ইতিহাস- নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ইতিহাস। এক একটি রাজবংশের শাসনকাল ২০০, ৩০০, ৫০০ এমনকি ৮০০, ৯০০ বছরব্যাপী বিস্তৃত। আদিকালের শাসকদের নাম, কীর্তি, লোকগাথার মাধ্যমে তা জানা যায়। ফুসি (Fu Hsi) স্মরণীয় কারণ তিনি চীনা লিপির উদ্ভাবক। আর তাছাড়া তিনি নাকি ক্যালেন্ডারও চালু করেন। ইতিহাসে উল্লিখিত প্রথম রাজবংশ শাঙদের শাসনকাল শুরু খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে। শাঙদের পরে প্রায় নয় শতাব্দীব্যাপী চাও (chou) রাজাদের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই শাসকদের প্রচলন করা রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত রূপে আধুনিক যুগের শুরু পর্যন্ত অটুট ছিল। এই যুগের দার্শনিক ছিলেন কনফুসিশস, লাও সে (Lao se) চীন দেশের মানুষের বোধ-বুদ্ধি-মননে তাঁদের দর্শনের প্রভাব আজও মুছে যায় নি।

চাওদের পরে চীন (qim Dynsty) রাজবংশের সি হুশং তাই (chin Shish Huang-TI) নিজেকে চীনের প্রথম সম্রাট বলে ঘোষণা করেন (খ্রি. পূ. ২২১ সন)। চাও আমলে চীনের লিপি-পদ্ধতির উন্নতি হয়েছিল বটে কিন্তু লিখিত ভাষার মানগত উৎকর্ষ সাধন হয় সি হুয়াং তাই-এর আমলে। অবশ্য চীন-সংস্কৃতির অনেক ক্ষতির কারণও তিনি। তিনি আদেশ জারি করেছিলেন চিকিৎসা ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত পুস্তক ব্যতীত অন্য পুস্তক পুড়িয়ে ফেলতে হবে — অমান্যে মৃত্যুদণ্ড। এই আদেশের পরিণতি সহজেই অনুমেয়। এই আদেশ লঙ্ঘনকারীদের তাদের প্রিয় বইসমেত জীবন্ত দগ্ধ হতে হয়েছিল। কী পৈশাচিক প্রবৃত্তি। চাওদের পর ৪০০ বছরব্যাপী রাজত্ব হান-রাজবংশের। এই আমল থেকে রাজারা রাজকার্য চালানোর জন্য নির্ভর করতে শুরু করেন বিদ্বান আধিকারিকদের (scholar offical) উপর। এই আধিকারিক বাছাই হতো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা প্রসঙ্গে তথ্যটি জরুরি। পরীক্ষণপদ্ধতি, যা ছিল শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ, তা যে খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকেই এখানে উন্নতমানের এবং বহুল ব্যবহৃত সে কথা সুস্পষ্ট।

৮ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন '৯৫



দেশে চতুর্থ শ্রেণীর নীচে থেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার্যকর হয়েছে কিনা তা তিনি জানাতে ব্যর্থ হন।

৬. Letter of Rossna Masari, The cultural attache, Embassy of Italy plt No. 2/3 Road No. 74/79, Gulshan, Dhaka.

Letter of Jorn peterson, attache, Development Co-Operation, Embassy of Denmark, G.P.O Box-2056, House No. 1 Road No. 51, Gulshan, Dhaka.

৭. Telephonic news by mustaq Ahmed, Educational Adviser, Embassy of Japan plot No. 110, Road No. 27, Block-A, Baridhara, Dhaka.

৮. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (অনূদিত) আমেরিকার জীবন ও প্রতিষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সার্ভিস (ইউরিস), ঢাকা।

৯. প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩

১০। প্রাগুক্ত পৃ. ৪৫

১১. Letter of Mohammad Ali, Information Officer, Canadion Embassy, House No. 164, Road No. 48, Gulsan, Dhaka, G.P.O Box 569

১২. Towards Universalization of primary Education Asia & the Pacifie countries sreelanka, UNESCO Regional office for Education Asia and the pacific Bangkok, 1984. p-23

১৩. Letter of Moni DAE SEUNG Industry Co. Ltd. 399-2 GAMJ RIKIMPO- UP KIMPO JUN, KYUNGGI-DO, SOUTH KOREA.

১৪. Towards Universalization of primary education in Asia & the paciffic. countries.

UNESSCO Regional office for education in Asia and the paciffic, Bangkok. 1984 PP. 16& 39. Indonesia.

১৫. মো. কমরুদ্দীন মাহমুদ, গ্রাম-মদনপুর, ডাকঘর-সুভাষিণী, জেলা- সাতক্ষীরা।

১৬. জনাব মো. এলাহি বক্স শেখ, গ্রাম-কাঞ্চনপুর, পোঃ মাগুরা ঘোনা, জেলা-খুলনা।

১৭. জনাব মো. নূর আলী সরদার, গ্রাম ও পোঃ শিরোগুনি, ভায়া-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা।

১৮. জনাব মো. আজিজুল রহমান, গ্রাম উথুলি, পোঃ সুজনশাহ, ভায়া-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা।

১৯. জনাব মো. নওয়াব আলী খান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, কেশবপুর কলেজ, কেশবপুর বাজার, পোঃ কেশবপুর, যশোর।

২০. জনাব মো. নুরুল হালিম, অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক (ইংরেজি) বেজপাড়া, যশোর।

সহযোগী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ বি.এল. কলেজ, খুলনা।

প্লেটো

গোলাম ফারুক

জ্ঞানেই পুণ্য

"কেহ নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার অতিরিক্ত কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হইতে পারিবে না; দ্বিতীয়ত, কাহারও এমন কোনো বাসগৃহ বা গোলাবাড়ি থাকিবে না যাহা অন্যদের জন্য অবারিত দ্বার নহে— ক্ষেত্রে অবস্থানের সময় যেমন করিয়া থাকে, তদ্রূপই তাহারা সকলে একত্রে বাস করিবে এবং একই অন্ন গ্রহণ করিবে— নগরে একমাত্র তাহারাই স্বর্ণ বা রৌপ্য সম্পর্কিত কোনো ধরনের লেনদেন করিতে সাহস করিবে না, এমনকি ঐসব মূল্যবান বস্তু স্পর্শ করিবে না অথবা ঐসব বস্তুর সহিত একই গৃহে অবস্থান করিবে না।"

না, এটা কঠোর কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের বর্ণনা নয় বা কট্টর কোনো কমিউনিস্ট দলের অনুশীলন পদ্ধতিও নয়। এটা হচ্ছে প্লেটোর 'রিপাবলিকে'(Republic, Book III, 415E) বর্ণিত আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর জীবন-পদ্ধতি। পশ্চিমী দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে নন্দিত, শ্রদ্ধাস্পদ ও খ্যাতিমান হচ্ছেন প্লেটো। প্রায় চব্বিশ শতক আগে এথেন্সে জন্মেছিলেন, তারপর থেকে তিনি যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বিশেষণে, শব্দভূষণে বিভিন্নভাবে প্রশংসিত ও অলংকৃত হয়ে আসছেন। বলা হয়, তিনিই প্রতীচ্যের মহত্তম দার্শনিক, পাশ্চাত্য দর্শনের জনক, দেবতা এ্যাপোলোর পুত্র, একজন মহত্তম নাট্যকার ও কবি, অলৌকিক সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মননশক্তি দিয়ে যিনি মানবজীবনকে উন্নত করেছেন, যিশুখ্রিস্ট ও সেন্ট পলের পূর্ববর্তী একজন সন্ত যিনি সর্বোৎকৃষ্ট ভালোত্ব, প্রেম ও সৌন্দর্যকে ধারণ করেছিলেন। তিনিই সর্বকালের নৈতিক উপদেষ্টা ও দার্শনিকদের মধ্যে মহত্তম। ব্রিটিশ দার্শনিক ও গণিতবিদ আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট হেডের মতে সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস প্লেটো দর্শনের সারিবদ্ধ পাদটীকা ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কিন কবি ও দার্শনিক র‍্যালফ ওয়ালডো এমার্সনের ভাষায় 'প্লেটোই দর্শন আর দর্শন মানেই প্লেটো' 'প্লেটো থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে বা হচ্ছে সবই প্লেটো থেকে উদ্ভূত'।

৮ম বর্ষ: ৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

স্পার্টা-এথেন্সের যুদ্ধে স্পার্টা-কর্তৃক বিজিত এথেন্সে ক্রমক্ষীয়মাণ এথেনীয় সভ্যতার আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছিলেন প্লেটো। যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিপর্যস্ত অর্থনীতি নিয়ে এথেনীয় সমাজ তখন টালমাটাল। প্লেটোর জীবনের নানান ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব ও হতাশাবোধ হয়তো তাঁর সমসাময়িক সমাজ থেকেই উৎসারিত। ফলে প্লেটোকে বুঝতে হলে সে সময়কার সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকেই বুঝতে হবে। তিনি জন্মেছিলেন পেরিক্লিস যুগের (রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসশাসিত যুগ, যাকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয়) অন্তিম সময়ে, ৪২৭ খ্রিস্টপূর্বে। ৪৪৫ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৪৩১ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এথেন্সের এই স্বর্ণযুগ বা পেরিক্লিস যুগ পূর্ণাঙ্গ মানব সভ্যতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। স্বর্ণযুগের এথেন্সের সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়া দীর্ঘকাল ধরে প্রণয়াবদ্ধ বললে অত্যুক্তি হয় না। শুধু পশ্চিমী দুনিয়া নয়, হয়তো সমস্ত মানবেতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট অনুকরণীয় শহর বলেই, প্রায় সারা দুনিয়ায় সভ্যসমাজ এথেন্সের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। কেন এথেন্সের এই মর্যাদা ? কারণ এথেন্সই প্রথম শহর যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই শহরেই প্রথম জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। অল্পসংখ্যক অভিজাত পরিবারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে এথেন্সের দরিদ্র জনগণ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। বাৎসরিক নির্বাচনে পেরিক্লিস 'প্রথম নাগরিক' নির্বাচিত হন এবং তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাষ্ট্রের অভিজাত ও সাধারণ, ধনী ও দরিদ্র প্রতিটি নাগরিক (দাস ও নারী ব্যতীত) রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। আইনের আওতায় সব নাগরিকের অধিকার সমান এথেন্সে এই মতবাদ তখন ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠেছিল। এথেন্সের প্রায় সমস্ত খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিই তখন গণতন্ত্রী ছিলেন বা গণতন্ত্রী হয়ে উঠছিলেন। দরিদ্ররাও ধনীদের মতো সৎ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে— এথেনীয় সমাজ এটা স্বীকার করে নিয়েছিল। মহান নাট্যকার ইসকাইলাস তাঁর এক বিখ্যাত নাটকে লিখেছেন, 'হতদরিদ্রের ধূম্র-মলিন গৃহেও ন্যায়বিচার জ্বলজ্বল করে।' এবং দার্শনিক প্রোটাগোরাসের কথায় 'নীতিবান ও শ্রদ্ধাস্পদ যে কোন লোক রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে উপদেশ দেওয়ার অধিকার ভোগ করেন।'

এথেনীয় রাষ্ট্রে একটি সংবিধান ছিল আর ছিল বিভিন্ন প্যানেলে ভাগ করা ছয় হাজার জুরি নিয়ে গঠিত একটি সুপ্রিম কোর্ট। আইন ছিল সবার জন্য সমান, সবারই ন্যূনতম শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল এবং গণতান্ত্রিক বিতর্ক ও ভোটের মাধ্যমে যে-কেউ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারত। বাক্‌স্বাধীনতা ছিল এবং যুদ্ধবন্দি ও দাসদের প্রতি মানবিক আচরণ করা হত। পেরিক্লিসের সময় এথেন্সে বেকারত্ব ছিল না, উপরন্তু বাণিজ্য ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে সেখানে প্রভূত পার্থিব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। পরিচিত পৃথিবীতে এথেনীয় নগর-সরকার নৈতিকতার মডেলে পরিণত হয়েছিল এবং এই নগরের জন্য এথেনীয়দের গর্ব ও আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। ৪৪৫ খ্রিস্টপূর্ব থেকে

৪৩১ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সময়টা ছিল শান্তির ও অভ্যন্তরীণ উন্নতির। পেরিক্লিসের দক্ষ পরিচালনাধীন এ-সময়কালে এথেন্স বিশাল সৌধসমূহ নিয়ে অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। তুলনামূলক সভ্যতা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তেমন ঐতিহাসিকদের মতে সভ্যতার ইতিহাসে আর কোনো নগরী সৌধ ও শিল্পকর্ম দিয়ে এত সুন্দরভাবে সজ্জিত হয় নি। এখনও চমৎকার ভাস্কর্য ও খোদাই-করা শিল্পকর্ম শোভিত সৌধাবলি ও মন্দির-সমূহের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে জ্ঞানের দেবী এথেনার মন্দির — এথেন্সের প্রধান মন্দির পার্থেনন। গিরিচূড়া অ্যাক্রোপোলিসের ওপর অবস্থিত এই মন্দিরের স্বর্ণ ও গজদন্ত নির্মিত এথেনার মূর্তিটি গড়েছিলেন ভাস্কর ফিডিয়াস। পার্থেনন ছাড়াও অ্যাক্রোপোলিসের ওপর আরও বেশ কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ এখনও এথেনীয় সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। পেরিক্লিসের এথেন্স তখন সমস্ত গ্রিসের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের আকৃষ্ট করত। এ-সময়কার এথেন্স বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কালজয়ী প্রতিভার সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তখনকার উল্লেখযোগ্য প্রতিভা হলেন ইসকাইলাস, সোফোক্লেস, ইউরিপাইডেস; স্থাপত্যে ফিডিয়াস এবং প্লেসিক্লস; ইতিহাসে হেরাডোটাস ও থুকিডাইডিস্। এছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা সে-সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ঐতিহাসিক থুকিডাইডিসের লেখায় দেখা যায়, পেরিক্লিস এথেনীয়দের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলছেন, 'আমরা সুন্দরের প্রেমিক, রুচিতে সরল ও আমরা শিল্পচর্চা করি আমাদের পৌরুষ অক্ষুণ্ন রেখে।"

কিন্তু এ-সময়টাকে রাজনৈতিকভাবে আপাতস্থিতিশীল মনে হলেও ভেতরে ভেতরে একটা মেরুকরণ ঠিকই সংগঠিত হচ্ছিল। দেশ পরিচালিত হয়েছে পেরিক্লিসের মধ্যপন্থা নীতি অনুসরণ করেই, তবে অভিজাতদের চরম ডানপন্থী নীতি এবং গণতন্ত্রীদের চরম বামপন্থী নীতি — এ দুটো পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক ধারা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ৪৩১ খ্রিস্টপূর্বে বসন্তকালে স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধারম্ভের মুহূর্তে যে এরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েনি তার কারণ হয়তো তাদের গভীর দেশাত্মবোধ। একই সঙ্গে প্রায় এই ধরনেরই আরেকটি মেরুকরণ পরিলক্ষিত হয় সমগ্র গ্রিস জুড়ে। সে সময়কার গ্রিসের প্রায় সমস্ত গোষ্ঠীগুলো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কোনো কোনো গোষ্ঠী ছিল বাণিজ্য ও শিল্প সমৃদ্ধ গণতন্ত্রী এথেন্সের দিকে, আবার কোনো কোনো গোষ্ঠী কৃষিভিত্তিক, সেনাশাসিত ও একনায়কতন্ত্রী স্পার্টার পক্ষে। এই দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে ৪৩১ খ্রিস্টপূর্বে স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় যা 'পেলোপোনিসীয়ান যুদ্ধ' নামে খ্যাত হয়ে আছে। এই যুদ্ধ ছিল গণতন্ত্রের সঙ্গে একনায়কতন্ত্রের। যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে এথেন্সে এক ভয়াবহ মহামারী দেখা দেয়। ফলে এথেন্সের লোকবল কমে যায়। এথেনীয়রা দুর্বল হয়ে পড়ে।

অবশেষে ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বে গণতান্ত্রিক এথেন্স আত্মসমর্পণ করে স্পার্টার কাছে। এ সময় এই নাজুক পরিস্থিতির সুযোগে অভিজাতরা এক বিপ্লবের মাধ্যমে এথেন্সের ক্ষমতা

দখল করে এবং সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ইতিহাসে এই শাসনামলকে 'ত্রিশের শাসন' (Rule of Thirty) নামে অভিহিত করা হয়। এই বিপ্লবের দু জন নেতা থার্মেইডিস্ ও ক্রিটিয়াস ছিলেন প্লেটোর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এঁরা প্রতিনিধিত্ব করতেন সেই সব অভিজাত পরিবারের যাঁরা গণতান্ত্রিক এথেন্সে যুদ্ধ-কর বহন করতে করতে ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরই 'ত্রিশের শাসন'-এর সমাপ্তি ঘটে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়। এই গণতান্ত্রিক এথেন্সেই সক্রেটিসের বিচার হয় ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

প্লেটোর জীবন

পেলোপোনিসীয় যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় তিন বছর পর এবং পেরিক্লিসের মৃত্যুর এক বছর পর জন্মেছিলেন প্লেটো। ফলে পেরিক্লিস যুগের শান্তি ও সৌভাগ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর হয় নি। এথেন্সের অন্যতম অভিজাত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা অ্যারিস্তোন্ ছিলেন এথেন্সের শেষ রাজার বংশধর আর তাঁর মা পেরিক্তওনে ছিলেন একজন অভিজাত সমাজসংস্কারক সোলেনের কন্যা। এই সোলোনের রচিত সংবিধানই এথেনীয় গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তিভূমি। প্লেটোর পরিবারের উভয় দিকই অভিজাত পরিবার থেকে আগত। যুদ্ধের সময় অন্য অভিজাতদের মতো এঁরাও গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যর্থতা ও অব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন। যুদ্ধের আগে প্লেটোর পরিবার গণতন্ত্রের সমর্থক ও পেরিক্লিসের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে গণতন্ত্রী সরকারের এলোমেলো নীতি গ্রহণের ফলে এঁরা সরকারবিরোধী হয়ে পড়েন। এই ধরনের পরিবারগুলো গণতন্ত্রবিরোধী হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে যুদ্ধ-কর। এঁরা যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে আর রাজি ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের চেয়ে সামরিক একনায়কতন্ত্রই তাঁদের কাছে শ্রেয় বলে বোধ হল। গণতন্ত্র দুর্নীতির আখড়া — এ ধরনের ধারণা নিয়েই প্লেটো বড়ো হয়েছিলেন। শক্তিশালী স্পার্টার বিরুদ্ধে এথেন্সের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় হিসেবে অভিজাতরা এক সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। প্লেটো নিজেও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর আত্মীয় থার্মেইডেস্ ও ক্রিটিয়াস্‌দের 'ত্রিশের শাসন' সমাজে শৃঙ্খলা বয়ে আনবে এবং তাঁর গুরু সক্রেটিসই হবেন এই নতুন সমাজের দার্শনিক।

সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু

আদালতে সক্রেটিসের বিচার সম্ভবত ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত বিচার। এ-সময় প্লেটোর বয়স ছিল আটাশ বছর। এরও আট বছর আগে থেকে প্লেটো সক্রেটিসের কাছে অধ্যয়ন করে আসছিলেন, যদিও ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক সূত্রে তিনি সক্রেটিসকে চিনতেন। তাঁর নাটকীয় সংলাপ গ্রন্থ 'অ্যাপোলজি'তে তিনি বর্ণনা করেছেন সক্রেটিসের সেই জবানবন্দি যা তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে পেশ করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে বিধৃত সক্রেটিসের বিচারের ধারাবাহিক বর্ণনা ঐতিহাসিকভাবে

সত্য বলে মনে করা হয়। প্লেটো নিজে বিচারের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং সক্রেটিসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপ্রসূতভাবে আনীত অভিযোগগুলো খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন।

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এথেনীয়রা কি অভিযোগ এনেছিল? তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন অধার্মিকতা, দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ ও এথেনীয় যুবসমাজকে ভ্রষ্টপথে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে। কিন্তু মূলত যেসব নির্দিষ্ট যুদ্ধাপরাধের জন্য সক্রেটিসকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সেগুলোকে যুদ্ধপরবর্তী এথেন্সের অভ্যন্তরীণ হানাহানিকে বিবেচনায় রেখে উল্লেখ করা হয় নি। সে-সময় সরকার জনসমক্ষে যেকোনো যুদ্ধাপরাধ প্রকাশ করা আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যুদ্ধাপরাধ হিসেবে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আনীত নির্দিষ্ট অভিযোগগুলো ছিল এই যে, তিনি থার্মেইডেস্, ক্রিটিয়াস্ ও তাঁর প্রিয় শিষ্য অ্যাল্কিবিয়াডেস্ (এথেন্সের একজন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক)-এর সাহায্যে যুদ্ধকালীন সময়ে একটি প্রতিবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন, এমনকি তখনও ৪০৪ খ্রিস্টপূর্বে বিজিত এথেন্সে অভিজাত তরুণ সমাজকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উস্কানি দিয়ে যাচ্ছিলেন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, সক্রেটিসের বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল সক্রেটিসকে ভয় দেখানোর অভিপ্রায়ে, যাতে তিনি এথেন্স ছেড়ে পালিয়ে যান। বিপর্যস্ত গণতন্ত্র যেন তাঁর অবিরাম সমালোচনা থেকে নিষ্কৃতি পায় সে-লক্ষ্যেই এথেনীয় শাসকরা তাকে শহর থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। এথেনীয়রা তার ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ চাপিয়ে দিয়ে বা তা কার্যকর করে তাঁকে শহীদের মর্যাদা দিতে চাননি। প্লেটো তাঁর 'অ্যাপোলজি'তে লিখেছেন যে, শাস্তি এড়াতে চাইলে সক্রেটিস বিচার শুরু হওয়ার আগেই পালিয়ে যেতে পারতেন বা পালিয়ে না গিয়েও যদি তিনি গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিমত পালটাতেন অথবা গণতন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা বন্ধ করতেন তাহলেও তিনি সাজা এড়াতে পারতেন, কিংবা এসব কিছুই না করে যদি তিনি শুধু কিছু জরিমানা দিতে স্বীকৃত হতেন তাহলেও তিনি মুক্তি পেতেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশ হওয়ার এক মাস পর তা কার্যকর করা হয়। সেই সময়ও তাঁর পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল এবং তিনি যদি পালিয়ে যেতেন তাহলেও কেউ তাঁকে দোষ দিত না।

সক্রেটিসের দর্শন

তিনি কোনোভাবেই, তা যত সামান্য অজুহাতেই হোক, আইনকে এড়াতে চান নি। তিনি মনে করতেন, আইন এড়ানো অপরাধ। আর যেহেতু তিনি নিজেকে এথেন্সের উপকারক ভাবতেন তাই এথেনীয় আইনকে উপেক্ষা করে নিজে কোনো অপরাধ, তা যত ক্ষুদ্রই হোক, জ্ঞাতসারে করতে চাননি। তাঁর বন্ধুরা যখন পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে চাইলেন তখন তিনি বললেন যে, আইন এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া এক ধরনের নৈতিক ও আইনগত অপরাধ। কারণ একজন নাগরিক হিসেবে তিনি নগরের আইন-শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য এবং সমাজের আইন অমান্য করার অর্থ হচ্ছে যৌথ জীবন-পদ্ধতির ভিত্তিভূমিতে আঘাত করা। সক্রেটিস তাঁর দর্শনের বিমূর্ত নীতিগুলো থেকে

কখনও সরে দাঁড়াননি। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি আদালতে যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন তাতেই তাঁর দর্শন ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর দার্শনিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই তিনি মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিচারক বা জুরিদেরকে তুষ্ট করতে চান নি, এমনকি অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তির জন্যও তিনি আবেদন করেননি। এভাবেই তিনি তাঁদেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদানে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু কি সেই দর্শন যার জন্য এড়িয়ে না গিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন? আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় সক্রেটিস নিজে তাঁর দর্শনের যে মূলসূত্রগুলো উল্লেখ করেছিলেন সেগুলো হল :

(১) তখনই সত্যিকারের জ্ঞানী হওয়ার পথে তুমি এগোতে পার যখন তুমি জানবে যে তুমি কিছু জান না। দেবতা অ্যাপোলোর মন্দির ডেলফিতে দৈববাণী হয়েছিল যে সক্রেটিসই হচ্ছেন জীবিতদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানীপুরুষ। তাই সক্রেটিস জুরিদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, আমি প্রমাণ করতে চাইলাম যে দৈববাণী ভুল, তাই আমি প্রথম গেলাম রাষ্ট্রপরিচালকদের কাছে এবং দেখলাম যাদেরকে সবচাইতে জ্ঞানী বলে মনে করা হয় তারাই সবচেয়ে বেশি মূর্খ। তখন আমি বুঝলাম, আমি তাদের চাইতে বেশি জ্ঞানী, কারণ আমি অন্তত এটুকু জানি যে, আমি কিছুই জানি না। তারপর আমি কবিদের কাছে গেলাম এবং দেখলাম তারা জ্ঞানের সাহায্যে নয় বরং দৈবজ্ঞানীদের মতো অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্য রচনা করেন, তারা অনেক চমৎকার কথা বলেন কিন্তু যা বলেন তার কিছুই বোঝেন না। তথাপি কবিরা মনে করেন যে, তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। তারপর আমি গেলাম কারিগরদের কাছে, দেখলাম তাঁরা অনেক কিছুই জানেন যা আমি জানি না, যেমন জাহাজ কিংবা জুতো তৈরি করা। কিন্তু কবিদের মতোই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, তাদের জানা বিষয়গুলোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন জুতো তৈরি করা। এই বিশ্বাস তাদেরকে জ্ঞানী হতে বাধা দেয়। এসব দেখেশুনে আমি সিদ্ধান্তে এলাম যে, আসলে কেউই জ্ঞানী নয় — রাষ্ট্র পরিচালকরা নয়, কবিরা নয়, কারিগররা নয়, এমনকি আমিও নই যার সম্পর্কে ডেলফিতে দৈববাণী শোনা গিয়েছিল, কিন্তু আমি অন্তত এটুকু জানি যে, আমি কিছু জানি না।

(২) সক্রেটিসের জবানবন্দিতে পাওয়া দ্বিতীয় দার্শনিক সূত্র হলো, জ্ঞান ও সত্য-চর্চার মাধ্যমে আত্মার উন্নয়ন বা পরিচর্যা করা। সেজন্যই তিনি বলছেন, আমি এথেন্সের ছোট-বড়ো সবাইকে বলি তোমরা তোমাদের শরীর কিংবা অর্থের পিছনে ছুটো না, তোমাদের প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত আত্মার উন্নয়ন সাধন। যতদিন পর্যন্ত সত্য ও জ্ঞানের খোঁজ না পাও ততদিন পর্যন্ত অর্থ, যশ বা প্রতিপত্তির কথা চিন্তা করো না। সততা অর্থ থেকে আসে না বরং সততাই অর্থ ও অন্যান্য ভালো জিনিস টেনে আনে। এটাই আমার শিক্ষা। আমার এই মতবাদ যদি এথেন্সের যুবসমাজকে কুপথে নেয় তাহলে আমি দোষী। যদি কেউ বলে এসব ছাড়া আমি অন্য কিছু শিখিয়েছি, সে মিথ্যুক।

(৩) সক্রেটিস এরপর এথেনীয়দের উদ্দেশ্য করে বলছেন, তোমরা যদি আমাকে দোষী সাব্যস্ত কর, তাহলে যারা আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সেই দেবতাদের

বিরুদ্ধাচারণ করে পাপ করবে। আমি একটি ডাঁশ (যেসব মাছি গরু, ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণীর রক্তপান করে) মাত্র, যাকে দেবতারা এই রাষ্ট্রে পাঠিয়েছেন। কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিশাল ঘোড়ার মতো, বিশাল বপুর জন্য এটা অলস ও মন্থর গতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে। আমার দায়িত্ব হচ্ছে হুল ফুটিয়ে এটাকে চাঙ্গা করা। এজন্যেই সব সময় সব জায়গায় আমি তোমাদের আলোকিত করে জানানোর চেষ্টা করি এবং ভৎর্সনা করি। তোমরা আমার মতো আর কাউকে এত সহজে খুঁজে পাবে না, অতএব আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি।

(৪) সক্রেটিসের বক্তৃতার চতুর্থ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে: 'জ্ঞানেই পূণ্য'। এই নীতি অনুযায়ী ভালোকে জানা মানেই ভাল কাজ করা। মানুষ খারাপ কাজ করে শুধুমাত্র তার অজ্ঞতার জন্য। যদি জ্ঞানেই পূণ্য লাভ হয়, ভালোকে জানার অর্থ যদি হয় ভালো কাজ করা তাহলে একজন লোক তখনই কুকর্মে ব্যপৃত হবে যখন সে ভালোকে জানতে ব্যর্থ হয়। এখানেই সক্রেটিস সেই বিখ্যাত উক্তি করলেন: "কেউ স্বেচ্ছায় কুকর্ম করে না।" ভালোকে জানার পর কেউ স্বেচ্ছায় মন্দকে বেছে নেয় না। কিন্তু আমরা তো প্রায়শই বলি — 'জেনে শুনে অন্যায় কাজটি করলাম' অথবা 'চাইলেই ভালো কাজটি করতে পারতাম' সক্রেটিসের বিবেচনায় এটা একেবারেই অসম্ভব। যদি সত্যিই কেউ 'ভালো'কে জানে তাহলে সে ভালো কাজটিই করবে। তুমি যা করেছ তারচেয়ে যদি উত্তম বিবেচনাবোধ তোমার থাকত, তাহলে তুমি সেটাই করতে। সক্রেটিস আরও বলছেন, যখন কেউ কোনো খারাপ কাজ করে তখন এই আশায় করে যে, এর ফলে সে উপকৃত হবে, লাভবান হবে। একজন চোর জানে যে, চুরি করা অন্যায়, কিন্তু যখন সে একটি হীরার হার চুরি করে, সে হয়তো এই আশায় চুরি করে যে, এর বিনিময়ে সে তার কাঙ্ক্ষিত রমণীর যৌনানুগ্রহ লাভ করবে। এই চোরের মতো প্রায় সবাই জীবনপাত করে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি বা অর্থের পেছনে ছোটে কারণ তারা মনে করে যে এসবই ভালো এবং এসবের মধ্যেই তারা সুখ খুঁজে পাবে। কিন্তু তারা জানে না কোন্‌টি ভালো। তারা জানে না এসবের কোনো কিছুই ভালো নয় এবং এসবের মাধ্যমে সে কখনও সুখ খুঁজে পাবে না। মানুষের জন্য কী ভালো এবং কিসে মানুষের সুখ, তার জীবনযাপন পদ্ধতি কী হওয়া উচিত এবং কিভাবে সে সেটা আয়ত্ত করবে তা জানার জন্য প্রথমে মানব চরিত্র বুঝতে হবে। মানুষ যদি তা বোঝার চেষ্টা না করে, যদি কোনোদিন না জানে কোন্‌টি তার জন্য ভালো তাহলে সুখী হওয়ার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। এ ধরনের জীবনকে সক্রেটিস অপরীক্ষিত জীবন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত এক বাক্যে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'অপরীক্ষিত জীবন ভালো জীবন নয়'।

নীতিবিদ্যা (নৈতিক দর্শন)

সততা, ন্যায় ও কল্যাণ বিচারে সক্রেটিসের এই যে দৃষ্টিভঙ্গি যাকে বলা চলে যুক্তিবাদী নৈতিক দর্শন। যুক্তিবাদী নৈতিক দর্শন হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি যা প্রজ্ঞা (reason) ও

যুক্তিকে (rationality) নৈতিক আচরণের (moral conduct) প্রধান উপাদান বলে দাবি করে। সক্রেটিসের মতো এই দৃষ্টিভঙ্গিও দাবি করে ভালোকে জানার অর্থই হচ্ছে ভালো কাজ করা। সবাই কি এ কথা মানবেন? বেশির ভাগ আধুনিকরাই অবশ্য এক্ষেত্রে একমত হবেন না। তাঁরা বলবেন, মানবচরিত্র সম্পর্কে আমার সত্যিকারের জ্ঞান থাকার পরও কিংবা কিভাবে বাঁচতে হবে, কিভাবে লড়াই করতে হবে, বা কোন জিনিস আমাকে সুখী করবে এসব জানা থাকার পরও এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, আমি ঐ অনুসারে কাজ করব এবং ভালো কাজই করব। সক্রেটিসের সঙ্গে আধুনিক মানুষদের একমত হতে না পারার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের চরিত্র সম্পর্কে আমরা আধুনিকরা এখন অনেক বেশি জেনে ফেলেছি। আমরা জেনেছি যে, ব্যক্তি মানুষের মধ্যে এমন সব অযৌক্তিক শক্তি আছে যা প্রজ্ঞার সঙ্গে পাল্লা দেয়, এবং সহজাত প্রবৃত্তি, কামনা, ক্রোধ, প্রেরণা, আবেগ ইত্যাদি যুক্তিশাসন বহির্ভূত শক্তির সঙ্গে পাল্লায় প্রজ্ঞা সবসময়ই পেছনে পড়ে থাকে। এ ব্যাপারটিকে রোমান কবি ওভিদ খুব চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছিলেন এভাবে— "আমরা সর্বোত্তম পথ সম্পর্কে জানি এবং তা অনুমোদনও করি, কিন্তু অনুসরণ করি সবচেয়ে নিকৃষ্টটি।" ফ্রয়েড ও তাঁর সমসাময়িক অন্য মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের মনের অচেতন অংশটি হচ্ছে একটি ফুটন্ত কড়াইয়ের মতো যেখানে কামনা-বাসনাগুলো টগবগ করে ফুটছে, এই ফুটন্ত কড়াইয়ের পাশে প্রজ্ঞা একেবারে অসহায় না হলেও খুবই দুর্বল।

সক্রেটিসের মৃত্যুর ব্যাখ্যা

সোজা কথা এগুলোই সক্রেটিয় দর্শনের মূলসূত্র। আদালতে জবানবন্দি দিতে গিয়ে তিনি এরকমই তেজোদীপ্ত ভাষায় তাঁর দার্শনিক চিন্তাসমৃদ্ধ দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন। সেদিন, সত্তুরোর্ধ্ব বৃদ্ধ এই প্রবল দেশপ্রেমিকটির ক্ষুরধার বক্তৃতা শুনতে শুনতে আদালতে উপস্থিত সাধারণ এথেনীয়দের সহস্রাধিক চোখের তারায় কোনো সহানুভূতির আলো ফুটে উঠেছিল কিনা আমরা বলতে পারি না, তবে বেশির ভাগ জুরি ও বিচারকদের যে মন ভেজেনি একথা তো সবাই জানি। বিচারের রায় ঘোষিত হয় : সক্রেটিসকে বিষপান করে মরতে হবে। এই রায় ঘোষণার প্রায় এক মাস পর, একদিন সন্ধ্যাবেলা, এথেন্সের অস্তোন্মুখ সূর্যের ক্ষীণ আলোয় সক্রেটিস তাঁর শোকাভিভূত স্বজনদের সামনে দ্বিধাহীন চিত্তে ধীর ধীরে হেমলক বিষ পান করলেন, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময়ে নিথর হয়ে গেলেন। এভাবেই সে-যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষটি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তিনি যাকে সত্য ও ন্যায় বলে জানতেন সেই সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে সরে দাঁড়াবার চাইতে বা সেই সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় প্রত্যয় থেকে নির্দ্বিধ চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করলেন। প্লেটোই প্রথম ব্যক্তি যিনি সক্রেটিসের মৃত্যুকে শহীদের মৃত্যু হিসেবে আখ্যায়িত করেন, তাঁর অন্যতম সংলাপগ্রন্থ 'ফিডো'র সমাপ্তি টেনেছেন তিনি এভাবে "....এবং এভাবেই মৃত্যুবরণ করলেন আমাদের বন্ধু— আমরা বলতে পারি তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন আমাদের

পরিচিত সকলের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সর্বাপেক্ষা নীতিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ।" এমন অনেকেই আছেন যাঁরা সক্রেটিসের মৃত্যুকে যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেন। দুজনকেই তাদের সমসাময়িক কালের শাসকরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু আরও নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সক্রেটিসকে অনেক দার্শনিক শহীদ হিসেবে দেখতে চান না, তাঁরা মনে করেন সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যু দর্শন ও দার্শনিকদের প্রতি জনসাধারণের বৈরি মনোভাবের পরিণতি মাত্র। আবার অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে সক্রেটিসের বিচার ও মৃত্যুর আসল কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির ও তার স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার বিরোধ। এছাড়াও কিছু কিছু সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সক্রেটিস মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁর গণতন্ত্র বিরোধিতার জন্য, তিনি আসলে দর্শনের আড়ালে অভিজাততন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এসব ব্যাখ্যায় কোন্‌টি সঠিক?— তিনি কি তাঁর শুদ্ধশীলতার জন্য শহীদ হয়েছিলেন? তিনি কি তাঁর ধীশক্তির জন্য ঘৃণিত হয়েছিলেন? নাকি রাষ্ট্রের উৎপীড়ক শক্তির কারণেই তাঁর স্বাধীনচেতা, জ্ঞানান্বেষী, অনমনীয় ব্যক্তিসত্তাকে ধ্বংস করা হয়েছিল? অথবা গোপনে অভিজাততন্ত্রী ছিলেন বলেই কি তিনি ক্ষমতাসীন গণতন্ত্রীদের কোপানলে পড়েছিলেন?

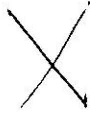
প্লেটোর শেষ জীবন

সক্রেটিসের মৃত্যুর পর ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বে প্লেটো কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়ে এথেন্স ত্যাগ করে দেশভ্রমণে বের হন। শুধু গুরু বিচ্ছেদের শোক-বিহ্বলতাই নয়, তার প্রতি গণতান্ত্রিক সরকারের রোষও তাঁর এথেন্স ত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল। তার এই ভ্রমণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী একটি সম্পদশালী স্বাধীন গ্রিক নগর সাইরাকুজে। এই নগরের রাজার শ্যালক দিওন তখন প্লেটো ও তাঁর দর্শনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে পড়েছিলেন। কথিত আছে যে, দিওনের ওপর প্লেটোর এত প্রভাব দেখে সাইরাকুজের রাজা প্লেটোর প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন এবং তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য প্লেটোর এক বন্ধু মুক্তিপণের বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করেন এবং এথেন্স ফিরিয়ে নিয়ে যান।

এথেন্সে ফিরে আসার পর প্লেটো নগরপ্রাকারের বাইরে 'অ্যাকাডেমাসের কুঞ্জবন' নামক এক এলাকায় কিছু জায়গা কেনেন। এই সেই জায়গা যেখানে প্লেটো তাঁর বিখ্যাত স্কুল, পরে যা 'আকাডেমিয়া' নামে বিশ্বখ্যাত হয়েছে, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এখানেই প্লেটো তাঁর জীবনের পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে লিখেছেন ও শিক্ষকতা করেছেন। অ্যাকাডেমিয়া ছিল এমন এক বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান যেখানে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হতো। গ্রিস ও এশিয়া মাইনরের অভিজাত যুবক-যুবতী তাদের রাজনৈতিক জীবন (Political Career) গড়ে তোলার জন্য সেখানে শিক্ষাগ্রহণ করতে আসত। এই অ্যাকাডেমিয়াই মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পথিকৃৎ। প্রায় নয়শ বৎসর ধরে এটি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল।

এখানে বিশ বৎসর শিক্ষকতা ও অধ্যায়ন করার পর ৩৬৭ খ্রিস্টপূর্বে দিওনের অনুরোধে প্লেটো আবার সাইরাকুজে যান। ততদিনে সাইরাকুজের প্রাক্তন রাজা প্রথম ডায়োনিসিয়ুস মারা গেছেন, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বয়সে তরুণ দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়ুস। প্লেটো এবার সাইরাকুজ গেলেন নতুন রাজা দ্বিতীয় ডায়োনিসিয়ুসের শিক্ষক হিসেবে। একই ব্যক্তিতে ক্ষমতা ও যথার্থ দর্শন-চিন্তার সমাবেশ ঘটানোর তত্ত্ব প্লেটো এই প্রথম বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেলেন। একজন রাজার দর্শনে বুৎপত্তি থাকা উচিত অথবা একজন দার্শনিকেরই রাজা হওয়া উচিত। প্লেটোর এই রাজনৈতিক তত্ত্ব ইউরোপীয় রাজা-রাজড়া ও মার্কিন প্রেসিডেন্টদের ওপর ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট কালপর্বে প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু ৩৬৭ খ্রিস্টপূর্বে দার্শনিক-রাজা তত্ত্ব বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্লেটোর এই সাইরাকুজ গমন ব্যর্থ হল, যেমন হয়েছিল এর পরের বার ৩৬১ খ্রিস্টপূর্বে। এরপর তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন এবং আমৃত্যু অর্থাৎ আশি বছর বয়স পর্যন্ত এখানে থেকেই ক্রমাগত লেখেন ও শিক্ষকতা করেন। তিনি মারা যান ৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বে। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে কোনো আদর্শ সমাজের জন্য এক আদর্শ সরকারের নীল-নকশা এঁকেছেন।

[*প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, সরকারি চারুকলা মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।*]



শিক্ষার অপচয় ও সমস্যা

সরদার সৈয়দ আহমেদ

ভূমিকা

সাধারণত মনে করা হয় যে, পুঁজিই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। বস্তু-পুঁজির চেয়ে মানব-পুঁজি যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করে থাকে একথা আজকের দিনে সকলেই বিশ্বাস করেন। মানুষের জন্যই উন্নয়ন এবং মানুষই হলো উন্নয়নের সক্রিয় এজেন্ট। অর্থাৎ মানবসম্পদ (পুঁজি) হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। বস্তু পুঁজি মওজুদের বৃদ্ধি নির্ভর করে মানব-পুঁজি গঠন হারের উপরে। শিক্ষা হলো মানবসম্পদ উন্নয়নের উত্তম মাধ্যম। মানবসম্পদের উন্নয়ন হলে মানব-পুঁজি গঠন হারও বৃদ্ধি পায়। মোট কথা, শিক্ষা বা জ্ঞান হলো উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ইঞ্জিন। Schultz, Becker, Galberth, Nicolson, Denisionসহ আরও অনেক খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বলেছেন এবং তারা শিক্ষাখাতের বিনিয়োগকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ বলে মনে করেছেন। শিক্ষা উন্নয়নের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও বাংলাদেশের শিক্ষাখাত অনুন্নত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নানা রকম সমস্যায় ভরপুর। এ সমস্ত সমস্যার উপর কিছুটা আলোকপাত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের শিক্ষার অবস্থা

১৯৬১ সালের হিসাবে বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ১৭ ভাগ যা ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় শতকরা ২৪.৬ ভাগে। ৩০ বছরে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র শতকরা ৭.৬ ভাগ। UNDP Human Development Report ১৯৯৪ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বয়স্ক শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৭ ভাগ। যা চীনে শতকরা ৮০ ভাগ, ভারতে শতকরা ৫০ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ায় শতকরা ৮৪ ভাগ, মালয়েশিয়ায় শতকরা ৮০ ভাগ, ফিলিপাইনে শতকরা ৯০ ভাগ, শ্রীলঙ্কায় শতকরা ৮৯ ভাগ এবং থাইল্যান্ডে শতকরা ৯৪ ভাগ।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকসংখ্যা শতকরা মাত্র ১০ ভাগ, যা চীনে শতকরা ৩২.৭ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ায় শতকরা ০৮.৪ ভাগ, ফিলিপাইনে শতকরা ৫৭.৬

৮ম বর্ষ: ৮ম সংখ্যা ১৯৯৫, আগস্ট

সপ্তম শতাব্দীর অসামান্য বাঙালি শিক্ষক এবং তাঁর সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থের কথা

তিতাশ চৌধুরী

১. সম্প্রতি মহাস্থবির শীলভদ্র নামে বাংলা একাডেমি একটি বই প্রকাশ করেছে। বইটির লেখক ঢাকা পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের জনৈক বিজ্ঞানী ডক্টর শহীদুল্লাহ মৃধা। প্রথমেই বলে রাখি — গ্রন্থটিতে যে শ্রম ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায় তা অন্যত্র দুর্লভ।

মহাস্থবির শীলভন্দ্র (৫২৯-৬৫৪) সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বিরচিত হয় নি। বরং বলা ভালো যে, কেউ লিখতে পারেন নি বিশেষ করে তাঁর সম্পর্কে তথ্যাভাবে। অতীশ দীপংকর নিয়ে অনেকেই বই লিখেছেন গবেষণা করেছেন, কিন্তু শীলভদ্র সম্পর্কে এমনটি ঘটে নি।

কেবল ১৮৯৪ সালে জনাব কৈলাশচন্দ্র সিংহ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার ১৩০১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'বঙ্গের আদি গৌরব শীলভদ্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এবং তাতেও খুব বেশি তথ্যের সমাবেশ ঘটাতে তিনি ব্যর্থ হন। সাম্প্রতিকালে জনৈক তানিয়া ফাতেমা 'জ্ঞানাকর শীলভদ্র' নামে মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর '৮৬ সংখ্যায় একটি নিবন্ধ রচনা করেন। তাতেও তিনি প্রধানত কৈলাশচন্দ্র সিংহকেই অনুসরণ করেন। তবে উপযুক্ত দু জনের তথ্যেই শীলভদ্র সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য ঢুকে পড়েছে। ফলে এ নিয়ে বিতর্কেরও সামান্য অবকাশ থেকে গেল। প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে বলতেই হয় যে, সপ্তম শতাব্দীর একজন অসামান্য বাঙালি শিক্ষক মহাস্থবির শীলভদ্রের মৃত্যুর সন-তারিখ এ-পর্যন্ত অনেক লেখক, এমনকি অনেক ইতিহাস-গ্রন্থে পাওয়া গেলেও তাঁর জন্ম তারিখটি পাওয়া যায় না। এ-ক্ষেত্রে লেখক কিন্তু পণ্ডিত শীলভদ্রের জন্ম তারিখটি অনেক যুক্তি, তর্ক ও অনেক তথ্যের স্তূপ থেকে উজ্জ্বল-উদ্ধারে সমর্থ হন। তাছাড়া শীলভদ্রের ঠিকানা, 'শীলভদ্র' 'শীলভদ্র' ছিলেন কিনা ইত্যাদি তথ্যের ও ব্যাখ্যাও তাঁর গ্রন্থে রয়েছে।

হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত কুমিল্লা জেলার ইতিহাস (প্রকাশকাল: ৭ জুন, ১৯৮৪) গ্রন্থেও মহাস্থবির শীলভদ্র সম্পর্কে যে সব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তাও খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ।

৯ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর '৯৬

প্রসঙ্গত সেখানে বলা হয়েছে : "সপ্তম শতাব্দীতে একজন বাঙালী সমগ্র বৌদ্ধ জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহার নাম শীলভদ্র। সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে ইহার জন্ম হয় বলিয়া উয়ান-চোয়াঙ উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য ও সর্বাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়া বাঙালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক ও শ্রমণ-উয়ান-চোয়াঙ ৬৩৭ খ্রী: নালন্দায় উপস্থিত হন এবং পাঁচ বৎসরকাল মহাবিহারে মহাস্থবির শীলভদ্রের ছাত্ররূপে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করেন।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন — "বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরও একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য। নালন্দার হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন — তিনি ছিলেন বাঙালী। তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্যত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে আসেন (কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, পৃ-৯৩)।" এখানে এ-কথা উল্লেখ প্রয়োজন যে, পণ্ডিত শীলভদ্র সমতটেরই রাজা ছিলেন। কুমিল্লা তখন সমতটের অন্তর্গত একটি অঞ্চল ছিল। আরো বলা প্রয়োজন, তৎকালীন বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর সন্ধিকাল থেকেই। ফাহিয়ান তাঁর বিবরণে তা উল্লেখ করেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়েন-সাঙ সমতটের বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার লক্ষ করেন। শীলভদ্রের জন্মভূমি সমতটেই, তিনি ত্রিশটির মতো সঙ্ঘরাম বিহারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। মোটকথা, হিউয়েন সাঙ সমতট সম্পর্কে একটি সমৃদ্ধ রিপোর্ট পেশ করেন (২০ ফেব্রুয়ারি, ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে)। তাতে বলা হয় : 'এই দেশের পরিধি প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার (বলা দরকার — তৎকালীন সময়ে মাইল বা কিলোমিটারকে 'লি' বলা হত)। দেশের এক ধারে সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর)। এখানকার জমি নিচু আর উর্বর। রাজধানীর পরিধি প্রায় ১০ কিলোমিটার। এখানে নিয়মিত চাষবাস হয়। প্রচুর মৎস্য আর ফলমূল এখানে সর্বত্রই জন্মায়। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ আর লোকদের স্বভাব ভদ্র। এখানকার মানুষ পরিশ্রমী, লম্বায় কম, আর এদের গায়ের রং কালো। এরা বিদ্যানুরাগী, আর বিদ্যা লাভ করবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে। সত্য আর মিথ্যা এই দুই সিদ্ধান্তেরই লোক এখানে থাকে।

তাই বলি, আমাদের আলোচ্য লেখক শীলভদ্র সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে যে-সব তথ্য প্রমাণ খাড়া করেছেন — তা কোনোক্রমেই উপেক্ষাযোগ্য নয়। বরঞ্চ তিনি তাঁর 'মহাস্থবির শীলভদ্র' গ্রন্থে এতোসব তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তি ও মত দাঁড় করিয়েছেন — তাতে একদিকে যেমন চমৎকৃতি আবহ, তেমনি অন্যদিকে আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। তিনি চীন, জাপান, আমেরিকা, তিব্বত এবং নানা স্থান থেকে শীলভদ্র সম্পর্কে বহু তথ্য, গ্রন্থ ইত্যাদির যোগান দিয়ে একে একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ বা আকরগ্রন্থরূপে রূপদান করেন। অর্থাৎ শীলভদ্রের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ ঘটিয়ে একে একটি প্রামাণ্যগ্রন্থে পরিণত করেছেন। আমি বলবো একজন বিজ্ঞানী হয়েও তিনি

একজন নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেজন্যই তিনি আমাদের অভিনন্দনযোগ্য।

২. বলা হয়েছে, মহাস্থবির শীলভদ্রের বাড়ি কুমিল্লার চান্দিনায়। খুব সম্ভব এক সময় এই চান্দিনার বড়কামতায় বা কর্মান্তনগরে এখানকার বৌদ্ধ রাজাদের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৮৮ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় এ-সম্পর্কে বলেন : শীলভদ্রের সময়ে কর্মান্তনগর (বড়কামতা) থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গুনাইঘর গ্রামে একটি তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। তাতে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের (৫০৭ অব্দ) ভূমিদানের কথা আছে (মহাস্থবির শীলভদ্র, পৃ-৪২)। লেখক এ-সম্পর্কেও বিস্তৃত গবেষণা চালিয়ে এ-সত্য উদ্ধার করেন। তিনি বহু সূত্র, তথ্য, গ্রন্থ, তাম্রশাসন ইত্যাদি ঘেটে পণ্ডিত শীলভদ্রের এই ঠিকানা আবিষ্কারে সমর্থ হন। কুমিল্লা শহরে পণ্ডিত শীলভদ্রের নামে একটি রাস্তার নামকরণও করেছিলেন কুমিল্লার এককালীন সংস্কৃতিবান জেলা প্রশাসক জনাব সৈয়দ আমিনুর রহমান। বলতে ইচ্ছা করছে — এই গ্রন্থ লেখকের বাড়িও কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলায়। আমার মনে হয় বিশ্বখ্যাত রুটস্ গ্রন্থের লেখক অ্যালেক্স হ্যালির মতোই তিনি শেকড়সন্ধানি তৎপরতায় লিপ্ত। তা না হলে এত শ্রম স্বীকার করে তিনি সপ্তম শতাব্দীর মহাস্থবির শীলভদ্রকে আবার নতুনভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে আবিষ্কারের নেশায় বোঁদ হতেন বলে মনে হয় না।

আরো বলা আবশ্যক — মহাস্থবির শীলভদ্র সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থে এমন কোনো সূত্র নেই যা উল্লেখ করেন নি। ১২০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে ১৫৮ টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। তাতেই প্রতীয়মান হয় লেখক শীলভদ্র সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণায় নিরত ছিলেন। তার ফসলই হচ্ছে-এই গ্রন্থ — 'মহাস্থবির শীলভদ্র', এতে কী আছে?

৩. গ্রন্থের সূচির কথাই আগে বলি। ক.জীবন কথা, খ. জন্ম ও বংশ পরিচয়, গ. শিক্ষা জীবন, ঘ. সংসার-জীবন, ঙ. কর্ম ও সাহিত্য জীবন, চ. কতিপয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য, ছ. শেষজীবন ও মৃত্যু জ. রচনাপঞ্জি পরিচিতি, ঝ. জীবনদর্শন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য এবং ঞ. তথ্যপঞ্জি।

এই সূচি থেকেও গ্রন্থ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ও স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটি অধ্যায়েই বিভিন্ন শিরোনামে বিভিন্ন ছোট ছোট অধ্যায়ের সূচনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আলোচনাতেই লেখক যুক্তি ও সূত্র প্রদর্শন করেছেন। ফলে গ্রন্থটির সর্বত্রই যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। গ্রন্থের প্রত্যেক পরতে পরতে লেখকের মেধা, মনন ও বিচারশীলতা যেভাবে কাজ করেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়। মোটকথা লেখক একজন সচেতন ও সুচেতন নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিক মতো গ্রন্থে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলেছেন। এর সঙ্গে রুচি ও প্রযত্নশীলতাও কাজ করেছে। তিনি তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় উল্লেখ করেন .... অতীশ দীপঙ্করকে নিয়ে অলকামিত্র

গবেষণা করেছেন, কিন্তু শীলভদ্রের উপর কোন গবেষণা হয়নি। বাঙালির আদি গৌরব আচার্য মহাস্থবির শীলভদ্রের কথা আমরা যা জানি তা পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু চীন, জাপান এবং আমেরিকায় শীলভদ্রকে নিয়ে গবেষণা বেশি হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'লা নুই বেঙ্গলী বা বেঙ্গল নাইটস খাত মির্চা ইলিয়াদ সম্পাদিত 'Encylopedia of Religion' গ্রন্থের ১৩শ খণ্ডে ৩২০-৩২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত Silabhadra নামক নিবন্ধটি থেকে (পৃ. ৯)।

৪. ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে — মহাস্থবির শীলভদ্র কুমিল্লার লোক। একথা লেখক তাঁর গ্রন্থে তথ্য ও যুক্তিসহকারেই প্রমাণ করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শীলভদ্র বাংলাদেশের কোনো এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে তিনি বেরিয়ে আসেন' কেন?

এরও একটি যুৎসই ও সুন্দর উত্তর পাওয়া যায় লেখকের এক ভাষ্যে। লেখক বলেন, কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক শীলভদ্র রাজকীয় সম্মান ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করেন। হৃদয়ে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা তাঁর মধ্যে সকল পার্থিব বস্ত্র সম্পর্কে অনীহা সৃষ্টি করেছিল: তিনি সত্যানুসন্ধানে, নবজ্ঞানরাজ্য আবিষ্কারের এবং বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। এই চিন্তা-ভাবনার দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি নালন্দায় আসেন। নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ আচার্য ধর্মপালের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন: উপসম্পদা গ্রহণ করেন ভিক্ষুরূপে। দীর্ঘ সাধনার বলে তিনি বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অধিগত করেন এবং শাস্ত্রের দুরূহ অংশের ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন' (পৃ. ২৫)।

আচার্য ধর্মপাল সম্পর্কে এখানে একটু বলে নেওয়া ভাল। Lama chimpa অনূদিত Tamath's History of Buddhism in India পাঠে জানা যায় — ধর্মপাল ছিলেন মাদ্রাজের কাঞ্চীপুরমে একজন মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্র। নালন্দায় তিনি পড়াশোনা করে এর আচার্য হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মূলত এবং প্রধানত 'যোগাচার মতবাদের প্রবক্তা এবং 'বিজ্ঞানবাদ ঐতিহ্যে'র একজন প্রতিষ্ঠাতা দার্শনিক। তাঁর এ মতবাদ ও দর্শন পরবর্তীকালে পূর্বভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মদর্শনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। বলতেই হয় — তাঁরই প্রিয় ছাত্র ছিলেন শীলভদ্র। অন্যদিকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং — এর গুরু ছিলেন শীলভদ্র — যে কথা কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিবন্ধে উল্লেখ করতে ভুলে যান নি। হিউয়েন সাঙ অবশ্য তাঁর গুরুর শিক্ষকের বাণী ও চিন্তা-*ধারা চীনে প্রচার করেছিলেন।*

এখানে আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন যে, শীলভদ্র ও ধর্মপালের বয়স প্রায় কাছাকাছি ছিল। এক হিসেবে দেখা যায়, শীলভদ্রের চেয়ে ধর্মপাল এক বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন, (পৃ.৭৬) আচার্য ধর্মপালের পরই বাঙালি শীলভদ্র নালন্দার আচার্য নিযুক্ত হন। কারণ ধর্মপাল স্বীকার করেছেন — তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে শীলভদ্রই ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী, সর্বজ্ঞানের গুণী এবং ধর্ম-দর্শন ও শাস্ত্রের সব তর্কযুদ্ধে অপরাজেয় সৈনিক।

এখানে একটি তর্ক-যুদ্ধ ঘটনার কথা উল্লেখ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বড় কথা হচ্ছে — প্রাচীন ভারতবর্ষে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের মতোই বিবেচিত হত। রাজাদের মান বজায় রাখার ব্যাপারে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেক সময় তর্ক-যুদ্ধ অস্ত্র-যুদ্ধের রূপ নিতেও দেখা যেতো।

এ-ধরনের তর্ক-যুদ্ধ, সেকালে — সাধারণত রাজভবনের বিচার-মন্দিরেই বেশিরভাগ সময়ে অনুষ্ঠিত হত। পণ্ডিত শীলভদ্রও একবার আচার্য ধর্মপালের অনুমতিক্রমে এক তর্ক-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তর্ক-যুদ্ধে দক্ষিণভারতের এক হিন্দু পণ্ডিত 'বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্বক হিন্দুধর্মমতই যে জগতের শ্রেষ্ঠ মত'-এ সম্পর্কে বহু জটিল প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন। শীলভদ্র গভীর অভিনিবেশসহকারে তা শুনে তিনি তাঁর গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ওই হিন্দু পণ্ডিতের সমস্ত জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান দিয়েছিলেন এবং 'অহিংসাই পরম ধর্ম' বৌদ্ধধর্ম দর্শনের এই গভীরতা সেদিন তিনি প্রমাণ করেছিলেন। অবাক ব্যাপার, আধুনিক যুগের প্রথম দিককার সাহিত্যও পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক-যুদ্ধের কথা ও কাহিনী পাঠ করে আমরা আজও পুলক বোধ করি। খুব সম্ভব, এর পরবর্তীযুগেও তা অব্যাহত ছিল।

৫. একটু আগেই বলেছি — বাঙালি পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১২৫ বছর বেঁচেছিলেন। বলতে গেলে ১০৫ বছর কালই তিনি নালন্দায় লেখাপড়া শিখেছেন। অর্থাৎ ছাত্র হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে এবং সবশেষে আচার্য হিসেবে। তবে তিনি প্রায় ২০ বছরের অধিক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রসঙ্গত এখানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটু বলে নিলে ভাল হয়। নালন্দা বর্তমান পাটনা জেলার বিহার মহকুমার বড়গাঁওর (নিহার গ্রাম) কাছেই। আসলে মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহের নিকটেই নালন্দা অবস্থিত ছিল। আরো বলা দরকার, খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহাযান মতের কেন্দ্র হিসেবে নালন্দা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্ত এবং তার বংশধরেরা নালন্দা মহাবিহারে প্রভূত অর্থ সাহায্য করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীই নালন্দা জ্ঞান ও কৌরবের শিখর স্পর্শ করে। তবে এ কথাও সত্য, বাঙলার পাল রাজাদের শাসনামলেও নালন্দা সমৃদ্ধ হয়।

শীলভদ্রের সময়ে নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার। ইৎসিঙের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ছাত্রের পক্ষে ভর্তি হওয়া সহজ ছিল না। এখানে চীন, জাপান, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, জাভাদ্বীপ, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ছাত্ররা আসতেন।

নালন্দার পাঠসূচিও সহজ ছিল না। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ক. চতুর্বেদ, খ. বৌদ্ধ হীনযান পুস্তক, গ. মহাযান ও অষ্টাদশ শাখার তত্ত্বনিচয়, ঘ. হেতুবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র, ঙ. শব্দবিদ্যা ব্যাকরণ, চ. রসায়ন, ছ. চিকিৎসাবিদ্যা, জ. জাদুবিদ্যা ঝ. যোগশাস্ত্র,

ঞ. জ্যোতিষ্কবিদ্যা. ট. ব্যবহারিক শাস্ত্র. ঠ. শিল্প স্থানবিদ্যা, ড. ধাতুবিদ্যা, ঢ. তান্ত্রিক বৌদ্ধ শাস্ত্র ইত্যাদি।

নালন্দায় দৈনিক একশটি বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল একশ বিষয়বস্তু সম্পর্কে। এখানে পরীক্ষার পরেই উপাধিদানের ব্যবস্থা ছিল। মৌখিক পরীক্ষাগ্রহণের রীতিও এখানে প্রচলিত ছিল। আরেকটি মজার ব্যাপার এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতশ বছর জীবনে কোনো বিদ্রোহ বা ধর্মঘট সংঘটিত হয় নি — বিহারের কোনো নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে।

সূত্র ও শাস্ত্রের ২০টি শাখার সবগুলি ব্যাখ্যা করতে পারতেন — এমন অধ্যাপক ছিলেন নালন্দায় এক হাজার জন। তিরিশটি বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারতেন পাঁচশ জন পণ্ডিত। হিউয়েন সাঙসহ জনাদশেক পণ্ডিত ৫০টি বিষয় পড়াতে পারতেন। আর একা শীলভদ্র এই সব শাস্ত্র পড়িয়েছিলেন এবং অধিগত করেছিলেন সবগুলির বিষয়বস্তু। বলতেই হয়, এ সব কারণেই শিক্ষক শীলভদ্র আজো কালের দাপট এড়িয়ে আমাদের মন ও মননে স্থান করে নিয়েছেন। 'দি ইউনির্ভাসিটি অব নালন্দা' নিয়ে জনৈক ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ হংসমুখ সাঙ্কলিয়ায়ার ১৯৩৪ সালে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। লেখকের মতে এটি খুবই মূল্যবান এবং তথ্যবহুল।

৬. শীলভদ্রের জীবনদর্শন বৌদ্ধধর্মাশ্রিত। তাঁর জীবনদর্শনের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে, লেখকের মতে, বৌদ্ধধর্মের মতবাদের মধ্যে। বস্তুত তাঁর পুরো জীবনকথার মধ্যে তাঁর জীবন-দর্শন অধ্যায়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (পৃ. ৬৬)। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য (হিন্দু) ধর্মের যাবতীয় অনুদারতার একে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। ... বলা যায়, 'উপনিষদের পুনর্জন্মবাদ ও কর্মফলবাদের ওপরে বৌদ্ধদর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত। জীব পুনঃ পুনঃ জন্মলাভপূর্বক দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয়। বুদ্ধ মানবকুলের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করেছিলেন। সৎকর্মের দ্বারা মানুষ স্বীয় জীবনকে উন্নত থেকে উন্নতর করে পরিশেষে দুঃখ নিবৃত্তি লাভে সমর্থ হন' (পৃ.৩৮)।

'বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা এই ধর্মের আর একটি বিশিষ্ট অবদান। গৌতমবুদ্ধ গণশিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। ... এই শিক্ষায় কোনো জাতিভেদ ছিলনা। এর লক্ষ্যও ছিল তিনটি। নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক। পৃথিবীর প্রথম গণতান্ত্রিক ধর্মই হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম, সেখানে ঈশ্বর নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কর্মেই সব।

শীলভদ্রের জীবনদর্শনের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যচর্চা ও অনুশীলন তৎকালে এবং এ কালেও এক বিস্ময়কর কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। কুমিল্লার জনৈক জ্যোতিপাল মহাথের এই নিবন্ধকারের সঙ্গে একবার আলাপকালে জানিয়েছিলেন যে, পণ্ডিত শীলভদ্র দুশর মতো ছোট বড় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বর্তমানকালে তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। 'বুদ্ধভূমি সূত্র এবং বুদ্ধভূমি ব্যাখ্যান' এই একটি গ্রন্থই এখনো দুর্লভ নয়। তবে এটি প্রথম সংস্কৃত ভাষায়

রচিত হয়। পরে এটি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। এটিতে পাঠ রয়েছে ১৩১ পৃষ্ঠা আর তিব্বতী ভাষায় নির্ঘণ্ট (Index) রয়েছে ১১৫ পৃষ্ঠার। ১৯৪০ সালে প্রথম এর জাপানি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮২ সালে। জাপানি সংস্করণে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৩-এ দাঁড়িয়েছে। হিউয়েন সাঙ এর পরে ভারতে ইৎসিঙ (৬৭১-৬৯৫)-এর আগমন ঘটে। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় মাত্র পাঁচ বছর (৬৩৭-৬৪৩) অবস্থান করেন। মূলত ইৎসিঙের ভ্রমণকাহিনীতেও আমরা অন্যান্য বিশিষ্ট বৌদ্ধপণ্ডিতের সঙ্গে বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্রর নামও উচ্চারিত হতে দেখি। ইৎসিঙ লেখেন : 'তিব্বতী পণ্ডিতদের নিকটও আচার্য শীলভদ্র অতি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাই তিব্বতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে আর্যদেব, ধর্মপাল প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে বাঙালী শীলভদ্রর সেখানে সমানভাবে পূজিত এবং তাঁর গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়' (পৃ.২৫)।

৭. ডক্টর শহীদুল্লাহ মৃধার 'মহাস্থবির শীলভদ্র' গ্রন্থটি নানা কারণে এবং নানা দিক দিয়েই তাৎপর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। তবে এ গ্রন্থটি সুবিন্যস্ত নয়। তাতে বেশ কিছু সাধু ও চলতি রীতির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। যথার্থ শব্দ প্রয়োগ-ত্রুটিও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যেমন, অত্র, (পৃ. ৫৪), ফলশ্রুতি (পৃ.৩৮), কেবলমাত্র (পৃ.২৭), সময়কালীন (পৃ.৪২) ইত্যাদি। এই পুস্তকে তথ্যের বেশ কিছু পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে।

গ্রন্থের এই সামান্য বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে তাতে বিত্ত ও বৈভবের কোনো ঘাটতি নেই। কিছু দুলর্ভ চিত্র সংযোজন এর মানমর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। অবশ্যি এ সমস্ত নেওয়া হয়েছে চীন, জাপান, তিব্বত ও আমেরিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিভিন্ন ছবি, প্রতিকৃতি ও চিঠিপত্র সংযোজন গ্রন্থটিকে অনবদ্য ও ঐশ্বর্যবান করেছে।

লেখক : অধ্যাপক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও সম্পাদক 'অলক্ত' পত্রিকা।

বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র

আনিসুজ্জামান

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর একটা ধারা প্রবাহিত হয়েছিল রামমোহন রায় থেকে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত। এর পাশাপাশি চলেছিল রাধাকান্ত দেব থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংস-স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত একটি ধারা —তার লক্ষ্য সমাজসংস্কার ছিল না, ছিল ধর্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি ও ঐতিহ্যপ্রীতির প্রকাশ ঘটানো। অন্য একটি ধারায় দেখি সৈয়দ আহমদ বেরিলভি-প্রবর্তিত তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন, তিতুমীর-পরিচালিত সংগ্রাম এবং হাজি শরিয়তউল্লাহর নেতৃত্বাধীন ফারায়েজি আন্দোলন। এসব আন্দোলনই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ধর্ম ও রাজনীতির এই মিলন নানা রূপ ধারণ করেছিল, তার ফলও হয়েছিল বহুমুখী। তবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মতো কিছু কিছু ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও তা কিন্তু দেশের মানুষকে ক্রমাগত বিভক্ত করতে সাহায্য করেছিল।

ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগের একটা রূপ দেখা দিয়েছিল খিলাফত আন্দোলনে — সে আন্দোলনে হিন্দুরাও যোগ দিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পরে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যে সহিংস সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল তার ইডিয়ম ছিল অনেকখানি ধর্মভিত্তিক — এর ভাবগত ভিত্তি গড়ে উঠেছিল গীতাকে কেন্দ্র করে। গান্ধীর ভাষায়ও ধর্মের প্রভাব দেখি। যদিও তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্য কামনা করেছিলেন, কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র, তাঁর ভাষায়, ছিল রামরাজ্য।

গান্ধী খিলাফত সমর্থন করেছিলেন, সৈয়দ আহমদ খান করেননি। সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় মুসলমানদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কুরআন ও হাদিসে কোন আন্তর্জাতিক খলিফার কথা বলা হয়নি; ইসলামের ইতিহাসে একই সময়ে তিন খিলাফত ছিল —বাগদাদে আব্বাসীয়দের, মিশরে ফাতেমিদের এবং স্পেনে উমাইয়াদের। ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের পক্ষে তুরস্কের সুলতানের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কোন হেতু নেই এবং তাঁকে খলিফাও বলা যায় না। সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বার্থের ওপর জোর দিয়েছিলেন, একথা আমরা জানি; কিন্তু যেকথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি তা এই যে, ধর্মনির্বিশেষে এদেশের সকল মানুষকে তিনি এক জাতিভুক্ত

৯ম বর্ষ : ১১তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬

06 SEPTEMBER 2005. Vol. 1
27 SEPTEMBER 2005. Vol. 2